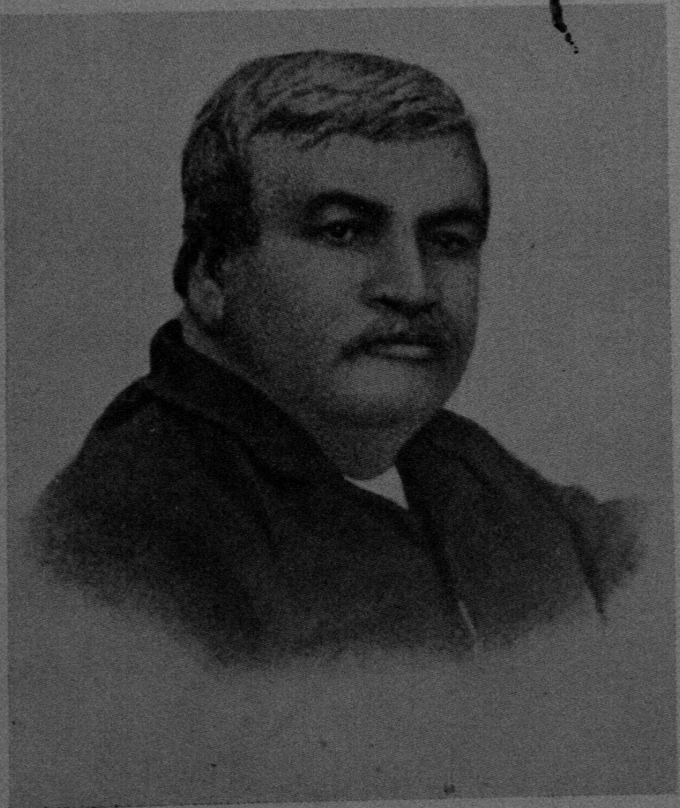


লজ্জাবতী



বন চাঁড়াল



আচার্যের পিতৃদেব ভগবানচন্দ্র বসু



আচার্যের মাতৃদেবী বামাসুন্দরী দেবী

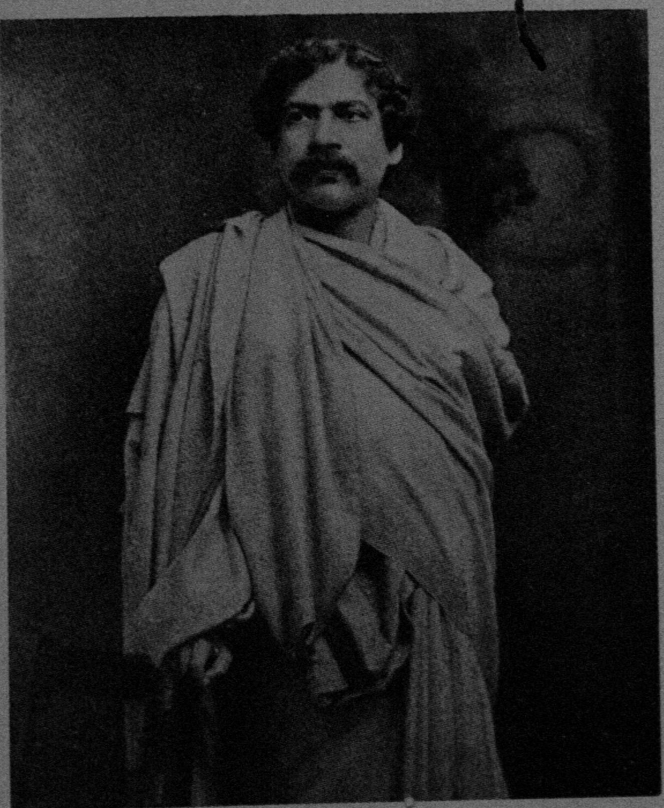
[দুই]

They who see but one, in all the changing manifoldness of this universe, unto them belongs Eternal Truth — unto none else, unto none else.

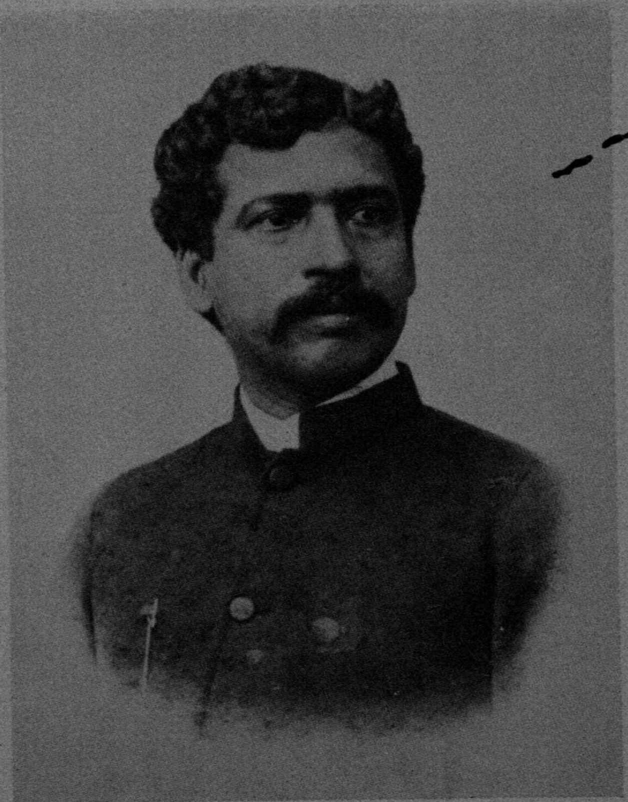
J. C. Bose



আচার্যের সহধর্মিণী অবলা বসু



জগদীশচন্দ্র : ১৯০০



জগদীশচন্দ্র : ১৯০৭

বিজ্ঞানী ঋষি

জগদীশচন্দ্র

॥ মূল জীবনী ॥

শুভেন্দু ঘোষ

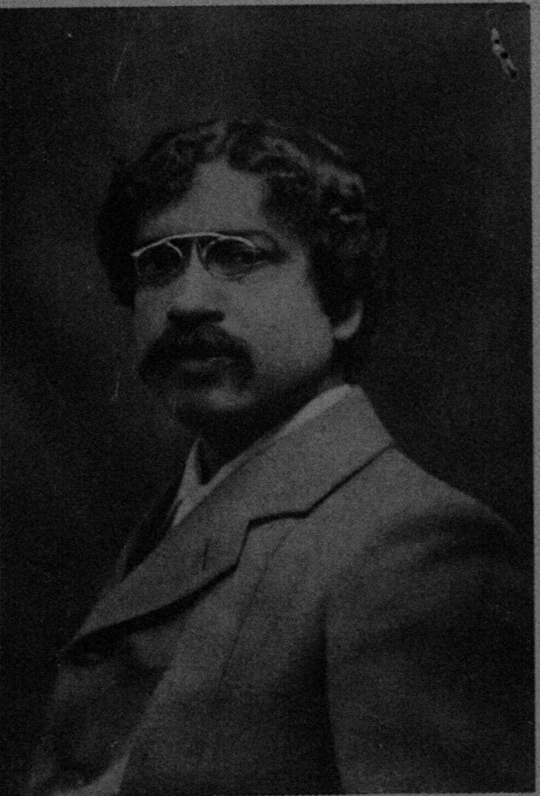
॥ সম্পাদনা ॥

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

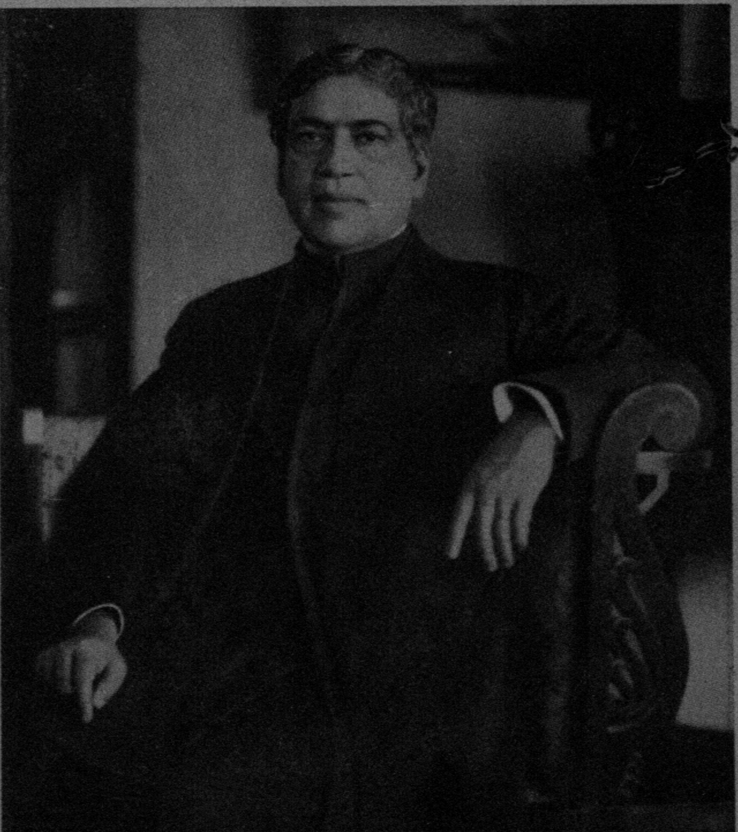


বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা ৯ ॥



জগদীশচন্দ্র : ১৯১৫



জগদীশচন্দ্র : ১৯১৮

॥ প্রথম প্রকাশ ॥

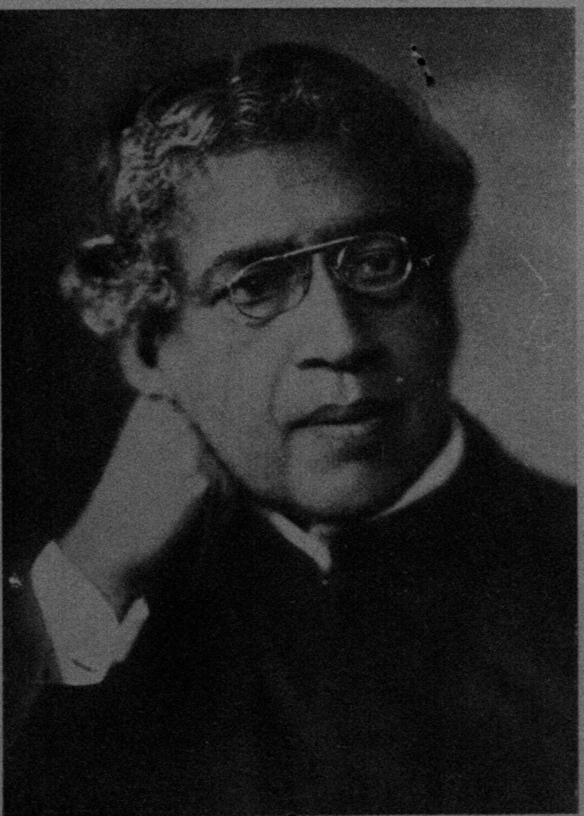
১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

॥ প্রচ্ছদ ॥

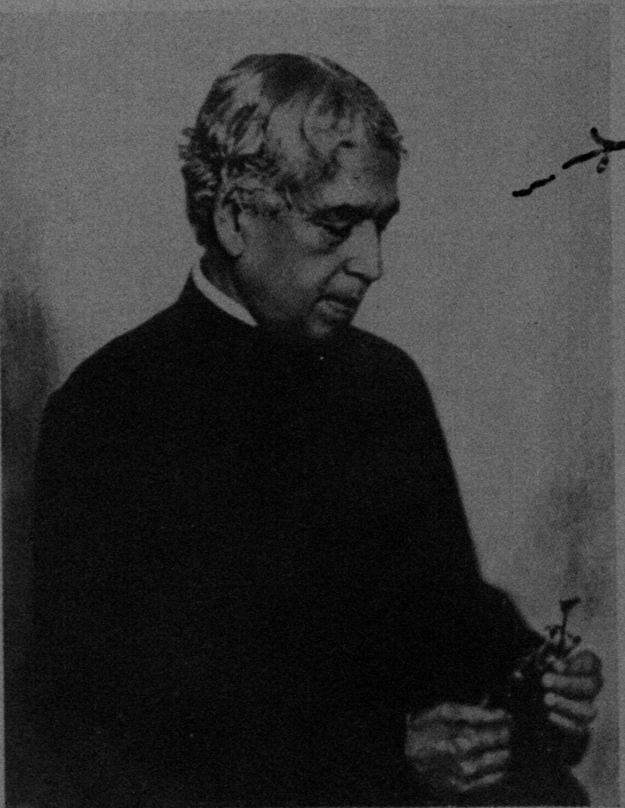
শঙ্কর দাশগুপ্ত

মূল্য ছয় টাকা

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রীমনোমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীঅমৃতলাল কুণ্ডু কর্তৃক জ্ঞানোদয় প্রেস (১৭ হায়াৎ খাঁ লেন, কলিকাতা ৯) হইতে মুদ্রিত ॥

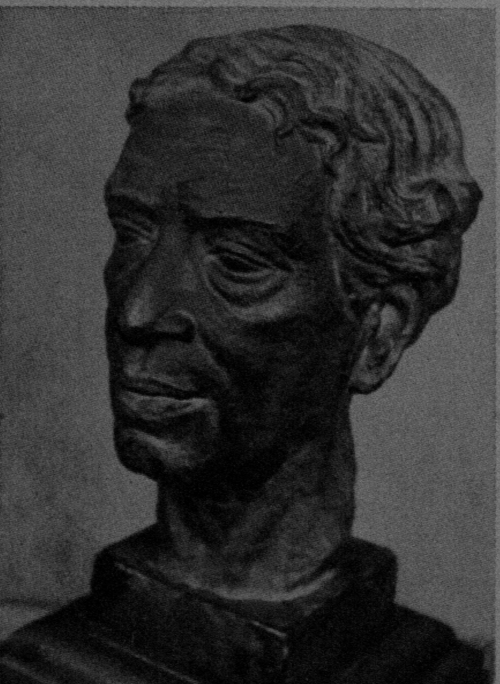


জগদীশচন্দ্র : ১৯২০

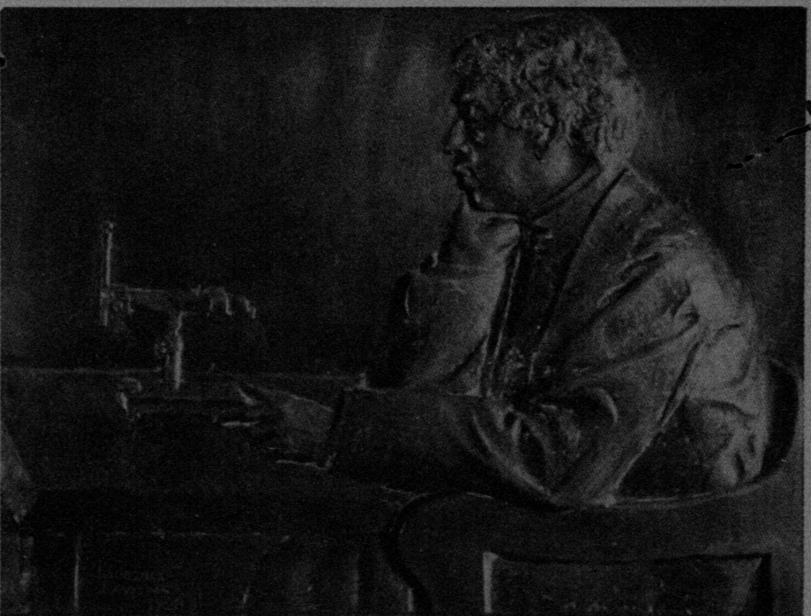


জগদীশচন্দ্র : ১৯৩০

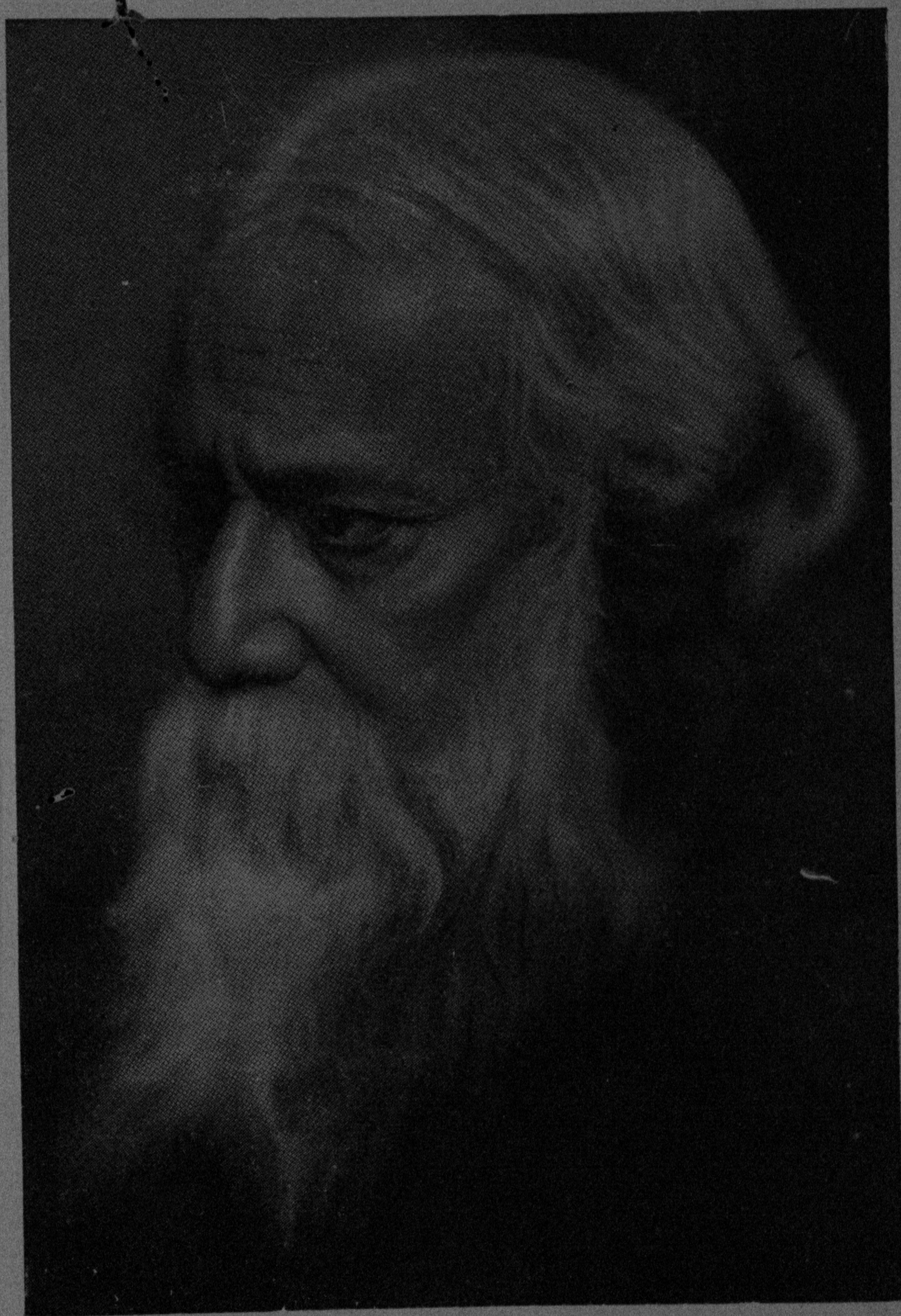
বিষয়সূচী



জগদীশচন্দ্র
[ভাস্কর্য : দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী]



Bronze Plaque of Jagadishchandra in England in 1920
[by Lawrence Langaron]



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিত্র-সূচী

ভগিনী নিবেদিতা

প্লেট এগার : ডাঃ মেঘনাদ সাহা, আচার্য জগদীশচন্দ্র, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ স্নেহময় দত্ত, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু, ডাঃ নিখিলরঞ্জন সেন, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ

বসু বিজ্ঞানমন্দিরের বহির্দৃশ্য

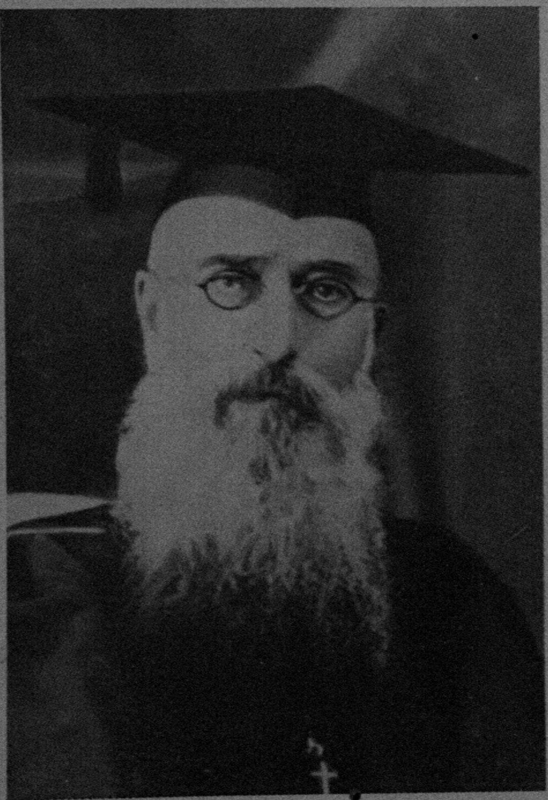
প্লেট বার : বসু বিজ্ঞানমন্দিরের অভ্যন্তর : রসায়নবিভাগ

বসু বিজ্ঞানমন্দিরের অভ্যন্তর : বক্তৃতা-কক্ষ

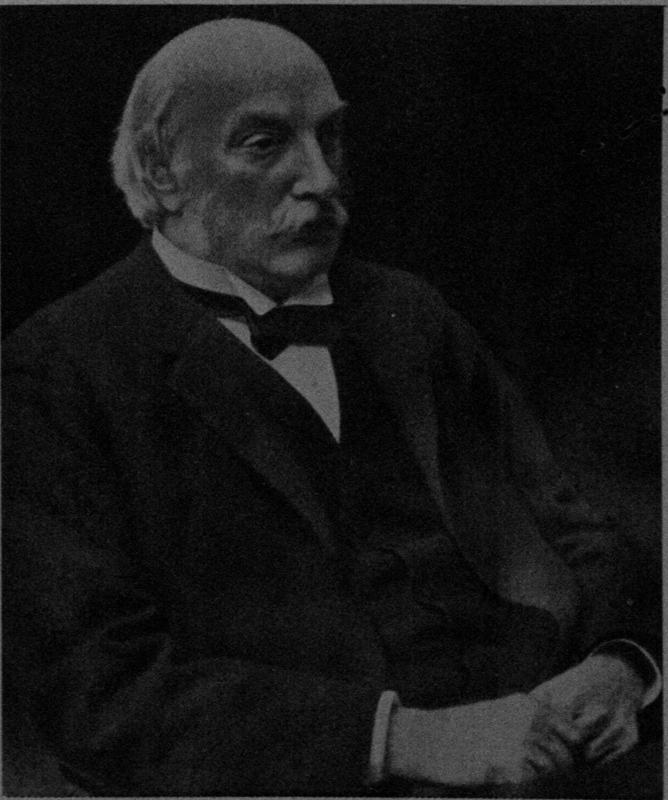
প্লেট তের : বক্তৃতামঞ্চের উপরে স্থিত "পুরুষ ও প্রকৃতি" চিত্র : শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু অঙ্কিত

প্লেট চৌদ্দ : জগন্মাতা : আচার্য কর্তৃক হরপ্পা হইতে সংগৃহীত

সূর্যদেবতা : বক্তৃতা-কক্ষের অভ্যন্তরে স্থিত অজন্তা-অনুকরণে



ফাদার লাফঁ



লর্ড র‍্যালি

সম্পাদকের বক্তব্য

আচার্যের পবিত্র জন্মদিনে গ্রন্থখানি বাহির হইবে, আশা ছিল। কিন্তু সাধ্যের পরিমাপ না করিয়া সাধ করিলে যে প্রাপ্তিযোগ ঘটে, এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল বাধা বহু, বিপত্তি বহুতর। তবুও যে এই সময়ের মধ্যে গ্রন্থখানি বাহির হইল, তজ্জন্য বহু সুধীজন ও বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট আমরা একান্ত ঋণী রহিলাম।

পুস্তকের প্রথম খণ্ডে আচার্যের জীবনী লিখিয়াছেন শ্রদ্ধেয় শুভেন্দু ঘোষ মহাশয়। অবশিষ্ট সমস্ত কিছু সঙ্কলিত। পুস্তকখানির এই রূপ-পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সুতরাং বিষয়টি কিঞ্চিৎ আলোচনাযোগ্য।

বঙ্গদেশ জগদীশচন্দ্রকে প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে—বেদনাদায়ক হইলেও এ নিষ্ঠুর সত্য অস্বীকার করিবার নয়। নতুবা সত্যের অপলাপ হইবে। যে কয়টি মহাজ্যোতিষ্ক ভারতীয় তথা বাঙালী জীবনকে ভাস্বর কর্মোদ্দীপ্ত করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে জগদীশচন্দ্র অন্যতম—এ কথাটা বুঝিয়া শুনিয়া মনেপ্রাণে উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা ও অধিকার আমাদের মত কয়জন সাধারণ বাঙালীর আছে, তাহা ভাবিবার মত। সত্যই এ এক আশ্চর্য প্রশ্ন। জগদীশচন্দ্রের বহুমুখী প্রতিভার প্রকৃত মূল্যায়ন এ পর্যন্ত কেন হইল না, এবং যেটুকু হইল, তাহাই বা শিক্ষিত সাধারণ বাঙালী সমাজ কেন অন্তর দিয়া গ্রহণ করিল না, ইহার জবাব কোথায়?

দিগ্বিজয়ী বিজ্ঞানীই ত জগদীশচন্দ্রের একমাত্র পরিচয় নয়—ঋষিপ্রতিম এই নিরলস সত্যসন্ধ মানুষটি ছিলেন শিল্পদরদী, সাহিত্যিক ও প্রকৃত



উপবিষ্ট (বাম হইতে) : ডাঃ মেঘনাদ সাহা, আচার্য জগদীশচন্দ্র ও ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।

দণ্ডায়মান (বাম হইতে) : ডাঃ স্নেহময় দত্ত, অধ্যাপক সতেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু, ডাঃ নিখিলরঞ্জন সেন, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ।



বসু বিজ্ঞানমন্দিরের বহির্দৃশ্য

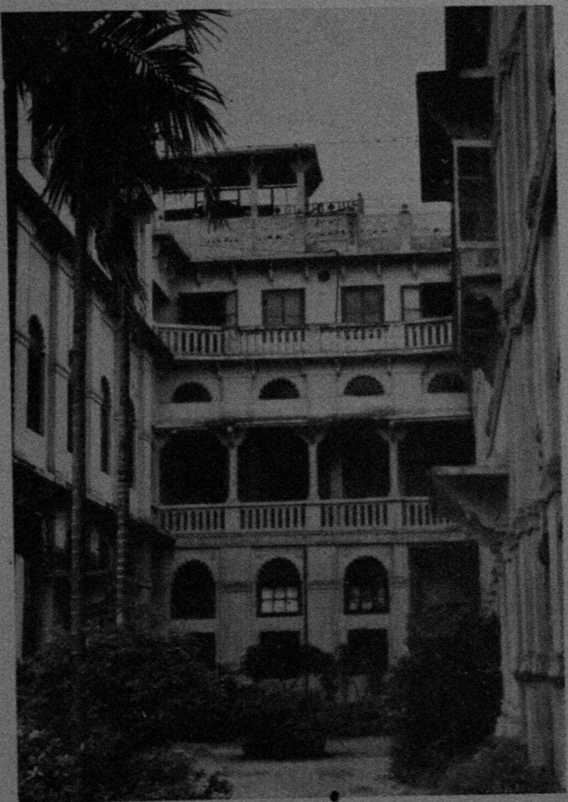
দেশপ্রেমিক। তাঁহার কর্মোদ্দীপনা ও প্রেরণার মূলে ছিল ভারতীয় দর্শনের মৃত্যুঞ্জয়ী শিক্ষা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মাঝে তিনিই প্রকৃত সেতুবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।

বর্তমানকালে জগদীশচন্দ্রের এই পরিচয় বিস্মৃতপ্রায়। অথচ, বাঙালীর কর্মজগতে ও চিত্তাকাশে আজ যে দৈন্য ও অন্ধকার নামিয়াছে, তাহা অপসারিত করিতে হইলে বহুমুখী এই দুর্জয় প্রতিভার সাধনা ও কর্মকৃতির ব্যাপক ও গভীর আলোচনা ছাড়া আর কোন্ পন্থা আছে, জানি না।

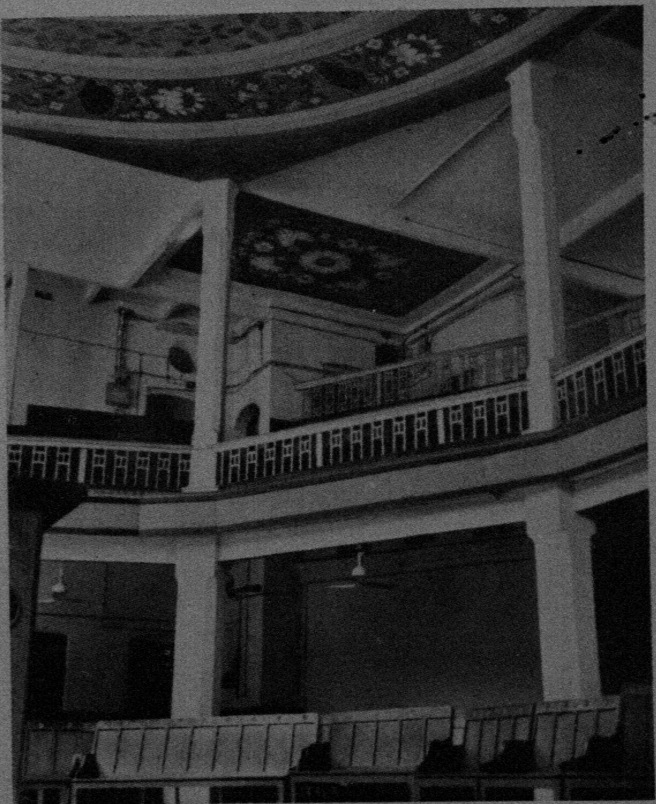
আজ জগদীশচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হইতেছে। এই উপলক্ষে আমাদের মত সাধারণ বাঙালী পাঠকের কথা স্মরণে রাখিয়া গ্রন্থখানির রূপ-পরিকল্পনা করা হইয়াছে। সামান্য হইলেও, জগদীশ-প্রতিভার এই ব্যাপ্তি ও গভীরতার প্রামাণ্য পরিচয় দানের আকাঙ্ক্ষায় নিজেদের বক্তব্য সংক্ষেপ করিয়া আমরা আচার্যের নিজস্ব রচনা ও পত্রাবলী এবং বিভিন্ন বরেণ্য মনীষীর নানাপ্রকার লেখা নির্বাচন করিয়া বাঙালী সমাজের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি। চিত্র-সন্নিবেশের মূলেও ঐ একই আকাঙ্ক্ষা কাজ করিয়াছে। আমাদের এ প্রয়াস হয়ত নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু তদ্দ্বারা সেতুবন্ধে কাঠবিড়ালীর প্রচেষ্টার মতই আমাদেরও শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার অভাব সূচিত হয না,—সূচিত হয সামর্থ্যের অভাব।

পরিশেষে, আর একটি কথা নিবেদন করিয়া বক্তব্য শেষ করিব। প্রথমেই বলিয়াছি, স্বল্প সময়ে এই দুরূহ কাজ সম্পন্ন করিতে গিয়া বিভিন্ন সুধীজন ও বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে আমরা যে সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করিয়াছি, তাহা শ্রদ্ধাব সহিত স্মরণীয়। পৃথকভাবে তাঁহাদের নিকট আমরা ঋণ স্বীকার করিতেছি—মামুলীভাবে নয়, সর্বান্তঃকরণে।

১৬ই অগ্রহায়ণ
১৩৬৫



বসু বিজ্ঞানমন্দিরের অভ্যন্তর : রসায়ন-বিভাগ



বসু বিজ্ঞানমন্দিরের অভ্যন্তর : বক্তৃতা-কক্ষ

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার

আচার্য জগদীশচন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সমিতি

বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষৎ

"সোবিয়েৎ দেশ" পত্রিকা

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উত্তরাধিকারিগণ

ডাঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু

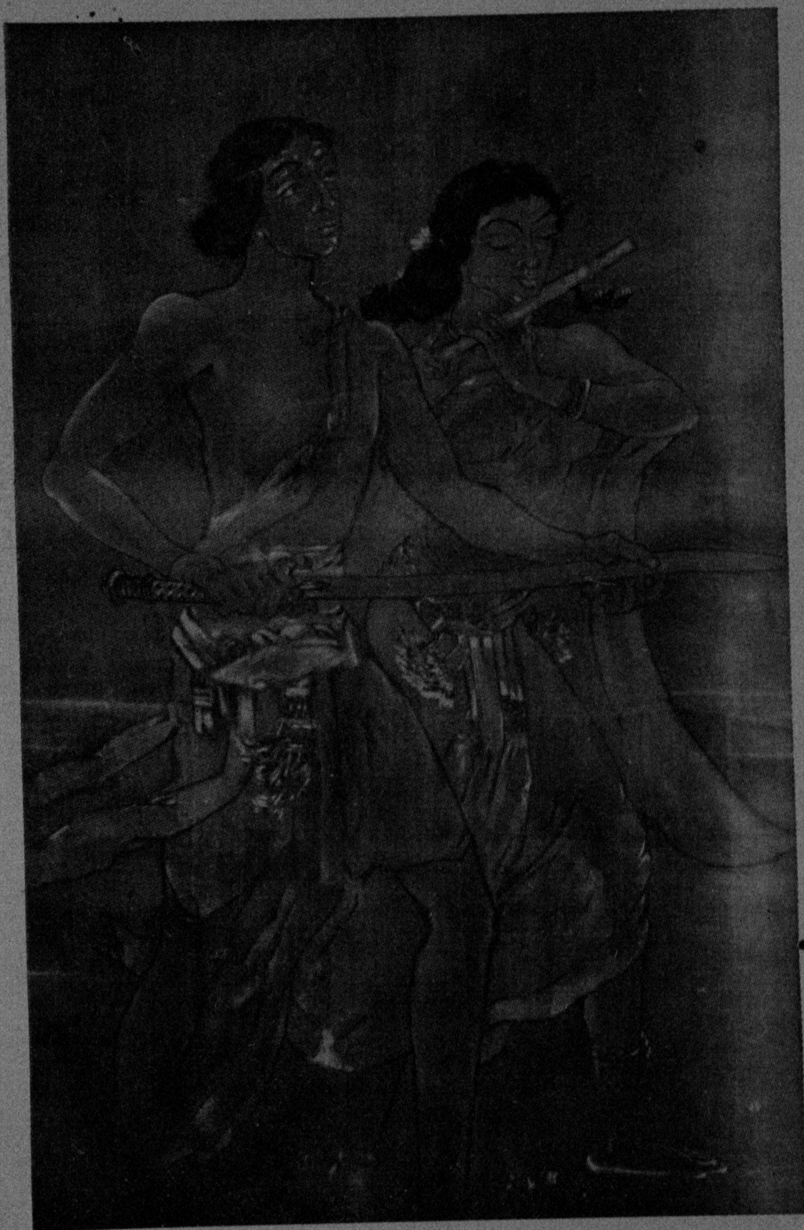
শ্রীপুলিনবিহারী সেন

শ্রীকানাই সামন্ত

শ্রীতারাদাস নাগ

শ্রীনির্মলচন্দ্র রায়

শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত



বক্তৃতামঞ্চের উপরে স্থিত "পুরুষ ও প্রকৃতি" চিত্র

[শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু অঙ্কিত]



জগন্মাতা

[আচার্য কর্তৃক হরপ্পা হইতে সংগৃহীত]



সূর্যদেবতা

[বক্তৃতা-কক্ষের অভ্যন্তরে স্থিত অজন্তা-অনুকরণে]

আবাহন

মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন
কর মহোজ্জ্বল আজহে।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজহে !
ঘন তিমির রাত্রির চিরপ্রতীক্ষা
পূর্ণ কর, লহ জ্যোতিদীক্ষা ;
যাত্রিদল সব সাজহে !
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজহে !
বল "জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বীরাজহে !
জয়হে, জয়হে, জয়হে !"

এস বজ্রমহাসনে, মাতৃআশীর্ভাষণে,
সকল সাধক এসহে, ধন্য কর এ দেশহে !
সকল যোগী, সকল ত্যাগী,
এস দুঃসহ-দুঃখভাগী,
এস দুর্জ্জয়শক্তিসম্পদ
মুক্তবন্ধ সমাজহে !
এস জ্ঞানী, এস কর্ম্মী,
নাশ ভারতলাজহে !

এস মঙ্গল, এস গৌরব,
এস অক্ষয়পুণ্য সৌরভ,
এস তেজঃসূর্য্য উজ্জ্বল
কীর্ত্তি অম্বরমাঝহে!
বীরধর্ম্মে পুণ্যকর্ম্মে
বিশ্বহৃদয়ে রাজহে!
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজহে!
জয় জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বীরাজহে!
জয়হে, জয়হে, জয়হে!

১৪ অগ্রহায়ণ,
১৩২৪।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[বসু-বিজ্ঞানমন্দির-প্রতিষ্ঠা-উৎসবে আবাহনসংগীত]

প্রথম খণ্ড

শৈশব ও বাল্য

মানুষ আসে আর যায়, যারা যায় তাদের বড় কেউ মনে রাখে না। এক কালে যাদের খ্যাতি ছিল, প্রতিষ্ঠা ছিল, মান-মর্যাদা ছিল, পরের কালে তাদের দু-চারজনের মাত্র নাম শোনা যায়। তাও, অনেক সময়, ধূর্তরা তাঁদের নাম ভাঙিয়ে খেতে পায় বলে। যা অতীত তাকে ভুলে যাওয়াটাই সাধারণভাবে স্বাভাবিক এবং শ্রেয়ঃ। যা আর চলে না তাকে, যারা চলছে তাদের উপর চেপে বসতে না দেওয়াই ভাল।

মানুষের নামের চেয়ে তার কীর্তি সত্য, মানুষের কীর্তির চেয়ে সত্য তার যে-মনুষ্যত্ব সে-কীর্তি সম্ভব করেছে সেটা ; বড় মানুষদের সিদ্ধির চেয়ে বড় তাঁদের সাধনার ধারা—তাঁদের সাধনার সংহত আত্মিক শক্তি। যারা চলে গেছে তাঁদের এই শক্তি, যারা চলছে তাদের প্রেরণা জোগায় ও তাদের পথ দেখায়। এই প্রেরণা লাভের জন্যেই চলতি মানুষ অতীতের মানুষকে স্মরণ করে। নতুবা যা বা যাকে স্মরণ করে প্রেরণা পাওয়া যায় না, তা বা তাকে ভুলে যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

আজ আমরা জগদীশচন্দ্রকে স্মরণ করছি, বিজ্ঞান জগতে তিনি যে-কীর্তি স্থাপন করে গিয়েছেন তার জন্যে নয় ; কারণ, তাঁকে স্মরণ না করলেও তাঁর সে-কীর্তি আমাদের মধ্যে থাকবে। আমরা তাঁকে স্মরণ করছি তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা সংগ্রহের জন্যে, তাঁর তপস্যার অগ্নিতে আমাদের প্রাণের দীপ-শিখা জ্বালিয়ে নেওয়ার জন্যে। এইভাবেই আমরা তাঁর আত্মার শ্রেষ্ঠ তর্পণ করতে পারি।

* * *

জগদীশচন্দ্রকে—জগদীশচন্দ্রের জীবনকে বুঝবার জন্যে আমরা জগদীশচন্দ্রেরই শরণ নিচ্ছি, তিনি একবার লিখেছিলেন :

"এখন বুঝিতে পারিতেছি, বাহির ছাড়া ভিতর হইতেও হুকুম আসিয়া থাকে। মনে করিতাম, আমার ইচ্ছাতেই সব হইয়াছে। আমি কি এক ? একটু মনস্থির করিলেই দুই-এর মধ্যে যে সর্বদা কথা বলিতেছে তাহা শুনিতে পাই। ইহারাই আমাকে চালাইতেছে।"

জগদীশচন্দ্রের জীবনকে বুঝতে হলে তাঁর জীবনের পরিবেশকে বুঝলেই হবে না, তাঁর অন্তরস্থ শক্তিটিকেও বুঝতে হবে। তিনি নিজেই বলেছেন, বাইরের শক্তি তাঁর অন্তরে প্রবেশ করেছে, আবার বাইরের আঘাতের ফলে ভিতরের শক্তি উদ্বোধিত হয়েছে এবং তার বলে তিনি বাইরের সঙ্গে যুঝতে সমর্থ হয়েছেন।

আমরা প্রথমে আলোচনা করব তাঁর জীবনের বাইরের শক্তিগুলোকে।

জগদীশচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল ১৮৫৮ সালের ৩০শে নভেম্বর তারিখে। ভারতে তখনও মহাবিদ্রোহের অগ্নি নির্বাপিত হয় নাই; জয়ের আশা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে পড়লেও ভারতীয়দের মধ্যে বিজাতীয় ও বিধর্মীদের আধিপত্য প্রতিরোধ করার সঙ্কল্প তখনও সম্পূর্ণ পরাভূত হয় নাই। বাইরের দিক থেকে দেখলে মনে হয়, মহাবিদ্রোহ বাংলা দেশকে বিশেষ স্পর্শ করে নাই; কিন্তু পরের যুগের ইতিহাস থেকে বোঝা যায়, বাঙালীর চিত্ত ঐ ঘটনায় যথেষ্ঠ আলোড়িত হয়েছিল। বৈদেশিক আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়ার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প বাঙালীদের মধ্যে কোনোদিন অন্তর্হিত হয় নাই, রামমোহনের যুগ থেকেই তার উপায়ও মোটামুটি স্থির হয়ে গিয়েছিল। মহাবিদ্রোহের সময় বাঙালীরা সে-উপায়ের উপযোগিতা যাচাই করার সুযোগ পেল; তাদের সঙ্কল্প ও পথ আরও সুস্পষ্ট হল। জগদীশচন্দ্র জন্ম নিয়েছিলেন ভারতের এই কালান্তরের সন্ধিক্ষণে। জগদীশচন্দ্রের জন্মস্থানও তাঁর জীবনের ব্রত এবং তাঁর চরিত্রগঠনে সাহায্য করেছে। জগদীশচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনায়, রাঢ়িখাল গ্রামে। জন্মস্থান বিক্রমপুরকে জগদীশচন্দ্র কি চোখে দেখতেন, সেটা জানলে তাঁর জীবনাদর্শের কিছুটা বোঝা যায়। প্রাচীন বিক্রমপুরকে স্মরণ করে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন:

"এই দেশে এখনও ভগবান তথাগতের মন্দির ও বিহারের ভগ্ন চিহ্ন স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন ভগবান বুদ্ধদেবের সম্মুখে বহু তপস্যালব্ধ নির্বাণের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল

তখন সুদূর জগৎ হইতে উত্থিত জীবের কাতর ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সিদ্ধপুরুষ তখন তাঁহার দুষ্কর তপস্যালব্ধ মুক্তি প্রত্যাখ্যান করিলেন। যতদিন পৃথিবীর শেষ ধূলিকণা দুঃখচক্রে পিষ্ট হইতে থাকিবে ততদিন তিনি তাহার দুঃখভার স্বয়ং গ্রহণ করিবেন।"

জগদীশচন্দ্রের চোখে, বিক্রমপুর ছিল বিশেষতঃ বুদ্ধের স্মৃতিপূত—যে বুদ্ধ পৃথিবীর লোকের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তাঁর তপস্যাফলকে অকাতরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন!

প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যাকেন্দ্র বলে বিক্রমপুরের একটা খ্যাতি ছিল। বাংলার বৌদ্ধ যুগে এবং ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পুনরুত্থানের যুগে এই বিক্রমপুর ছিল এ দেশের অন্যতম প্রধান বিদ্যাকেন্দ্র —দেশবিদেশ থেকে একদা এখানে ছাত্রেরা শিক্ষার্থ আসত। একদা এখানে একটা মানমন্দিরও ছিল বলে এ অঞ্চলে একটা জনশ্রুতি আছে। সুতরাং, এখানকার লোকে স্বভাবতঃই জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট ছিল। জগদীশচন্দ্রের মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখা যেত, সেটা তিনি প্রথমতঃ তাঁর জন্মস্থান থেকেই লাভ করেছিলেন।

বিক্রমপুর হচ্ছে নদী-খালের দেশ। নদীর আশীর্বাদে ও-অঞ্চলের জমি বেশ উর্বরা। সুতরাং চাষীরা বেশ সমৃদ্ধ। নদী সেখানে চলাচলের পথ। নদীতে প্রচুর মাছ থাকায় অধিবাসীদের একটা বড় অংশ ছিল জেলে। জেলেরা নৌকায় করে মাছ ধরত, সুবিধা পেলে নৌকাযাত্রী পথিকদের মালপত্র লুটতরাজ করত, গ্রামের সম্পন্ন চাষীদের বাড়িতে অকস্মাৎ

ডাকাতি করে নৌকায় উঠে পালিয়ে যেত। সুতরাং সে-অঞ্চলের লোকদের মধ্যে একদিকে গড়ে উঠেছিল দুঃসাহস আর একদিকে প্রতিরক্ষার সতর্কতা। এখানকার লোক ডাকাতদের ধরার জন্যে বহুদূর পর্যন্ত তাড়া করতে কোনোদিন পিছপা হয় নাই। প্রাচীনকালের একজন পর্যটক এ-অঞ্চলের লোকের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিল, "এরা কঠিন লোক, এদের আক্রমণ করলে এরা প্রাণপণে আত্মরক্ষা করে।" পূর্ববঙ্গের নদী-খাল এখানকার অধিবাসীদের দিয়েছে তাদের বাঙালের গোঁ।

পূর্ববঙ্গের নদীগুলো তাকে অবিরত ভাঙছে আর গড়ছে—একদিকে নদীর কূল ভাঙছে আর একদিকে নতুন নতুন চর উঠছে। এই ভাঙা-গড়ার খেলা দেখে এখানকার লোক অন্য জায়গার লোকের তুলনায় পুরানোকে অন্ধভাবে আঁকড়ে থাকে না, নতুনকে তেমন ভয় করে না। জগদীশচন্দ্রের মানস-গঠনে পূর্ববঙ্গের ভূ-প্রকৃতির এ প্রভাব যথেষ্টই দেখা গিয়েছিল। তাঁর বিদ্যাপ্রেম, তাঁর সাহস, তাঁর গোঁ তিনি পেয়েছিলেন তাঁর জন্মস্থানের ভূ-প্রকৃতির কাছ থেকে।

এবার জগদীশচন্দ্রের পারিবারিক পরিবেশ কেমন ছিল, দেখা যাক।

জগদীশচন্দ্রের শৈশবে তাঁর পিতা—ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন ফরিদপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সেকালে এসব অঞ্চলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ সম্পাদনের জন্যে শুধু ন্যায়বুদ্ধি ও পরিশ্রম-শক্তি থাকলেই চলত না, প্রচুর সাহস ও কর্মোদ্যমেরও প্রয়োজন হত, এমন কি প্রায়ই শারীর বলেরও দরকার হত।

ভগবানচন্দ্রের মধ্যে এসব গুণের অভাব ছিল না। একবার তিনি একটা ডাকাতির খবর পেয়ে তখনই হাতীতে উঠে কয়েকটা মাত্র পুলিস সঙ্গে নিয়ে ডাকাতদের ঘাঁটিতে গিয়ে পড়লেন ; ডাকাতরা এই অকস্মাৎ আক্রমণে ভয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল আর ভগবানচন্দ্র নিজের হাতে ডাকাতদের সর্দারের হাত-পা বেঁধে তাকে বিচারের জন্যে নিয়ে এলেন।

তাঁর এই সাহস ও কর্মনিষ্ঠার জন্যে ভগবানচন্দ্রকে বিপন্ন হতেও হত। একবার একদল ডাকাত জেলে যাওয়ার সময় তাঁকে শাসিয়ে গেল, 'বেরিয়ে এসে লালঘোড়া ছোটাবো!' তারা কথা রেখেছিল ; বছর তিন চার পরে একদিন ভগবানচন্দ্রের ফরিদপুরের বাড়িতে আগুন জ্বলল ; বাড়ির লোকে প্রাণে বাঁচল, কিন্তু সর্বস্ব পুড়ে গেল।

ভগবানচন্দ্র একদিকে যেমন ছিলেন বজ্রের মতো কঠোর, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন অসাধারণ রকম ক্ষমাশীল। পুত্র জগদীশচন্দ্র গল্প করতেন, তিনি যখন পাঁচ ছয় বছরের ছেলে, তখন ফরিদপুরের মেলায় পাঠান সিপাইদের কুস্তিব খেলা দেখানো হত। সেবার এক চাষী বলে উঠল, সে পাঠানদের মধ্যে যে সেরা কুস্তিগির তার সঙ্গে লড়তে পারে! ভগবানচন্দ্র ঐ চাষীর সঙ্গে পাঠানদের সেরা কুস্তিগিরের লড়াইয়ের ব্যবস্থা করলেন। লড়াইয়ে বাঙালী চাষীটাই জিতল ; কুস্তিতে হেরে গিয়েও পাঠান সিপাইটা চাষীটাকে না ছেড়ে তার গলায় পা দিয়ে তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করল ; ভগবানচন্দ্র স্বয়ং পাঠানটার পায়ে লাঠি মেরে তাকে চাষীর গলার উপর থেকে পা সরাতে

বাধ্য করলেন। সকলের সামনে অপদস্থ হয়ে পাঠান সিপাইটা সেদিন সন্ধ্যায় ভগবানচন্দ্রকে খুন করার জন্য মেলার যাত্রা-মণ্ডপে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। যথাসময়ে ভগবানচন্দ্রকে না পেয়ে পাঠান কুস্তিগিরটি তার সিপাই ভাইদের সঙ্গে নিয়ে যাত্রা ভেঙে দেবার উদ্যোগ করল। মেলায় গোলমাল হচ্ছে শুনে ভগবানচন্দ্র মেলায় এসে ব্যাপার দেখলেন, সিপাইদের হাত থেকে তিনি একের পর এক লাঠি কেড়ে নিলেন। কুস্তিগির পাঠানটির লাঠির ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ল একটি তলোয়ার! সে সকলের সমক্ষে ভগবানচন্দ্রের পায়ে পড়ে স্বীকার করল যে, তাঁকেই খুন করার জন্য সে গুপ্তি এনেছিল। ভগবানচন্দ্র তাকে সহজেই প্রাণদণ্ড দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা করলেন না। তাকে কর্মচ্যুত পর্যন্ত করলেন না। সিপাইটি তারপর থেকে ভগবান-চন্দ্রের খুব অনুগত ছিল।

একবার এক ডাকাত জেল থেকে বেরিয়ে সোজা ভগবান-চন্দ্রের কাছে এসে বলল, "ভাল ভাবে তো থাকতে চাই, কিন্তু আমাকে কাজ দেবে কে?" ভগবানচন্দ্র কোনো দ্বিধা না করে নিজেই তাকে নিযুক্ত করলেন, তার কাজ হল—শিশু জগদীশ-চন্দ্রকে পাঠশালায় নিয়ে যাওয়া, সেখান থেকে নিয়ে আসা; যাতায়াতের পথে ডাকাতটি জগদীশচন্দ্রকে তার দুঃসাহসিক জীবনের কত কাহিনী শোনাত। ভগবানচন্দ্র ফরিদপুরে যতকাল ছিলেন, এই ডাকাত তাঁর সেবা করেছিল—দীর্ঘ পাঁচ বছর। পাঁচ বছর ডেপুটিবাবুর চাকর থাকার পর, ডাকাতটির পক্ষে কাজ পাওয়া আর শক্ত না হওয়ারই কথা। সঙ্কোচহীন বিশ্বাস স্থাপন

করে পতিত মানুষের আত্মমর্যাদা-জ্ঞান উদ্বোধিত করার এমন দৃষ্টান্ত কয়টা দেখা যায় ?

বর্ধমানে সহকারী কমিশনার থাকার কালে এবং কাটোয়া মহকুমার প্রধান সরকারী কর্মকর্তা থাকার সময় ভগবানচন্দ্র যেসব কাজ করেছিলেন, শুধু সরকারী দায় সম্পাদনের জন্যে সে-সবের সামান্য অংশের মাত্র হয়তো দরকার ছিল ; সেসব তিনি করেছিলেন তাঁর স্বজাতিপ্রীতির, তাঁর সবল মনুষ্যত্বের তাগিদে। বর্ধমান যখন ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়ে যাচ্ছিল, সেখানকার অনাথ বালকরা যাতে একেবারে ভেসে না যায় তার জন্যে ভগবানচন্দ্র তাদের জন্যে ছুতোর, কাঁসারী প্রভৃতির কাজ শেখানোর ব্যবস্থা করেন ; শিক্ষালয়ের জন্যে বাড়ি না পাওয়ায় তিনি নিজের বাংলোরই একটা অংশ ছেড়ে দেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে কাটোয়া মহকুমায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে, দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের দুর্দশা লাঘবের জন্যে ভগবানচন্দ্র সমস্ত দিন গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন, আর সে সময় তিনি খেতেন মাত্র দু-এক মুঠো গমের ছাতু ! বুভুক্ষু লোকদের মধ্যে থেকে তিনি তার বেশী কিছু খেতে পারতেন না। ঐ সময়ে কঠোর পরিশ্রম করায় তাঁর চমৎকার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে—তিনি এক বছরের জন্যে ছুটি নিতে বাধ্য হন।

জগদীশচন্দ্র তাঁর পিতার সম্বন্ধে লিখেছেন :

"তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা।

"তিনি অতদিন পূর্বেও দিব্যচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, শিল্প-বাণিজ্য এবং কৃষি উদ্ধার না করিলে দেশের আর কোন উপায়

নাই। দেশে যখন কাপড়ের কল প্রথম স্থাপিত হয় তাহার জন্য তিনি জীবনের প্রায় সমস্ত অর্জন দিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রথম পথ-প্রদর্শক হন তাঁহাদের যে গতি হয়, তাঁহার তাহাই হইয়াছিল। বিবিধ নূতন উদ্যমে তিনি বহু ক্ষতিগ্রস্ত হন। কৃষকদের সুবিধার জন্য তাঁহারই প্রযত্নে সর্বপ্রথমে ফরিদপুরে লোন অফিস হয়। এখানে তাঁহার সমস্ত স্বত্ব পরকে দিয়াছিলেন।··· তাঁহারই প্রযত্নে কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য ফরিদপুরে মেলা স্থাপিত হয়। তিনিই আসামে স্বদেশী চা-বাগান স্থাপন করেন। তাহাতেও তাঁহার অনেক ক্ষতি হইয়াছিল।··· তিনিই প্রথমে নিজ ব্যয়ে টেকনিকেল স্কুল স্থাপন করেন এবং তাহার পরিচালনে সর্বস্বান্ত হন।

"তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। সুখসম্পদের কোমল শয্যা হইতে তাঁহাকে দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সকলেই বলিত, তিনি তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছেন।

"ব্যর্থ!··· কিন্তু সেই ব্যর্থতার ফলে বহুজীবন সফল হইয়াছে।··· তাঁহার জীবন দেখিয়া শিখিয়াছিলাম যে, সার্থকতাই ক্ষুদ্র এবং বিফলতাই বৃহৎ। এইরূপে যখন ফল ও নিষ্ফলতার মধ্যে প্রভেদ ভুলিতে শিখিলাম, তখন হইতে আমার প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হইল। যদি আমার জীবনে কোন সফলতা হইয়া থাকে তবে তাহা নিষ্ফলতার স্থির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।"

ভগবানচন্দ্রের মতো কর্মব্যস্ত মানুষ অনেক সময় নিজেদের ছেলেপিলের দিকে নজর দেওয়ার সময় পান না—তাদের দেখাশোনা করার ভার অন্যের উপর ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত থাকেন।

ভগবানচন্দ্র কিন্তু সে-প্রকৃতির লোক ছিলেন না। জগদীশ-চন্দ্রের শৈশব ও বাল্য অতিবাহিত হয়েছিল পিতার প্রত্যক্ষ ও সস্নেহ যত্নের মধ্যে। সারাদিন পরিশ্রমের পর ভগবানচন্দ্র যখন ছেলের পাশে এসে শুতেন, জগদীশচন্দ্র তখন এটা-সেটা প্রশ্ন করে চলতেন। শিশুমনের কৌতূহলের কি আদি-অন্ত আছে! সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া পিতার পক্ষেও সম্ভব হত না, তিনি কিন্তু কখনও পুত্রের কৌতূহলবৃত্তিকে দমিত করতেন না, কখনও বিরক্ত হতেন না, বলতেন, "ওটা তো জানি না; মানুষ এখনও অনেক কিছু বোঝে না।"

সে-সময় জগদীশচন্দ্রের প্রশ্নগুলো কেমন ছিল তার একটু আঁচ নেওয়া যাক।

একদিন জগদীশচন্দ্র তাঁর বাবাকে বললেন, "বাবা, জানো, আজ একটা ঝোপে দেখলাম আগুন জ্বলছে—অনেক আগুন। কাছে গিয়ে দেখি, ঝোপে নয়, একরকম মাছির গায়ে আগুন জ্বলছে আর নিভছে! ও মাছিগুলো জ্বলে কেন?"

জোনাকি দেখে জগদীশচন্দ্রের এ বিস্ময় ও কৌতূহল থেকে সেকালেই যে তাঁর প্রকৃতি-নিরীক্ষার অভ্যাস গড়ে উঠছিল, তার আভাস পাওয়া যায়। সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে জগদীশচন্দ্রের কাছে সবচেয়ে প্রিয় ছিল—নদী। ফরিদপুরের সরকারী বাংলোর নীচেই ছিল পদ্মা,—শিশু জগদীশচন্দ্র মুগ্ধ চোখে চেয়ে থাকতেন তার স্রোতের দিকে। তাঁর নিজের ভাষায়—নদীকে তাঁর "একটি গতি-পরিবর্তনশীল জীব বলিয়া মনে হইত।" পিতাকে তিনি নদী সম্বন্ধে কি কি প্রশ্ন করেছিলেন জানা যায় না, কিন্তু

নদীর অর্থাৎ প্রবাহের যে-ছবি উত্তরকালে তাঁর বিজ্ঞান-সাধনাকে এবং সর্ববিধ রূপকল্পনাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই।

শিশু জগদীশচন্দ্র যে খুব শান্তশিষ্ট ছিলেন, এমন নয়। আমাদের দেশে শিশুর সবচেয়ে বেশী দুরন্তপনা চলে ঠাকুমার সঙ্গে। শ্রান্ত ভগবানচন্দ্র যখন পুত্রের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে হাই তুলতে শুরু করতেন, ঠাকুমা লাঠি উঁচিয়ে জগদীশচন্দ্রকে মারার ভয় দেখাতেন, বলতেন, "আমার ছেলেটাকে মারবি না কি তুই? ঘুমো, নয়তো এই লাঠি তোর পিঠে ভাঙব।" জগদীশ-চন্দ্র এতটুকু গ্রাহ্যও করতেন না। তবে ঠাকুমার সঙ্গে একটা ব্যাপারে শিশুর বোঝাপড়া ছিল। বৃদ্ধা রোজ মাটির শিব গড়ে পূজো করতেন; পূজো শেষ হলে মাটিটা ছিল শিশুর প্রাপ্য। একদিন ঠাকুমার পূজো শেষ হতে বড় দেরি হচ্ছে দেখে জগদীশ-চন্দ্র খপ্ করে শিবটা তুলে নিয়ে দৌড় দিলেন! তার ফলে, ঠাকুমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হল, দেবতার রোষ ফেরাবার জন্যে ব্রাহ্মণ খাওয়াতে হল।

মায়ের কাছে বকুনি খেয়ে শিশু জগদীশচন্দ্র একদিন চুপি চুপি দৌড়ে গিয়ে একটা আখের ক্ষেতে ঢুকলেন, ক'দিন আগে সে-ক্ষেতে একটা বাঘ এসেছিল! যাবার সময় জগদীশচন্দ্রের নিশ্চয়ই শুধু মনে ছিল, তাঁকে বাঘে ধরলে মা কেমন জব্দ হবে! সে-সময় তাঁর ভুল হয়েছিল এই যে, আখ ক্ষেতে যাওয়ার কথাটা মাকে জানিয়ে আসেন নি। সুতরাং আখ ক্ষেতে একটু খস্‌খস্ শব্দ হতেই মায়ের ডাকের জন্যে অপেক্ষা না

করে তাঁকে ঘরে ফিরতে হল—সেবারকার মতো মাকে জব্দ করা আর হল না।

জগদীশচন্দ্রের বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে একটা টাট্টু ঘোড়া উপহার পান। ঐ বয়সেই তিনি কারও সাহায্য না নিয়ে ঘোড়া দৌড়াতে পারতেন। একদিন ফরিদপুরের বড়দের ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা হচ্ছে, নিজের টাট্টুর পিঠে চড়ে জগদীশচন্দ্র এসেছেন সেখানে। কে একজন দর্শক শিশু-ঘোড়সওয়ারকে বলল, "তুমিও পাল্লা দেবে বুঝি!" আর যায় কোথা? জগদীশচন্দ্র অমনি বড়দের পিছনে তাঁর ঘোড়া ছোটালেন? তাঁর টাট্টুর লাগাম ছিল দড়ির; ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে টিকে থাকতে গিয়ে তাঁর শরীরের নানা জায়গা বেশ ছড়ে গেল, তবু তিনি প্রথমবারের চক্করটি পুরোই দিলেন। ঐ বয়স থেকেই তাঁর চরিত্রের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা স্পষ্ট ফুটে উঠছিল।

পাঁচ বছর বয়সে জগদীশচন্দ্র পাঠশালা যেতে শুরু করলেন। ফরিদপুরে তখন দুটো স্কুল ছিল; একটি বাংলা স্কুল—সাধারণ লোকের ছেলেদের জন্যে ভগবানচন্দ্র নিজেই সেটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আর একটি সরকারী ইংরেজী স্কুল।

এ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র নিজেই বলেছেন, "শৈশবকালে পিতৃদেব আমাকে বাঙ্গলা স্কুলে প্রেরণ করেন। তখন সন্তান-দিগকে ইংরেজী স্কুলে প্রেরণ আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য হইত। স্কুলে দক্ষিণদিকে আমার পিতার মুসলমান চাপরাশীর পুত্র এবং বামে এক ধীবর পুত্র আমার সহচর ছিল। তাহাদের নিকট আমি পশুপক্ষী ও জলজন্তুর জীবনবৃত্তান্ত স্তব্ধ হইয়া

শুনিতাম। সম্ভবতঃ প্রকৃতির কার্য অনুসন্ধানে অনুরাগ এই সব ঘটনা হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। ছুটির পর যখন বয়স্যদের সহিত আমি বাড়ী ফিরিতাম তখন মাতা আমাদের আহার্য বণ্টন করিয়া দিতেন। যদিও তিনি সেকেলে এবং একান্ত নিষ্ঠাবতী ছিলেন, কিন্তু এই কার্যে যে তাঁহার নিষ্ঠার ব্যতিক্রম হয় তাহা কখনও মনে করিতেন না। ছেলেবেলায় সখ্যতাহেতু ছোট জাতি বলিয়া যে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর প্রাণী আছে এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে এক সমস্যা আছে তাহা বুঝিতেও পারি নাই।"

ভগবানচন্দ্র যে বন্ধুবান্ধবদের নিষেধ অগ্রাহ্য করে, আভি-জাত্যের তোয়াক্কা না রেখে তাঁর একমাত্র পুত্রকে সাধারণ লোকদের ছেলেদের সঙ্গে একত্র পড়বার জন্যে বাংলা পাঠশালায় দিয়েছিলেন তার একমাত্র কারণ স্বদেশ ও স্বভাষার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম প্রীতি।

সেকালের পাঠশালায় শুধু লিখতে পড়তে আর হিসাব করতে শেখানো হত। গুরুমশাইরা চাইতেন, ছেলেরা বইপত্র নিয়েই সারাদিন পড়ে থাকুক ; ছেলেদের খেলাধুলো করাটা তাঁরা পছন্দ করতেন না। ছেলেদের খেলাধুলো করতে হত লুকিয়ে-চুরিয়ে। জগদীশচন্দ্রও তাই করতেন।

পাঠশালার শিক্ষায় ছেলেদের মন গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকলেও, তার খোরাক জোগানোর ব্যবস্থা ছিল যাত্রাগান প্রভৃতি মারফত। এ দেশের লোকরঞ্জনের চিরন্তন উৎস হচ্ছে রামায়ণ ও মহাভারত। শৈশবেই যাত্রাগান শুনে জগদীশচন্দ্রের

রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী জানা হয়ে গিয়েছিল। ক্রমে ঠাকুমা, মা'র কাছে এই মহাকাব্য দুটি পড়তে শেখেন তিনি। রামায়ণ-মহাভারত থেকেই—বিশেষতঃ মহাভারত থেকে—জগদীশচন্দ্র তাঁর জীবনের আদর্শ সংগ্রহ করে নেন। রামায়ণের রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতির চরিত্র-মাহাত্ম্য যেন মানুষের অনধিগম্য ; মহাভারতের কিছু কিছু দোষে-গুণে মেশানো অথচ মহামহিম চরিত্রগুলো তাই সম্ভবতঃ জগদীশচন্দ্রের মনকে মুগ্ধ করত। মহাভারতের চরিত্রগুলোর মধ্যে আবার কর্ণ ছিল জগদীশচন্দ্রের আদর্শ বীর, অধিক বয়সেও কর্ণের মহিমা-কীর্তন করতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন।

বাল্যকালে এবং পরবর্তী জীবনে কোন্ কোন্ বই তাঁর মনে ছাপ রেখে গিয়েছে, এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি লিখেছিলেন, "বাল্যকালে মহাভারত পাঠ করিয়াই জীবনের আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিলাম। যে রীতিনীতি মহাভারতে প্রচারিত হইয়াছিল সেই নীতি যেন বর্তমান কালেও জীবন্তভাবে প্রচারিত হয়। তদনুসারে যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফল-নিরপেক্ষ হইতে পারেন। তাহা হইলে বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন যে, বারবার পরাজিত হইয়া যে পরাঙ্মুখ হয় নাই, সেই একদিন বিজয়ী হইবে।"

কর্ণ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন, "ভীষ্মের দেব-চরিত্রে আমরা অভিভূত হই, কিন্তু কর্ণের দোষগুণ-মিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত আমাদের অনেকটা সহানুভূতি

হয়। ঘটনাচক্রে যাহার জীবন পূর্ণ হইতে পারে নাই, যাহার জীবনে ক্ষুদ্রতা ও মহৎভাবের সংগ্রাম সর্বদা প্রজ্বলিত ছিল, যে এক এক সময়ে মানুষ হইয়াও দেবতা হইতে পারিত, এবং যাহার পরাজয় জয় অপেক্ষাও মহত্তর, তাহার দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়।"

কর্ণের মধ্যে তিনি নিজের পিতার মূর্তি দেখতে পেতেন, তাই মহাভারতের এই বীর ছিল জগদীশচন্দ্রের এত প্রিয়।

ভগবানচন্দ্র বর্ধমানে বদলী হওয়াতে জগদীশচন্দ্র ফরিদপুরের স্কুল ছেড়ে কলকাতায় হেয়ার স্কুলে এসে ভর্তি হলেন। তখন তার বয়স মাত্র নয় বছর। তিনি সে স্কুলে মাত্র তিনমাস পড়েছিলেন। বাঙলা ভাষার বুনিয়াদী শিক্ষা জগদীশচন্দ্রের মোটামুটি হয়ে গিয়েছিল, এখন তিনি যাতে ইংরেজীতেও বেশ পাকা হতে পারেন, তার জন্যে তাঁকে সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে দেওয়া হল। সে স্কুলে সেকালে শুধু সায়েবদের ছেলেরাই পড়ত, সুতরাং 'নেটিভ' জগদীশচন্দ্রকে তাঁর ক্লাসের ওস্তাদ ইংরেজ ছেলের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধে জয়লাভ করে স্কুলে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল। ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে ভাব হয়ে গেলেও, সদ্য মা-বাবা ছাড়া জগদীশচন্দ্রকে ঐ সময় বেশ কষ্ট পেতে হয়েছিল। জগদীশচন্দ্র যে হোস্টেলে থাকতেন, সেখানে শুধু কলেজের ছেলেরা থাকত ও তারা বালক জগদীশচন্দ্রকে বিশেষ লক্ষ্য করত না। সুতরাং হোস্টেলের একধারে একটি বাগান করে তার গাছপালাকে নিয়ে তাঁকে সময় কাটাতে হত। হাত-খরচের টাকা দিয়ে তিনি যেসব জীব কিনে পুষেছিলেন সেগুলো ছিল তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনের

সঙ্গী। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে থাকা কালে তাঁর কাছে মহা-আনন্দের ছিল পূজো আর গরমের ছুটির দিনগুলো। ঐ দুটো সময় তিনি মা-বাবার কাছে যেতেন। বোনদের সঙ্গে খেলা করে, তাঁর সখের টাট্টুর পিঠে চড়ে, ঠাকুমা-মা'র উপর দুরন্তপনা করে তাঁর দিনগুলো কোন্ দিক দিয়ে চলে যেত, তিনি টের পেতেন না।

বিদ্যার্থী জীবন

ষোল বছর বয়সে জগদীশচন্দ্র সেণ্ট জেভিয়াস কলেজে প্রবেশ করেন। তখনও তিনি বিশেষ কোনো প্রতিভার পরিচয় দেন নাই। ছাত্র মন্দ ছিলেন না, মোটামুটি ভালই ছিলেন। কিন্তু কোনো বিষয়ে বিশেষ রুচি বা অধিকার তখনও দেখা দেয় নাই। কলেজে প্রকৃতি-বিজ্ঞান পড়াতেন ফাদার লাফঁ (Lafont); পদার্থ-বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো তিনি ছাত্রদের কাছে সযত্নে পরীক্ষা করে দেখাতেন, সঙ্গে সঙ্গে অতি বিশদভাবে সেগুলো তাদের বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর পড়ানোর গুণে জগদীশচন্দ্র ক্রমে পদার্থ-বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ রকম আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। জগদীশচন্দ্র উত্তর জীবনে যে তত্ত্বযাচাই সম্পর্কে সাবধানতা ও তত্ত্বের ব্যাখ্যার পারদর্শিতা দেখিয়ে বিজ্ঞানীদের বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন, সেগুলো তিনি শিখে নিয়েছিলেন এই পাদ্রী অধ্যাপকের কাছে।

কলেজে পড়ার সময় বিজ্ঞানের উপর ঝোঁক পড়লেও, জগদীশচন্দ্রের মনে তখনও বিজ্ঞানী হওয়ার বাসনা দেখা দেয়নি।

যথাকালে সুখ্যাতির সঙ্গে বি. এ. পাস করার পর, তিনি উচ্চতর শিক্ষার জন্যে বিলাত যাওয়ার প্রস্তাব করলেন। তাঁর পিতা তখন দেশীয় শিল্পের প্রতিষ্ঠা-সাধন করতে গিয়ে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিলেন, তার উপর চাকরিতে দু বছরের ছুটিও নিয়েছিলেন। তবু তিনি পুত্রের উন্নতির পথে বাধা হতে চাইলেন না। জগদীশচন্দ্র চাচ্ছিলেন, পরীক্ষা দিয়ে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ঢুকতে। ভগবানচন্দ্র কিন্তু ছেলের ম্যাজিস্ট্রেট হওয়া বা ব্যারিস্টার হওয়ার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট আপত্তি জানালেন ; বললেন, "না, বিজ্ঞান শিখে এসে দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি করো।" ছেলে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে সাধারণ দেশবাসী থেকে আলাদা হয়ে যায়, এটা তিনি চাইলেন না। শেষ পর্যন্ত স্থির হল, জগদীশচন্দ্র বিলাত গিয়ে ডাক্তারি পড়বেন।

জগদীশচন্দ্রের মা কিন্তু ছেলের বিলাত যাওয়ার প্রস্তাবে রাজী হলেন না। ঐ সময় জগদীশচন্দ্রের একমাত্র ভাইটি মারা যাওয়ায়, জগদীশচন্দ্রের প্রস্তাবে তিনি একেবারে ভেঙে পড়লেন। মায়ের মুখ চেয়ে জগদীশচন্দ্র বিলাত যাওয়ার কথা আর মুখে আনলেন না। ছেলের মন-মরা ভাব দেখে মা'ই কিন্তু একদিন জানালেন, জগদীশচন্দ্রের বিদেশ যাওয়াতে তিনি বাধা দিতে চান না ; তাঁর অলঙ্কারগুলো বিক্রি করে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ায় ভগবানচন্দ্র ঐ সময় আবার সরকারী কাজে যোগ দিলেন। মায়ের অলঙ্কার বিক্রি করার দরকার হল না। জগদীশচন্দ্র ডাক্তারি শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার কিছুকাল আগে থেকে জগদীশচন্দ্র প্রায়ই মাঝে মাঝে প্রবল জ্বরে ভুগছিলেন। আসামের এক শিকারী জমিদারের আমন্ত্রণে জগদীশচন্দ্র তেরাই অঞ্চলে শিকার করতে গিয়েছিলেন, সেখানে তাঁর এই রোগের উৎপত্তি হয়। কুইনিনেও এ জ্বর বাগ মানত না। এ জ্বর ছিল আসামের কুখ্যাত কালাজ্বর! জাহাজে থাকতেই জগদীশচন্দ্র এই জ্বরের আক্রমণে প্রায় যেতে বসেছিলেন।

বিলাতে পৌঁছে জগদীশচন্দ্র লণ্ডনে ডাক্তারি পড়তে লাগলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে মড়া-কাটার ঘরে কাজ করতে গিয়ে তাঁর জ্বর ঘন ঘন ফিরে আসতে লাগল। ডাক্তারদের পরামর্শে তিনি ডাক্তারি পড়া ছেড়ে কেম্ব্রিজে গেলেন—বিজ্ঞান শিক্ষার জন্যে। ১৮৮১ সালে তিনি একটা ছাত্রবৃত্তি পেয়ে ক্রাইস্টান কলেজে ভর্তি হলেন। কেম্ব্রিজে এসে জগদীশচন্দ্র ওষুধ খাওয়া ছেড়ে প্রতিদিন বাইচ খেলতে লাগলেন। তার ফলে তাঁর শরীরে কিছু বল ফিরে এল বটে, কিন্তু জ্বর সারল না। দ্বিতীয় বছরে তাঁর জ্বর গেল বটে কিন্তু অনিদ্রা রোগে ধরল ; কয়েক বছর ধরেই তাঁকে রোগে কষ্ট পেতে হয়েছিল।

কেম্ব্রিজে ভর্তি হওয়ার পর প্রথম বছর জগদীশচন্দ্র স্থির করতে পারেন নি, তিনি বিজ্ঞানের কোন্ কোন্ বিষয় পড়বেন ; ঐ সময় পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, শারীরবৃত্ত, প্রাণী-বিদ্যা, ভূবিদ্যা—সব বিষয়েরই পড়ানো শুনতেন, পরীক্ষণাগারে গিয়ে পরীক্ষণ দেখতেন। দ্বিতীয় বছরে তিনি কেবল পদার্থ-

বিদ্যা, রসায়ন ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় মনোযোগ দিলেন। কেম্ব্রিজে পড়ার সময় তিনি বিলাতের কয়েকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান; তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক লর্ড র‍্যালি ও অধ্যাপক ভাইন্‌সের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উত্তরকালে এই দুইজন অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রকে যথাক্রমে রয়েল সোসাইটি ও লিনিয়ান সোসাইটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রায় চার বছর বিলাতে থাকার পর, কেম্ব্রিজের ট্রাইপস্‌ ও লণ্ডনের বি. এসসি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৮৫ সালে জগদীশচন্দ্র স্বদেশে ফিরে আসেন।

সংসার-সমরে

জগদীশচন্দ্রের বয়স তখন পঁচিশ বছর। বিলাত ছাড়ার মুখে তিনি ভাবতীয় শিক্ষা-বিভাগে একটি চাকরি সংগ্রহ করার চেষ্টা করলেন। ভগ্নীপতি আনন্দমোহন বসু মশাইয়ের বন্ধু বিলাতের তখনকার পোস্টমাস্টার জেনারেল ফসেট সায়েবের চিঠি নিয়ে তিনি ভারতের বড়লাট লর্ড রিপনের সঙ্গে দেখা করলেন। লর্ড রিপন আশ্বাস দিলেন যে, তিনি জগদীশচন্দ্রকে ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগের একটা চাকরি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। রিপন বাংলা সরকারকে জগদীশচন্দ্রের কথা লিখলেনও, কিন্তু জগদীশচন্দ্র যখন কলকাতা এসে শিক্ষা-বিভাগের বড়কর্তার সঙ্গে দেখা করলেন, তিনি বললেন, "ভারতীয় শিক্ষা-বিভাগে কোনো চাকরি খালি নেই; প্রাদেশিক শিক্ষা-বিভাগে চাকরি নিলে পরে তোমার উন্নতি হতে পারে।"

জগদীশচন্দ্র তাতে রাজী হলেন না। এদিকে, গেজেটে জগদীশচন্দ্রের নাম ওঠে নি দেখে লর্ড রিপন বাংলা সরকারের কাছে কৈফিয়ত চেয়ে পাঠালেন। উপরের চাপ পেয়ে শিক্ষা-

বিভাগের বড়কর্তা জগদীশচন্দ্রকে ডেকে উচ্চতর পর্যায়েই একটা চাকরি দিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেন, "এ চাকরি স্থায়ী নয় ; যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারলে স্থায়ী হতে পারবেন।"

সেকালের সাম্রাজ্যমদোদ্ধত ইংরেজরা বিশ্বাস করত এবং প্রচার করত, ভারতীয়রা "কেবল ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট", তারা হয়তো কিছু কিছু সাহিত্যাদি চর্চা করতে পারে, দর্শনের চুলচেরা আলোচনা করতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞান আয়ত্ত করা তাদের একেবারেই সাধ্যাতীত। সুতরাং বিজ্ঞান পড়াতে হলে ভারতে ইউরোপীয় অধ্যাপক ছাড়া গতি নাই। জগদীশচন্দ্রকে যখন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অস্থায়ী অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়েছিল, কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ সে-নিয়োগের বিরুদ্ধে তখন ঐ কারণই দেখিয়েছিলেন।

জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে কাজে যোগ দেওয়ার পর জানতে পারলেন, তিনি ইউরোপীয় নন বলে এবং অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত বলে ঐ পদের জন্যে নির্দিষ্ট বেতনের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পাবেন। তিনি প্রতিবাদ করলেন। প্রতিবাদের কোনো ফল না হওয়ায় ঐ পরিমাণে বেতন নিতে অস্বীকার করলেন। দীর্ঘ তিন বছর তিনি ঘরের খেয়ে অধ্যাপনা করে চললেন। ঐ সময় তাঁর পরিবারের অবস্থা যে ভাল ছিল, এমন নয়। বরং তার বিপরীতটাই ছিল সত্য। পিতা ভগবানচন্দ্র তাঁর প্রতিষ্ঠিত পিপ্‌ল্‌স্‌ ব্যাঙ্ক-এর লাভের শেয়ারগুলো দরিদ্র বন্ধুদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে, লোকসানের কারবারগুলোর দায় বয়ে

চলেছিলেন। পিতা অত্যন্ত ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ায় জগদীশচন্দ্র তাঁদের দেশের বিষয়সম্পত্তি সমস্ত বিক্রি করে দিলেন। তাতে ঋণের অর্ধেকমাত্র শোধ হল। মায়ের সমস্ত অলঙ্কার বিক্রি করার পরও ঋণের এক-চতুর্থাংশ বাকি রইল। সেটুকু জগদীশ-চন্দ্র নিজের আয় থেকে পরিশোধ করার সঙ্কল্প করলেন। এদিকে তিন বছর তিনি কলেজের বেতন নিচ্ছিলেন না; তিন বছর পর সরকারী কর্তৃপক্ষ পুরো হারে বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিয়ে জগদীশচন্দ্রকে স্থায়ী অধ্যাপক করে নিলেন। থোক টাকা পেয়ে জগদীশচন্দ্র তার সমস্তটা পিতার উত্তমর্ণদের হাতে তুলে দিলেন, তারপরেও যা বাকি রইল সেটা তিনি পরের ছয় বছরে শোধ করে দিয়েছিলেন। সমস্ত ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর ভগবানচন্দ্র এক বছর মাত্র জীবিত ছিলেন—পুত্রের বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব দেখে যাওয়ার সৌভাগ্য তাঁর আর হয় নাই।

নানাপ্রকার সাংসারিক বিড়ম্বনার জন্যে এতকাল জগদীশচন্দ্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের একাগ্র অনুশীলনের সুযোগ পান নাই। কলেজে অধ্যাপনার কর্তব্যে অবশ্য তিনি কোনো দিন কোনো ত্রুটি রাখেন নাই; ভাল অধ্যাপক হিসেবে তাঁর প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর ৩৫তম জন্মদিনে, ১৮৯৪ সালের নভেম্বরে জগদীশচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করলেন, অতঃপর তিনি তাঁর জীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উৎসর্গ করবেন। এ দেশের শ্রেষ্ঠ কলেজ হলেও প্রেসিডেন্সি কলেজেও তখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম ছিল না। উপযুক্ত যন্ত্রাদির অভাবে ইচ্ছামত পরীক্ষা করার বা মৌলিক গবেষণা করার সুবিধা ছিল না।

জগদীশচন্দ্র তাতে দমলেন না, তিন মাসের মধ্যে তিনি দেশী কারিগরদের দিয়ে নিজ প্রয়োজনানুরূপ স্বপরিকল্পিত একটা যন্ত্র তৈরি করিয়ে তাঁর ঈপ্সিত গবেষণা শুরু করে দিলেন। ঐ সময় 'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশসম্ভব জগৎ' সম্বন্ধে নানা চিন্তা তাঁর মাথায় অহরহ ঘুরছিল। তিনি সে সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

অচিরেই ফল পাওয়া গেল। ১৮৯৫ সালে জগদীশচন্দ্র কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে তাঁর মৌলিক গবেষণার ফল সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। এই গবেষণার বিষয় ছিল—বিদ্যুৎরশ্মির দিক পরিবর্তন। এই সময়েই নিয়োলাইট, সার্পেন্টাইন প্রভৃতি পাথরের বৈদ্যুতিক কম্পন পরিবর্তন করার শক্তি আবিষ্কৃত হয়েছিল।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে এই বক্তৃতা দেওয়ার কিছুদিন পরে বিলাতের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকা 'ইলেক্‌ট্রিসিয়ান'-এ জগদীশচন্দ্রের দুইটি দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ বছরেরই শেষ দিকে বিলাতের রয়েল সোসাইটি তাঁর গবেষণা-ফল প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার জন্যে তাঁকে আর্থিক সাহায্য করতে অগ্রসর হয়। জগদীশচন্দ্রের গবেষণার গুরুত্ব বুঝে ঐ সময় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ও কোনো পরীক্ষা না নিয়েই তাঁকে বিজ্ঞানাচার্য উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

দেশের বাইরে তাঁর মৌলিক গবেষণার সমাদর হতে থাকলেও, ভারতের বিদেশী সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-বিভাগ

জগদীশচন্দ্রের সফলতায় মোটেই সুখী হয় নাই বলে বোঝা যায়। জগদীশচন্দ্র সে-সময় সপ্তাহে ২৬ ঘণ্টা পড়াতেন, তবু শিক্ষা-বিভাগ বলতে লাগল, "গবেষণা করাটা অধ্যাপকের কোনো কাজ নয়—জগদীশচন্দ্রের উচিত তাঁর সমস্ত সময়টা পড়ানোর কাজে ব্যয় করা।" গবেষণার জন্য শিক্ষা-বিভাগ থেকে এক পয়সাও সাহায্য করা হত না, এতদ্‌সংক্রান্ত সমস্ত খরচ জগদীশচন্দ্রকে নিজের পকেট থেকে করতে হত।

ইউরোপের বড় বড় বিজ্ঞানীরা জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের প্রশংসা করছে দেখে সরকার পক্ষ থেকে জগদীশচন্দ্রকে একবার জানানো হয়েছিল যে, এ দেশে মৌলিক গবেষণায় উৎসাহ-দান এবং বিভিন্ন কলেজের গবেষণাগারগুলোর উন্নতি-বিধানের উদ্দেশে তাঁর জন্যে মোটা বেতনে একটা পদ সৃষ্টি করা হবে; সে-পদে নিযুক্ত হলে তিনি নিজের গবেষণার জন্যে প্রচুর অবকাশ ও সুযোগ পাবেন। সরকার কিন্তু সে-প্রতিশ্রুতি রাখেন নাই। না-রাখার কারণ, ঐ সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য হিসেবে তিনি সিনেটে বিচার্য কোনো একটা ব্যাপারে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে অভিমত জ্ঞাপন করেন। হোক না বড় বৈজ্ঞানিক, একান্ত বশংবদ না হলে, কারও জন্যে কোনো সরকার কোনোরকম সুবিধা করে দিতে পারে কি?

সরকারী শিক্ষা-বিভাগের একজন লোক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন, অথচ সরকার থেকে তাঁর কাজে কোনোরকম সহায়তা করা হচ্ছে না,—এটা বড় দৃষ্টিকটু হয়ে যায় দেখে ভারতের ইংরেজ সরকার শেষ পর্যন্ত জগদীশচন্দ্রকে

জানালেন যে, তাঁর গবেষণা বাবদ যা খরচ হয়েছে সরকার তা পূরণ করতে রাজী আছেন। জগদীশচন্দ্র সরকারকে উত্তরে ধন্যবাদ দিয়ে জানালেন, অতীতে গবেষণা-কাজের জন্যে তিনি যা ব্যয় করেছেন, সেটা পূরণ করার কোনো দরকার নাই। অতঃপর প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর গবেষণায় সুবিধা করার জন্যে সরকার বার্ষিক ২৫০০ টাকা করে মঞ্জুর করলেন।

কলেজে সাপ্তাহিক ২৬ ঘণ্টা কাজ করার পর গবেষণার জন্যে বিশেষ অবকাশ বা উৎসাহ থাকার কথা নয়। তাই, জগদীশচন্দ্র বাংলার ছোটলাটের সঙ্গে দেখা করে প্রার্থনা করলেন, ইউরোপ গিয়ে সেখানকার বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার জন্যে তাঁকে এক বছর ছুটি দেওয়া হোক। এ ছুটি তাঁর পাওনাও হয়েছিল। জগদীশচন্দ্রের আর্থিক অসঙ্গতির কথা জেনে ছোট-লাট তাঁকে নিজ দায়িত্বে সরকারী খরচে ইউরোপে যাওয়ার জন্যে ছয় মাসের ছুটি দিলেন।

এইভাবে জগদীশচন্দ্রের সম্মুখে বিশ্বাবদ্বৎসভায় প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রথম দ্বার খুলে গেল। এ গৌরব তিনি কোনোদিনই নিজের জন্যে চান নাই, চেয়েছিলেন সমগ্র দেশবাসীর হয়ে। ভারতবাসীরা যে বিজ্ঞান-আলোচনাতেও উৎকর্ষ লাভ করতে পারে—এইটাই প্রমাণ করা ছিল তাঁর তখনকার লক্ষ্য।

প্রথম পর্যায়ের গবেষণা

সেটা ১৮৯৪ সাল। সে বছর জগদীশচন্দ্র তাঁর ৩৫তম জন্মদিনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কার্যে তাঁর জীবন উৎসর্গ করার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এই সঙ্কল্পের পিছনে কি ছিল ?

ঐ বছর তিনি প্রথম মৌলিক রচনা করতে শুরু করেন। এ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "কোন দিনও লিখিতে শিখি নাই, কিন্তু ভিতর হইতে কে যেন আমাকে লিখাইতে আরম্ভ করিল। তাহারই আজ্ঞায় 'আকাশ-স্পন্দন ও অদৃশ্য আলোক' বিষয়ে লিখিলাম ; ··· লিখিয়াও নিষ্কৃতি পাইলাম না ; ভিতর হইতে কে সমালোচক সাজিয়া বলিতে লাগিল—'এত যে কথা রচনা করিলে, পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ কি, ইহার কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা ?' জবাব দিলাম, যেসব বিষয় অনুসন্ধান করিতে গিয়া বড় বড় পণ্ডিতেরা পরাস্ত হইয়াছেন, আমি সেই সব কি করিয়া নির্ণয় করিব ? তাহাদের অসংখ্য কলকারখানা ও পরীক্ষাগার আছে, এখানে তাহার কিছুই নাই ; অসম্ভবকে কি করিয়া সম্ভব করিব ? ইহাতেও সমালোচকের কথা থামিল

না। অগত্যা ছুতার-কামার দিয়া তিন মাসের মধ্যে একটা কল প্রস্তুত করিলাম। তাহা দিয়া যেসব অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল, তাহা আমার কথা দূরে থাকুক, বিদেশী বৈজ্ঞানিকদিগকে পর্যন্ত বিস্মিত করিল।"

এই উদ্ধৃত অংশ থেকে বোঝা যায়, ১৮৯৪ সালে জগদীশচন্দ্র নিজের মধ্যে একটা সৃষ্টি-বেদনা অনুভব করছিলেন এবং সেই বেদনা থেকেই তাঁর সঙ্কল্পের উদ্ভব হয়েছিল।

জগদীশচন্দ্র 'আকাশ-স্পন্দন ও অদৃশ্য আলোক' বিষয়ক যে-রচনাটির কথা এখানে বলেছেন, সেটি বাঙলায় রচিত হয়েছিল এবং উত্তরকালে তাঁর 'অব্যক্ত' নামক গ্রন্থে 'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশসম্ভব জগৎ' শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছিল। হার্ৎজের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সে-সময় দুনিয়ার পদার্থবিদ্যাবিদ্‌দের মনে আলোড়ন তুলেছিল। সুতরাং জগদীশচন্দ্রেরও ঐ ভাবনায় ভাবিত হওয়া ছিল স্বাভাবিক; উপরোক্ত প্রবন্ধ রচনা করে তিনি সেসব ভাবনাকে গুছিয়ে নিয়েছিলেন এবং গুছিয়ে নিতে গিয়ে তিনি এতৎসংক্রান্ত অমীমাংসিত সমস্যাগুলোর সম্মুখীন হয়েছিলেন।

'আকাশ-স্পন্দন ও আকাশসম্ভব জগৎ' প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্র আলোচনা করেছিলেন:

"...এই জগতে অসংখ্য ঘটনাবলীর মূলে তিনটি কারণ বিদ্যমান। প্রথম পদার্থ, দ্বিতীয় শক্তি, তৃতীয় ব্যোম অথবা আকাশ।...

"পদার্থ ত্রিবিধ আকারে দেখা যায়। ক্ষিত্যাকারে; দ্রবাকারে; বায়বাকারে। জড় পদার্থ সর্বসময়ে শক্তি অথবা তেজ দ্বারা স্পন্দিত হইতেছে।…

"…শক্তি সঞ্চালিত হইতে দেখা যায়। নদীর উপর দিয়া জাহাজ চলিয়া যায়; … কলের আঘাত তরঙ্গবলে দূরে নীত হয়।

"বাদ্যকরের অঙ্গুলিতাড়িত তন্ত্রীও এইরূপে স্পন্দিত হয়। এই স্পন্দনে বায়ুরাশিতে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। শব্দজ্ঞান বায়ু-তরঙ্গ-আঘাতজনিত।

"সেতারের তার যতই ছোট করা যায়, সুর ততই চড়া হয়। যখন প্রতি সেকেণ্ডে বায়ু ৩০,০০০ বার কাঁপিতে থাকে তখন কর্ণে অসহ্য অতি উচ্চ সুর শোনা যায়। তার আরও ক্ষুদ্র করিলে হঠাৎ শব্দ থামিয়া যাইবে। তখনও তার কাঁপিতে থাকিবে, তরঙ্গ উদ্ভুত হইবে; কিন্তু এই উচ্চ সুর আর কর্ণে ধ্বনি উৎপাদন করিবে না।

"…আকাশেও সর্বদা অসংখ্য তরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে। অঙ্গুলি-তাড়নে প্রথমে বাদ্যযন্ত্রে ও তৎপরে বায়ুতে যেরূপ তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, বিদ্যুত্তাড়নেও সেইরূপ আকাশে তরঙ্গ উদ্ভুত হয়। বায়ুর তরঙ্গ আমরা কর্ণ দিয়া শ্রবণ করি, আকাশের তরঙ্গ সচরাচর আমরা চক্ষু দিয়া দেখি।

"বায়ুর তরঙ্গ আমরা অনেক সময় শুনিতে পাই না। আকাশের তরঙ্গও সর্বসময়ে দেখিতে পাই না।

"দুইটি ধাতুগোলক বিদ্যুদ্‌যন্ত্রের সহিত যোগ করিয়া দিলে গোলক দুইটি বারংবার বিদ্যুত্তাড়িত হইবে এবং তড়িদ্বলে চতুর্দিকের আকাশে তরঙ্গ ধাবিত হইবে।...

"...আমরা এই তরঙ্গান্দোলিত সাগরে নিমজ্জিত হইয়াও অক্ষুণ্ণ থাকিব।...প্রতি সেকেণ্ডে যখন কোটি কোটি তরঙ্গ উৎপন্ন হইবে তখন অকস্মাৎ...শরীর উত্তাপ অনুভব করিবে,...যখন অধিকতর সংখ্যক তরঙ্গ উৎপন্ন হইবে তখন অন্ধকার ভেদ করিয়া রক্তিম আলোক রেখা দেখা যাইবে। কম্পনসংখ্যার আরও বৃদ্ধি হউক—ক্রমে ক্রমে পীত, হরিৎ, নীল আলোতে গৃহ পূর্ণ হইবে। ইহার পর...চক্ষু পরাস্ত হইবে, আলোকরাশি পুনরায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে!

"...তাপ ও আলোক আকাশের বৈদ্যুতিক স্পন্দন মাত্র। যে স্পন্দন ত্বক দ্বারা অনুভব করি তাহার নাম উত্তাপ; আর যে কম্পনে দর্শনেন্দ্রিয় উত্তেজিত হয় তাহাকে আলোক বলিয়া থাকি। ইহা ব্যতীত আকাশে বহুবিধ কম্পন আছে যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়গণের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য।

"কিয়ৎকাল পূর্বে আমরা চুম্বকশক্তি, বিদ্যুৎ, তাপ ও আলোককে বিভিন্ন শক্তি বলিয়া মনে করিতাম। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, এ সকল একই শক্তির বিভিন্ন রূপ।...

"আকাশ দিয়া ইহাদের তরঙ্গ একই গতিতে ধাবিত হয়, ধাতুপাত্রে প্রতিহত হইয়া একই রূপে প্রত্যাবর্তন করে, বায়ু হইতে অন্য স্বচ্ছ দ্রব্যে পতিত হইয়া একই রূপে বক্রীভূত হয়। কম্পনসংখ্যাই বৈষম্যের একমাত্র কারণ।

"... সূর্যের বহ্নিময় সাগরে আবর্ত উত্থিত হইলে এই পৃথিবী সেই সৌর উৎপাতে ক্ষুব্ধ হয়—অমনি পৃথিবী জুড়িয়া বিদ্যুৎ-স্রোত বহিতে থাকে।

"...শূন্যে বিক্ষিপ্ত কোটি কোটি জগৎ আকাশসূত্রে গ্রথিত। এক জগতের স্পন্দন আকাশ বাহিয়া অন্য জগতে সঞ্চালিত হইতেছে।

"...এই ভূপৃষ্ঠের প্রায় সর্ব গতির মূলে সূর্যকিরণ। আকাশের স্পন্দন দ্বারাই পৃথিবী স্পন্দিত হইতেছে; জীবনের স্রোত বহিতেছে।

"জড় পদার্থ আকাশের আবর্ত মাত্র। কোনকালে আকাশ-সাগরে সঞ্জাত মহাশক্তিবলে অগণ্য আবর্ত উদ্ভূত হইয়া পরমাণুর সৃষ্টি হইল। উহাদের মিলনে বিন্দু, অসংখ্য বিন্দুর সমষ্টিতে জগৎ—মহাজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে।"

জগদীশচন্দ্রের ১৮৯৪ সালের লেখা এই প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, সেকালের অন্যান্য পদার্থবিজ্ঞানীদের মতো তিনিও হার্ৎজের আবিষ্কার নিয়ে চিন্তা করছিলেন। হার্ৎজই সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক উপায়ে আকাশে তরঙ্গ উৎপাদন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট তরঙ্গগুলো ছিল অতি বৃহদাকার এবং সেই কারণে সেগুলো সরল রেখায় ধাবিত না হয়ে বক্র হয়ে যেত। "দৃশ্য আলোক-রশ্মির সম্মুখে একখানি ধাতু-ফলক ধরিলে পশ্চাতে ছায়া পড়ে; কিন্তু বৃহদাকার আকাশের তরঙ্গগুলি ঘুরিয়া বাধার পশ্চাতে পৌঁছিয়া থাকে। জলের বৃহৎ ঊর্মির সম্মুখে উপলখণ্ড ধরিলে এইরূপ হইতে দেখা যায়। দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে একই

তাহা সূক্ষ্মরূপে প্রমাণ করিতে হইলে অদৃশ্য আলোর ঊর্মি খর্ব করা আবশ্যক।"

হার্ৎজের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ছিল এক গজের চেয়েও দীর্ঘ; জগদীশচন্দ্র যে-যন্ত্র নির্মাণ করলেন তা থেকে উৎপন্ন আকাশ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য দেখা গেল এক ইঞ্চির ছয়ভাগের একভাগ মাত্র। "এই কলে একটি ক্ষুদ্র লণ্ঠনের ভিতরে তাড়িতোর্মি উৎপন্ন হয়. একদিকে একটি খোলা নল, তাহার মধ্য দিয়া অদৃশ্য আলো বাহির হয়। এই আলো আমরা দেখিতে পাই না।···

"অদৃশ্য আলো দেখিবার জন্য কৃত্রিম চক্ষু নির্মাণ আবশ্যক। আমাদের চক্ষুর পশ্চাতে স্নায়ু-নির্মিত একখানি পর্দা আছে; তাহার উপর আলো পতিত হইলে স্নায়ুসূত্র দিয়া উত্তেজনা-প্রবাহ মস্তিষ্কের বিশেষ অংশকে আলোড়িত করে এবং সেই আলোড়ন আলো বলিয়া অনুভব করি। কৃত্রিম চক্ষুর গঠন খানিকটা ঐরূপ।" জগদীশচন্দ্র অদৃশ্য আলো ধরার জন্যে যে-কৃত্রিম চোখ তৈরী করান তাতে "দুইখানি ধাতুখণ্ড পরস্পরের সহিত স্পর্শ করিয়া আছে। সংযোগস্থলে অদৃশ্য আলো পতিত হইলে সহসা আণবিক পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে এবং তাহার ফলে বিদ্যুৎস্রোত বহিয়া চুম্বকের কাঁটা নাড়িয়া দেয়। বোবা যেরূপ হাত নাড়িয়া সঙ্কেত করে, অদৃশ্য আলো দেখিতে পাইলে কৃত্রিম চক্ষুও সেইরূপ কাঁটা নাড়িয়া আলোর উপলব্ধি জ্ঞাপন করে।"

দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি যে অভিন্ন, এটা প্রমাণ করার জন্যে জগদীশচন্দ্র দেখালেন, অদৃশ্য আলোও সোজা পথে চলে। তিনি দেখালেন, বিদ্যুৎ-ঊর্মি বার হওয়ার জন্যে তাঁর বিদ্যুৎ-ভরা

লণ্ঠনে যে নল আছে সেই নলের সামনে সোজা লাইনে কৃত্রিম চোখটা ধরলেই তার কাঁটা নড়ে ওঠে, কিন্তু এক পাশে ধরলে তাতে কোনো উত্তেজনার চিহ্ন দেখা যায় না।

"দৃশ্য আলোর কাছে কাচ স্বচ্ছ, জলও স্বচ্ছ। কিন্তু ইট-পাটকেল অস্বচ্ছ, আলকাতরা তদপেক্ষা অস্বচ্ছ।···অদৃশ্য আলোকের সম্মুখে জানালার কাচ ধরিয়া তাহার ভিতর দিয়া এইরূপ সহজেই চলিয়া যায়। কিন্তু জলের গেলাস ধরিলে অদৃশ্য আলো একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। ইটপাটকেল···অদৃশ্য আলোকের পক্ষে স্বচ্ছ। আর আলকাতরা? ইহা জানালার কাচ অপেক্ষাও স্বচ্ছ।···

"···দৃশ্য আলোকেও এরূপ আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়াছি।···সম্মুখের সাদা কাগজের উপর দুইটি বিভিন্ন আলো-রেখা পতিত হইয়াছে; একটি লাল আর একটি সবুজ। মাঝখানে জানালার কাচ ধরিলে উভয় আলোই অবাধে যায়। এবার মাঝখানে লাল কাচ ধরিলাম; লাল আলো অবাধে যাইতেছে; কিন্তু সবুজ আলো বন্ধ হইল। সবুজ কাচ ধরিলে সবুজ আলো বাধা পাইবে না; কিন্তু লাল আলো বন্ধ হইবে। ইহার কারণ এই যে, (১) সব আলো এক বর্ণের নহে, (২) কোনো পদার্থ এক আলোর পক্ষে স্বচ্ছ হইতে পারে, কিন্তু অন্য আলোর পক্ষে অস্বচ্ছ।··· আলকাতরা দৃশ্য আলোর পক্ষে অস্বচ্ছ এবং অদৃশ্য আলোর পক্ষে স্বচ্ছ, ইহা জানিয়া অদৃশ্য আলোক যে অন্য বর্ণের তাহাই প্রমাণিত হয়।···আমাদের দৃষ্টিশক্তি প্রসারিত হইলে ইন্দ্রধনু অপেক্ষাও কল্পনাতীত অনেক বর্ণের অস্তিত্ব দেখিতে পাইতাম।

"...আলো এক স্বচ্ছ বস্তু হইতে অন্য স্বচ্ছ বস্তুর উপর পতিত হইলে বক্রীভূত হয়। ত্রিকোণ কাচ কিংবা ত্রিকোণ ইষ্টকখণ্ড দ্বারা দৃশ্য ও অদৃশ্য আলো যে একই নিয়মের অধীন তাহা প্রমাণ করা যায়। কাচ-বর্তুল সাহায্যে দৃশ্য আলোক যেরূপ বহু দূরে অক্ষীণভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে, অদৃশ্য আলোকও সেইরূপে প্রেরণ করা যায়। তবে এজন্য...কাচ-বর্তুল নিষ্প্রয়োজন, ইট-পাটকেল দিয়াও এইরূপ বর্তুল নির্মিত হইতে পারে।...

"প্রদীপের অথবা সূর্যের আলো সর্বমুখ।...লঙ্কা দ্বীপের টুমার্লিন স্ফটিকের ভিতর দিয়া আলো প্রেরণ করিলে আলো একমুখী হইয়া যায়। দুইখানি টুমার্লিন সমান্তরাল ভাবে ধরিলে আলো দুইয়ের ভিতর দিয়া যায়; কিন্তু একখানি অন্যের উপর আড়ভাবে ধরিলে আলো উভয়ের ভিতর দিয়া যাইতে পারে না।

"অদৃশ্য আলোও এইভাবে একমুখী করা যাইতে পারে।"

নানা রকম পরীক্ষা করে জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করে দেখালেন যে, দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোর প্রকৃতি একই।

যেহেতু অদৃশ্য আলো ইট-পাটকেল, ঘরবাড়ি ভেদ করে অনায়াসেই যেতে পারে, যেহেতু এর সাহায্যে যে বিনাতারে সংবাদ পাঠানো সম্ভব, এ ব্যাপারটাও জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করতে সমর্থ হলেন। ১৮৯৫ সালে, তাঁর সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক ফাদার লার্ফর আন্তরিক সহায়তায় ও উদ্যোগে তিনি কলিকাতা টাউন হলে এ সম্বন্ধে নানারকম পরীক্ষা দেখালেন। "বাঙ্গলার লেপ্‌টেনাণ্ট গভর্নর স্যার উইলিয়ম মেকেঞ্জি উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুতোর্মি তাঁহার বিশাল দেহ এবং আরও দুইটি

রুদ্ধ কক্ষ ভেদ করিয়া তৃতীয় কক্ষে নানাপ্রকার তোলপাড় করিয়াছিল। একটা লোহার গোলা নিক্ষেপ করিল, পিস্তল আওয়াজ করিল এবং বারুদস্তূপ উড়াইয়া দিল।" বিশ্ববিখ্যাত রেডিও-আবিষ্কর্তা মার্কনি সায়েব জগদীশচন্দ্রের এই আবিষ্কারের দু বছর পর বেতার সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা আরম্ভ করেন—এ কথা মার্কনির স্বদেশ ইতালীয় বিজ্ঞানপত্রগুলোতেও স্বীকৃত হয়েছিল। তাঁর এই প্রথম পর্যায়ের গবেষণাগুলোর আলোচনা প্রসঙ্গে গিয়ে জগদীশচন্দ্র যা বলেছিলেন, তা থেকে তাঁর ঐ সময়কার বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস কল্পনার গতিমুখ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেছিলেন :

"মনে কর, কোন অদৃশ্য অঙ্গুলি বৈদ্যুতিক অর্গ্যানের বিবিধ স্টপ আঘাত করিতেছে। বামদিকের স্টপে আঘাত করাতে এক সেকেণ্ডে একটি স্পন্দন হইল। অমনি শূন্যমার্গে বিদ্যুতোর্মি ধাবিত হইল। কি প্রকাণ্ড এই সহস্র ক্রোশব্যাপী ঢেউ! উহা অনায়াসে হিমাচল লঙ্ঘন করিয়া এক সেকেণ্ডে পৃথিবী দশবার প্রদক্ষিণ করিল। এবার অদৃশ্য অঙ্গুলি দ্বিতীয় স্টপ আঘাত করিল। এইবার প্রতি সেকেণ্ডে আকাশ দশবার স্পন্দিত হইল। এইরূপে আকাশের সুর ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতরে উঠিবে; স্পন্দনসংখ্যা এক হইতে দশ, শত; সহস্র, লক্ষ; কোটি-গুণ বৃদ্ধি পাইবে। আকাশ-সাগরে নিমজ্জমান রহিয়া আমরা অগণিত ঊর্মিদ্বারা আহত হইব, কিন্তু ইহাতেও কোন ইন্দ্রিয় জাগরিত হইবে না। আকাশস্পন্দন আরো ঊর্ধ্বে উঠুক, তখন কিয়ৎক্ষণের জন্য তাপ অনুভূত হইবে। তাহার পর চক্ষু

উত্তেজিত হইয়া রক্তিম, পীতাদি আলোক দেখিতে পাইবে। এই সব দৃশ্য আলোক এক সপ্তক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। স্থর আরো উচ্চে উঠিলে দৃষ্টিশক্তি পুনরায় পরাস্ত হইবে, অনুভূতি শক্তি আর জাগিবে না, ক্ষণিক আলোকের পরই অভেদ্য অন্ধকার।

"তবে ত আমরা এই অসীমের মধ্যে একেবারেই দিশাহারা! কতটুকুই বা দেখিতে পাই? একান্তই অকিঞ্চিৎকর! অসীম জ্যোতির মধ্যে অন্ধবৎ ঘুরিতেছি এবং ভগ্ন দিক্‌শলাকা লইয়া পাথার লঙ্ঘন করিতে প্রয়াস পাইতেছি। অনন্ত পথের যাত্রী, কি সম্বল তোমার?

"সম্বল কিছুই নাই, আছে কেবল অন্ধ বিশ্বাস; যে বিশ্বাস-বলে প্রবাল সমুদ্রগর্ভে দেহাস্থি দিয়া মহাদ্বীপ রচনা করিতেছে। জ্ঞান-সাম্রাজ্য এইরূপ অস্থিপাতে তিল তিল করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। আঁধার লইয়া আরম্ভ, আঁধারেই শেষ, মাঝে তুই একটি ক্ষীণ আলো-রেখা দেখা যাইতেছে। মানুষের অধ্যবসায় বলে ঘন কুয়াসা অপসারিত হইবে এবং একদিন বিশ্বজগৎ জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিবে।"

বিজয়-অভিযান

১৮৯৬ সালে জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণার ফল প্রচারের জন্যে এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার জন্যে ভারত সরকারের অর্থসাহায্যে বিলাত গেলেন। সেখানকার বিজ্ঞানীরা তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। রয়াল সোসাইটির পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধাবলী এবং বিলাতের ইলেক্‌ট্রিসিয়ান ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচনা তার জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেই রেখেছিল। জগদীশ-চন্দ্রের গবেষণালব্ধ সত্যগুলোও বিলাতের বৈজ্ঞানিক পাঠ্য পুস্তক-গুলোতে তখন ধীরে ধীরে প্রবেশ লাভ করছিল।

ঐ বছর লিভারপুলের বৃটিশ এসোসিয়েশনের একটি বিশেষ অধিবেশনে জগদীশচন্দ্র বৈদ্যুতিক রশ্মি সম্বন্ধীয় তাঁর যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষাদি দেখাবার সুযোগ পেলেন। জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শেষ হলে বিলাতের বিখ্যাত বিজ্ঞানী বৃদ্ধ লর্ড কেল্‌ভিন তাঁর কাজের অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন ; খোঁড়াতে খোঁড়াতে সিঁড়ি ভেঙে মেয়েদের গ্যালারিতে গিয়ে তিনি জগদীশচন্দ্রের পত্নীর দু হাত

ধরে আনন্দ প্রকাশ করে এলেন। বিলাতের পত্র-পত্রিকায় ভারতীয় বিজ্ঞানীর আশ্চর্য আবিষ্ক্রিয়ার সংবাদ প্রকাশিত হল।

লণ্ডনের রয়াল ইনস্টিট্যুশন ছিল নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল প্রচারের একটা প্রসিদ্ধ ঘাঁটি; প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় সেখানে আলোচনা-সভা বসত।

জগদীশচন্দ্র সে-সভায় বক্তৃতা করতে আহূত হলেন। এখানে বক্তৃতা দেওয়ার পর জগদীশচন্দ্রের ইজ্জৎ বেড়ে গেল। তাঁর রয়াল ইনস্টিট্যুশনের বক্তৃতাগুলো দেওয়া শেষ হলে বিলাতের 'ইলেক্‌ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার' পত্র একটা মন্তব্য প্রকাশ করল, যেটাকে আমরা বিশেষ লক্ষণীয় বলে মনে করি। সে মন্তব্য হচ্ছে এই যে, "জগদীশচন্দ্র তাঁর যন্ত্রপাতি এত প্রকাশ্যভাবে দেখিয়েছেন যে দুনিয়ায় যে কেউ ওরকম যন্ত্রপাতি তৈরি করিয়ে নিতে পারে; এত প্রকাশ্যভাবে না দেখালে তিনি প্রচুর টাকা করতে পারতেন।" জগদীশচন্দ্র ছিলেন সত্য-উপাসক ভারতীয় ঋষি; নিজের উদ্ভাবিত কোনো সত্যকে তিনি নিজের সম্পত্তি মনে করতেন না। তাঁর মত ছিল: সত্য সার্বজনিক—সকলেরই তাতে সমান অধিকার। ১৯০১ সালে এক ধনী তাঁর নূতন ধরনের বেতার-বার্তা গ্রাহকযন্ত্রের রসস্বত্বটা কিনে নিতে চাইলে তিনি বিনা দ্বিধায় তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। জগদীশচন্দ্রের কোনো মার্কিন বন্ধু আমেরিকায় জগদীশচন্দ্রের নামে ঐ যন্ত্রের একটা পেটেন্ট নিয়েছিলেন, কিন্তু ভারতীয় 'অমৃতের সন্তান' কোনোদিন তা থেকে এক পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। একালের দৃষ্টিতে জগদীশচন্দ্র নিশ্চয়ই অত্যন্ত 'বোকা' ছিলেন।

জগদীশচন্দ্র রয়াল ইনস্টিট্যুশন কর্তৃক বক্তৃতা দিতে আহূত হয়েছেন জেনে ভারত সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর ছুটির সময় আরও তিন মাস বাড়িয়ে দিলেন; আরও তিন মাসের জন্যে তাঁর প্রবাসের ব্যয় বহন করতে সম্মত হলেন।

সেবারকার বিলাত প্রবাসের শেষ দিকে, ১৮৯৭ সালে, জগদীশচন্দ্র ফ্রান্স ও জার্মানী থেকেও বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে আমন্ত্রিত হলেন। প্যারীর পদার্থ-বিজ্ঞানী-পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যে সভায় জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা করেন, সে-সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন ফ্রান্সের বিজ্ঞান-পরিষদের সভাপতি মঁসিয়ে কর্ণু স্বয়ং। এই সভায় ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন—তাঁদের মধ্যে রঙিন আলোকচিত্রের উদ্ভাবক লিপম্যান ও গ্যাস তরলীকরণের অন্যতম আবিষ্কর্তা কেইল্‌তেতের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ফল দেখে এঁরা সকলেই চমৎকৃত হন। লিপম্যান এত উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলেন যে, তিনি জগদীশচন্দ্রকে প্যারীর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে—সোর্বনে—তাঁর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলো একবার দেখানোর জন্যে ধরে বসেন। বার্লিনের বিজ্ঞান-পরিষদে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাতে শুধু বার্লিনের পদার্থ-বিজ্ঞানীরা নয়, হাইডেলবের্গ প্রভৃতি দূর প্রান্তের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বহু জার্মান অধ্যাপকও উপস্থিত হন। বার্লিনের অধ্যাপক ভারবুর্গ এই সময় বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সম্বন্ধে একজন গবেষণাকারীকে বলেন, "বসু মশায় যা করেছেন, তার পর তোমাদের আর বিশেষ কিছু করবার থাকল না।"

বার্লিনের পর কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পরীক্ষা দেখিয়ে, মার্শাই বন্দর হয়ে জগদীশচন্দ্র ১৮৯৭ সালের এপ্রিলে দেশে ফিরলেন।

জগদীশচন্দ্র যখন ইউরোপে গিয়ে ভারতের বৈজ্ঞানিক মনীষার পরিচয় দিচ্ছিলেন, তাঁর স্বদেশীয়রা তাঁকে নিয়ে কি রকম গৌরব বোধ করছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে বাঙলা ১৩০৪ সালের (ইং ১৮৯৭ সালের) মাঘ মাসের প্রদীপ পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি' কবিতাটিতে। (এখানে উল্লেখযোগ্য যে ঐ কবিতা রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের আজীবন সৌহৃদ্য তখনও সম্ভবতঃ স্থাপিত হয় নাই)। কবিতাটি এই :

বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে
দূর সিন্ধুতীরে,
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি ; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত-শিরে
পরায়েছ ধীরে।
বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা-মণ্ডিত
পণ্ডিত-সভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠরবে
শুনেছ গৌরবে!
সে ধ্বনি গভীর মন্দ্রে ছায় চারিধার
হ'য়ে সিন্ধুপার।

আজি মাতা পাঠাইছে—অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্বাদখানি
জগৎ-সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে, ভ্রাতঃ!
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে!

জগদীশচন্দ্রের এই অভিযানের প্রধান ফল এই হল যে: ইউরোপের লোক স্বীকার করল যে, এশিয়াবাসীরা—ভারতীয়রা আধুনিক বিজ্ঞানেও তাদের প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে।

এর আগে, ইউরোপীয়দের ধারণা ছিল যে, প্রাচ্য-মানুষ কেবল কল্পনাপ্রবণ, এবার তাদের সে ভুল ভাঙল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ সার হেনরি রস্কো জগদীশচন্দ্রের কৃতির প্রসঙ্গে এ কথা স্বীকার করলেন। শুধু পণ্ডিতরাই নয়, রাষ্ট্র-ধুরন্ধরদের পক্ষ থেকেও এরকম স্বীকৃতি এল; লর্ড রীয়ে বললেন, "বিজ্ঞান একান্তই আন্তর্জাতিক; ভারতে আচার্য বসু যে ফল লাভ করেছেন আমরা নির্বিবাদে তা আমাদের করে নিতে পারি।" লণ্ডনের স্পেক্টেটর পত্র যা লিখল তার মর্ম হচ্ছে: "ভারতের সন্ন্যাসীরা অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার চরমে পৌঁছানোর জন্য কোনো ক্লেশকে গ্রাহ্য করে না; আচার্য বসু দেখালেন যে ভারতের বিজ্ঞানীরাও তেমনি সত্যানুসন্ধানে খাঁটি সন্ন্যাসী হতে পারেন।"

বিলাতের নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানীরা শুধু সাধুবাদ করেই ক্ষান্ত হলেন না—তাঁরা জগদীশচন্দ্রের গবেষণার পথ সুগম করার জন্য

চেষ্টা করতে লাগলেন। জগদীশচন্দ্রকে কি অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয় তা জেনে লর্ড কেল্‌ভিন তৎকালীন ভারতসচিব লর্ড হ্যামিল্টনকে লিখলেন :

"আচার্য বসুর অধ্যাপকত্বের সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সম্পদের সঙ্গে যদি পদার্থবিদ্যার একটি সুসজ্জিত পরীক্ষাগার যুক্ত করা যায় তা হলে ভারতের তথা কলকাতার বিজ্ঞান-শিক্ষার গৌরব বৃদ্ধি করা হবে।"—

এ বিষয়ে লর্ড কেল্‌ভিন অগ্রণী হয়ে ভারতসচিবের কাছে একটা যুক্ত আবেদন পাঠালেন। এ আবেদনে যাঁরা স্বাক্ষর দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, রয়াল সোসাইটির সভাপতি লর্ড লিস্টার, লর্ড কেল্‌ভিন, অধ্যাপক ক্লিফটন, অধ্যাপক ফিটজেরাল্ড, সার উইলিয়ম র‍্যামসে, সার গ্যাব্রিয়েল স্টোক্‌স, অধ্যাপক সিলভেনাস টমসন, সার উইলিয়ম রিকার প্রভৃতি অনেক নামজাদা বৈজ্ঞানিক। এই আবেদনের ফলস্বরূপ ভারতসচিব তখনকার বড়লাট লর্ড এলগিনের কাছে, এ রকম একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সম্পর্কে বিবেচনা করার জন্যে অনুরোধ করেও পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারী 'লাল ফিতা'র মহিমা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের কোনো ভ্রান্তি ছিল না; তিনি হাতের গবেষণা ফেলে রেখে প্রতিষ্ঠান গড়ার জন্যে তদ্বির করে বেড়াতে প্রস্তুত না থাকায়, কাজ বিশেষ এগোল না। তবে, জগদীশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের চাকরি থেকে অবসর নেবার মুখে সরকার প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারটি সুসজ্জিত করার ব্যবস্থা করেন।

দ্বিতীয়বারের অভিযান

প্রথমবারের বিজয় অভিযানের শেষে, দেশে ফিরে জগদীশচন্দ্র কোনোরকম বিশ্রামের কথা চিন্তা না করেই কলেজের অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে নিজের গবেষণাও চালিয়ে গেলেন। ১৮৯৭ সালের নভেম্বরে তিনি 'কাচ ও বায়ুর রশ্মিপথ পরিবর্তন করার শক্তি' সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার ফল বিলাতের রয়াল সোসাইটিতে পাঠিয়ে দেন। ঐ সময় তিনি কোনো মোচড়ানো জিনিসের মধ্যে দিয়ে বৈদ্যুতিক রশ্মি পাঠালে রশ্মি-তরঙ্গের কেমন পরিবর্তন হয় এবং বিভিন্ন ধাতুচূর্ণের উপর বিদ্যুৎরশ্মির কি রকম প্রভাব পড়ে—এসব সম্বন্ধে কয়েকটি নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন। তাঁর পরীক্ষার আগে, বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস ছিল যে, ধাতুচূর্ণের উপর বিদ্যুৎরশ্মি ফেললে, ঐ ধাতু-চূর্ণের বিদ্যুৎ-পরিচালনার শক্তি যে কমে যায়, সেটা ধাতু-মাত্রেরই বিশেষ ধর্ম। জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন যে, কয়েকটা ধাতু বৈদ্যুতিক রশ্মিপাতে অধিকতর বিদ্যুৎ-পরিচালন শক্তি লাভ করতেও পারে। পদার্থ বিশেষের

বিদ্যুৎ-পরিচালনার শক্তির এইরূপ হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করে জগদীশচন্দ্র আবিষ্কার করলেন যে, বিদ্যুৎ-পরিচালন-ধর্মের এই পরিবর্তন ঘটে আণবিক অবস্থার ফলে।

১৯০০ সালে প্যারীর মহাপ্রদর্শনী উপলক্ষে বৈজ্ঞানিকদের যে মহাসভা বসে, ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রকে সে মহাসভায় যোগ দেওয়ার সুযোগ দেন। আগস্ট মাসে প্যারীতে পৌঁছে, তিনি প্যারী আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্ মহাসভায় 'জীব ও জড় পদার্থের উপর বিদ্যুৎ-রশ্মিপাতের ফলের ক্ষমতা' সম্বন্ধে একটা চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ প্রবন্ধের বিষয় সম্বন্ধে আমরা পরে জগদীশচন্দ্রের 'দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণা' শীর্ষক পরিচ্ছেদে আলোচনা করব। আপাতত আমরা জগদীশচন্দ্রের সাফল্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর লেখা একটা চিঠি থেকে উদ্ধৃত করছি :

"একদিন (প্যারীর মহাসভায়) কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হঠাৎ আমাকে বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি কিছু কিছু বলিয়াছিলাম। তাহাতে অনেকে অতিশয় আশ্চর্য হইলেন। তারপর কংগ্রেসের সেক্রেটারী···আমার সহিত দেখা করিতে আইসেন, এবং আমার কাজ লইয়া আলোচনা করেন। এক ঘণ্টা পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'তবে তো মশায়, এটা খুবই চমৎকার।' তারপর আরও তিন দিন এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়, প্রত্যহই বেশী বেশী উত্তেজিত—শেষদিন আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারিলেন না। কংগ্রেসের অন্যান্য সেক্রেটারী এবং প্রেসিডেন্টের নিকট অনর্গল ফরাসী ভাষায় আমার কার্য সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ ঐ সময় প্যারীতে ছিলেন; তাঁর একটা চিঠি থেকে প্যারীর মহাসভায় জগদীশচন্দ্রের সাফল্য এবং ভারতীয় দেশপ্রেমীদের মনে তার প্রতিক্রিয়ার একটা চমৎকার আভাস পাওয়া যায়। বিবেকানন্দ এ সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন তার সার মর্ম দেওয়া গেল :

"এখানে—প্যারীতে সব দেশের গুণীরা এসে জড়ো হয়েছেন—নিজের নিজের দেশের গৌরব প্রচার করতে। পণ্ডিতরা এখানে জয়ধ্বনি পাবেন—তার প্রতিধ্বনিতে তাঁদের দেশ গৌরবান্বিত হবে। পৃথিবীর নানা দিগ্‌দেশ থেকে সমাগত এই লোকোত্তর মনীষীদের মধ্যে, হে আমার জন্মভূমি, তোমার প্রতিনিধি কোথায়? এই বিরাট জনসভার মধ্যে একজন যুবক তোমার হয়ে দাঁড়িয়ে গেল—তোমারই এক বীর সন্তান। তার কথায় শ্রোতৃবৃন্দ যেন বিদ্যুৎ-স্পৃষ্ট হল; সে কথায় তার দেশবাসীরা সকলেই উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। ধন্য তোমার বীর সন্তান! ধন্য তার পতিব্রতা, অতুলনীয়া সহধর্মিণী, যিনি সব বিপদ-আপদের মধ্যে তার পাশে দাঁড়িয়ে এসেছেন!"

প্যারীর কাজ সেরে জগদীশচন্দ্র আবার ইংলণ্ডে গেলেন; প্যারীর মহাসভায় পঠিত তাঁর নূতন আবিষ্কারের কথা তখন সেখানকার বিজ্ঞানী মহলে আলোচিত হচ্ছিল। একজন শারীরবৃত্তবিদ্ পণ্ডিত জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের জনরব শুনেই বললেন, "জীব ও অজীবের মধ্যে কোনো রকমের সমতা থাকা একেবারেই অসম্ভব!" আর একজন বিজ্ঞানী এসে জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে ৪ ঘণ্টা আলাপ করলেন। প্রথম দিকে ঐ বিজ্ঞানী ভয়ানক

বাদানুবাদ করলেন, শেষ দিকে ক্রমাগত বলতে লাগলেন, "এযে একেবারে যাদু!" তিনি বললেন, সময়ে জগদীশচন্দ্রের নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব সর্বজন স্বীকৃত হবে বটে, তবে এখন অনেক বাধা আছে।

জগদীশচন্দ্র বুঝলেন, তাঁর সত্য প্রতিষ্ঠার কাজ বিশেষ সহজ হবে না। সেপ্টেম্বর মাসে (১৯০০ সাল) তিনি বৃটিশ এসোসিয়েশনের ব্র্যাডফোর্ড সভায় যখন প্রবন্ধ পাঠ করলেন, উপস্থিত পদার্থবিদ্যাবিদ্‌রা তাঁর সত্য সাদরে স্বীকার করে নিলেন বটে, কিন্তু শরীরবৃত্তবিদ্‌রা কোনো রকম উচ্চবাচ্য করলেন না। জগদীশচন্দ্রের মত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁদেরও স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল। কারণ, জগদীশচন্দ্রের এই নূতন তত্ত্বটি পদার্থবিদ্যা ও শারীরবৃত্ত উভয় বিদ্যার সঙ্গেই জড়িত। এই সভায় জগদীশচন্দ্র যন্ত্র-সাহায্যে সাড়া-লিপি এঁকে দেখিয়ে-ছিলেন যে, বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় জড় ও জীব একই প্রকার সাড়া দিতে পারে। তিনি প্রমাণ করেছিলেন, এই সাড়ার মূল কারণ পদার্থের আণবিক বিকৃতি। কৃত্রিম চোখ তৈরি করে তার উপর দৃশ্য ও অদৃশ্য রশ্মির কার্য যে অবিকল প্রাণিচক্ষুরই মতো এটাও তিনি স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্রের এই সব পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যাবিদ্‌রা সন্তুষ্ট হলেও শারীরবৃত্তবিদ্‌রা তাঁদের পুরাতন মত পরিবর্তন করতে চাইলেন না। যা হোক, ইংলণ্ডের (অলিভার লজ, ব্যারেট প্রমুখ) পদার্থবিদ্যাবিদ্‌রা জগদীশচন্দ্রের গবেষণার গুরুত্ব সম্পর্কে এতদূর নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, ব্র্যাডফোর্ড সভায় প্রবন্ধ পাঠের দু চারদিনের মধ্যে তাঁরা ভারতে থেকে জগদীশচন্দ্রের পক্ষে গবেষণা চালানোর কাজে নানা

অসুবিধা হবে বুঝে জগদীশচন্দ্রকে বিলাতেরই কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ জুটিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করলেন। জগদীশচন্দ্র বিষম দোটানার মধ্যে পড়লেন। ঐ সময় বন্ধু রবীন্দ্রনাথকে তিনি লেখেন, "আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি ; তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে।" অথচ, "আমি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছি—যাহার কেবল বহির্প্রান্ত লইয়া এখন ব্যাপৃত আছি এবং যাহার পরিণাম অদ্ভুত মনে করি, সেই কাজ সখ-মেটানো রকমে চলিবে না। তাহার জন্য অসীম পরিশ্রম ও বহু অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন।" —ভারতে এ অনুকূল অবস্থা পাওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না।

দেশ থেকে বেরুবার আগেই জগদীশচন্দ্র অসুস্থ ছিলেন ; কলকাতায় থাকার সময় চিকিৎসায় কোনো সুফল হয় নাই। ব্র্যাডফোর্ড বক্তৃতাগুলো শেষ করেই লণ্ডনে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। অস্ত্রোপচার ও আরোগ্যের মধ্যে দুই মাস কেটে গেল। নিবেদিতা এই সময় লণ্ডনে ছিলেন ; তিনি জগদীশচন্দ্রের তখনকার অবস্থা এইভাবে বর্ণনা করেছেন : "এই ভয় যেন তাঁকে পেয়ে বসেছে যে, তিনি যদি কোথাও এতটুকু অসফল হন, তা হলে তাঁর স্বজাতীয়রা শিক্ষালাভের অধিকারী বলে আর বিবেচিত হবে না। তিনি আমাকে বললেন, 'সকলেই জানে, আমাদের অদ্ভুত কল্পনাশক্তি আছে, কিন্তু আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে, আমাদের নিখুঁত বিচারের শক্তিও আছে, অধ্যবসায়ও আছে।' এ কথা তিনি যখন

আমাকে বলেছিলেন তখন তিনি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন, তাঁর শেষদিকের আবিষ্কারের কথা লিখে ফেলার চেষ্টা করছেন।"

জানুয়ারী মাসে (১৯০১) রোগ থেকে সেরে উঠে, জগদীশ-চন্দ্র রয়াল ইনস্টিট্যুশনের ডেভি-ফ্যারাডে পরীক্ষাগারে নতুন করে কাজ শুরু করলেন। তাঁর প্রাক্তন শিক্ষক লর্ড রেলির আনুকূল্যে তাঁর সেখানে কাজ করার সুযোগ ঘটে। জগদীশচন্দ্র এখানে যেসব পরীক্ষা করেন সেগুলো এমনভাবে করা হয়েছিল যাতে শারীরবৃত্তবিদ্‌রাও সেগুলোকে সহজে স্বীকার করে নিতে পারেন। বৈদ্যুতিক রশ্মি কৃত্রিম চোখের উপর পড়ে তাতে আণবিক পরিবর্তন ঘটায় এবং তা থেকে সাড়া পাওয়া যায়—বিজ্ঞানীমহলে এই মত প্রতিষ্ঠা করার পর, জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা করলেন, মাদক জিনিস, বিষ বা ক্লোরোফরম প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ দিয়ে উদ্ভিদ্ বা ধাতুতে সাড়া জাগানো যায় কি না। দেখলেন, তা যায়। ডেভি-ফ্যারাডে পরীক্ষাগারে কাজ করার সময় জগদীশচন্দ্র এমন সব যন্ত্র তৈরি করলেন যার দ্বারা জড়, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সাড়া-লিপি আপনা থেকেই লিপিবদ্ধ হতে পারে। তিনি দেখলেন যে এক টুকরা টিন, একটা গাছের ডগা আর ব্যাঙের একটা পেশী বাইরের উত্তেজনায় একই ভাবে সাড়া দেয়।

১৯০১ সালের ১০ই মে তারিখে জগদীশচন্দ্র রয়াল ইনস্টিট্যুশনে জড় ও জীবে সাড়া সম্বন্ধে তাঁর আবিষ্কারের বিষয় প্রকাশ করলেন। পরে ৬ই জুন তারিখে তিনি রয়াল সোসাইটিতে সে আবিষ্কার পরীক্ষা করে দেখালেন। উপস্থিত

বিজ্ঞানীরা প্রায় সকলেই জগদীশচন্দ্রের নতুন আবিষ্কারগুলোকে স্বাগত করলেন, কিন্তু পেশী ও স্নায়ুর উপর বৈদ্যুতিক উত্তেজনা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ইংলণ্ডের প্রধানতম শারীরবৃত্ত বিশারদ সার জন বার্ডন স্যাণ্ডারসন প্রমুখ দু একজন জগদীশচন্দ্রের প্রমাণ মানতে চাইলেন না। তাঁরা জগদীশচন্দ্রের মুখের উপর বললেন, "তুমি পদার্থবিদ্যার লোক, ঐ বিদ্যার ক্ষেত্রেই থাকো ; শারীরবৃত্তের মধ্যে মাথা গলাচ্ছ কেন ?"

স্যাণ্ডারসন প্রভৃতির বিরোধিতার ফলে জগদীশচন্দ্র রয়াল সোসাইটিতে যে প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন সেটি সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হল না। জগদীশচন্দ্র তাঁর বিজয়-অভিযানে প্রথম প্রচণ্ড বাধা পেলেন। এই ঘটনাটির সংবাদ ভারতের পত্রিকাগুলোতে অতিরঞ্জিত হয়ে প্রকাশিত হল ; এদেশী কাগজগুলো লিখল, "জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ক্রিয়া ও প্রবন্ধ রয়াল সোসাইটি কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে" !

বাধা পেয়ে পরাজয় স্বীকার করার পাত্র জগদীশচন্দ্র ছিলেন না। তিনি তখনই স্থির করলেন, তিনি তাঁর মত প্রতিষ্ঠিত না করে দেশে ফিরবেন না। অথচ সেপ্টেম্বরে (১৯০১) তাঁর ছুটি শেষ হয়ে যাচ্ছিল ; তাঁর জাহাজের টিকিট পর্যন্ত কেনা হয়ে গিয়েছিল।

জগদীশচন্দ্র ভারতসচিবের দফতরে গিয়ে আরও ছুটি চাইলেন। শারীরবৃত্তবিদ্‌দের পরামর্শে ভারতসচিব প্রথমে তাঁকে ছুটি দিতে চাইলেন না। জগদীশচন্দ্র ছুটি না পেলে

চাকরি ছেড়ে দিতে পারেন দেখে ভারতসচিব শেষ পর্যন্ত নিজের দায়িত্বে জগদীশচন্দ্রকে সরকারী ব্যয়ে ইংলণ্ডে থেকে বিজ্ঞান-চর্চার জন্যে ছুটি মঞ্জুর করলেন।

জগদীশচন্দ্র রয়াল ইনস্টিট্যুশনে গিয়ে তাঁর মত প্রতিষ্ঠার জন্যে নতুন করে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন; এ ব্যাপারে বিলাতের পদার্থবিদ্যাবিদ্‌রা তাঁকে উৎসাহই দিলেন; একজন জগদীশচন্দ্রকে পরিষ্কার বলেই দিলেন, "শারীরবৃত্তবিদ্‌দের চিরপোষিত মত তুমি উল্টে দিয়েছ, তারা চটবে না?"

আপন তপস্যাবলে জগদীশচন্দ্র ধীরে ধীরে নিজ মত প্রতিষ্ঠা করলেন। উদ্ভিদ্‌-শরীরের সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ অক্সফোর্ডের অধ্যাপক ভাইন্‌স সায়েব ঐ বিষয়ের দুইজন বিখ্যাত গবেষক হোরেস্‌ ব্রাউন ও হাওয়েস্‌কে সঙ্গে নিয়ে লণ্ডনে এসে জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষাগুলো দেখলেন। পরীক্ষা দেখে তাঁদের খুশী দেখে কে? হাওয়েস্‌ বললেন, "রয়াল সোসাইটি তোমার প্রবন্ধ প্রত্যাখ্যান করুক, তুমি আমাদের লিনিয়ান্‌ সোসাইটিতে এসে তোমার পরীক্ষাগুলো দেখাও, আমরা তোমার প্রবন্ধ স্বীকার করে নেব। পরীক্ষা দেখার জন্যে আমরা তোমার যারা বিরোধী সেই শারীরবৃত্তবিশারদদেরও ডাক দেব।"

১৯০২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে জগদীশচন্দ্র লিনিয়ান্‌ সোসাইটিতে তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করলেন। প্রবন্ধ মহোৎসাহে সর্বজন কর্তৃক স্বীকৃত হল। গত বৎসরের পরাজয়ের গ্লানি নিঃশেষে দূরীভূত হল। উপস্থিত পণ্ডিতরা কেউই

জগদীশচন্দ্রের যুক্তির মধ্যে বা পরীক্ষার মধ্যে কোনো খুঁত খুঁজে পেলেন না।

জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধ লিনিয়ান্ সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হতে গিয়েছে এমন সময় একটা সংবাদ শুনে জগদীশচন্দ্র একেবারে মুষড়ে পড়লেন। রয়াল সোসাইটিতে জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষাগুলো দেখে গিয়ে, এক শারীরবৃত্তবিদ্ জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারকে নিজের নামে চালাবার চেষ্টা করেছেন! লিনিয়ান্ সোসাইটির সম্পাদক হাওয়েস্ সায়েবের পত্রে এ সংবাদ পেয়ে জগদীশচন্দ্র অনুসন্ধান প্রার্থনা করলেন। অধ্যাপক ভাইন্‌স ও হাওয়েস্ দুজনেই ছিলেন রয়াল সোসাইটির সভ্য; ভুয়ো আবিষ্কারকটির দাবি পেশ করার পাঁচ মাস আগেই তাঁরা রয়াল সোসাইটিতে প্রদত্ত জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধের প্রুফ-কপি দেখেছিলেন; সুতরাং জগদীশচন্দ্রই যে আসল আবিষ্কারক, এটা সহজেই প্রমাণিত হয়ে গেল।

অতঃপর ১৯০২ সালের মে মাসে রয়াল সোসাইটি তাদের পত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। এই প্রবন্ধে জগদীশচন্দ্রের যেসব মতে আগে সোসাইটি আপত্তি জানিয়েছিল সেগুলো বিনা আপত্তিতে মুদ্রিত হল। অর্থাৎ এ প্রবন্ধ প্রকাশ করায় রয়াল সোসাইটি কর্তৃকও জগদীশচন্দ্রের মতগুলো শেষ পর্যন্ত গৃহীত হল।

দ্বিতীয় বিজয়-অভিযান শেষ করে জগদীশচন্দ্র যখন দেশে ফিরলেন, দেশবাসী তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করল। এই সম্বর্ধনা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ গাইলেন :

জয় তব হোক জয় !
স্বদেশের গলে দাও তুমি তুলে
যশোমালা অক্ষয় !
বহুদিন হতে ভারতের বাণী
আছিল নীরবে অপমান মানি'
তুমি তারে আজি জাগায়ে তুলিয়া
রটালে বিশ্বময় ।

জ্ঞানমন্দিরে জ্বালায়েছ তুমি
যে নব আলোকশিখা,
তোমার সকল ভ্রাতার ললাটে
দিল উজ্জ্বল টিকা ।
অবারিতগতি তব জয়রথ
ফিরে যেন আজি সকল জগৎ ।
দুঃখ দীনতা যা' আছে মোদের
তোমারে বাঁধি না রয় ।

ভারত সরকারও জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যে ১৯০৩ সালে তাঁকে সি. আই. ই. উপাধি দিলেন ।

দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণা

জগদীশচন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণার সম্পর্কে এর আগে কিছু কিছু বলা হয়েছে। এখন, জগদীশচন্দ্রের নিজের মুখ থেকেই শোনা যাক, তাঁর গবেষণার ধারা কি ভাবে বদলে গিয়েছিল :

"এমন সময় (নিজের ভিতরের মানুষটির কাছ থেকে) যে হুকুম আসিল তাহাতে সোজা পথ ছাড়িয়া দুর্গম অনির্দিষ্ট পথ গ্রহণ করিতে হইল। তখন তারহীন যন্ত্র লইয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। দেখিতে পাইয়াছিলাম, কলের সাড়া প্রথম প্রথম বৃহৎ হইত, তাহার পর ক্ষীণ হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইত। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, দিবারম্ভেই পরীক্ষা শ্রেয়ঃ ; কারণ সারাদিন পরীক্ষার পর কল ক্লান্ত হইয়া যায়। অমনি ভিতরকার সমালোচক বলিয়া উঠিল—'কল কি মানুষ, যে ক্লান্ত হইবে ?'

"কলে কেন ক্লান্তি হয় ? এই প্রশ্ন কিছুতেই এড়াইতে পারিলাম না। অনেকগুলি আবিষ্কার শুধু লিখিবার অপেক্ষায় ছিল ; সেসব ছাড়িয়া দিয়া নূতন প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান

করিতে হইল। ক্রমে দেখিতে পাইলাম, জীবনহীন ধাতুও উত্তেজিত এবং অবসাদগ্রস্ত হয়। উত্তেজনা স্থগিত রাখিলে স্বল্পাধিক কালে ক্লান্তি দূর হয়। উদ্ভিদে এই সব প্রক্রিয়া অধিকতর রূপে পরিস্ফুট দেখিলাম। এইরূপে বহুর মধ্যে একত্বের সন্ধান পাইয়াছিলাম।"

জগদীশচন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণাটি এবার বোঝার চেষ্টা করা যাক। আমরা জানি, জড়ই শক্তির লীলাভূমি আর এই জড়কে আশ্রয় করেই শক্তির প্রকাশ হয়ে থাকে। জড়ের উপর শক্তির কার্যের পরিধি অসীম হলেও, প্রত্যেক কার্যের মূলে পৌঁছালে দেখা যায়, পদার্থের অণুগুলোর বিন্যাস বিকৃত ও চঞ্চল করাই শক্তির একটা বড় কাজ।

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে একটা লোহার শিককে বাঁকালে, শিকটির অণুগুলো আগে যেমন সাজানো ছিল, তেমন থাকে না ; তার অণুসজ্জা এলোমেলো হয়ে যায়। প্রযুক্ত শক্তি বেশী হলে শিকটা বেঁকেই যায়, কিন্তু শক্তির মাত্রা কম হল অণুগুলো আগেকার অবস্থায় ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে, শিকটা আবার সোজা হয়ে যায়। জড় ও শক্তির এই বিশেষ সম্বন্ধটা অবলম্বন করে জগদীশচন্দ্র জীবনক্রিয়ার রহস্য সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি গাছপালার নানারকমের অঙ্গসঞ্চালন পর্যবেক্ষণ করে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, গাছপালা বাইরে থেকে যে তাপ ও আলো পায়, সেই তাপ ও আলোরূপী শক্তিই তাদের দেহের অণুসজ্জা বদলে দিতে থাকে—অণুগুলোকে বিকৃত করে তাদের দেহকে বেঁকিয়ে দেয়।

জগদীশচন্দ্র দেখালেন যে, গাছপালার দেহের বিভিন্ন অঙ্গের অণুগুলো একই শক্তি প্রয়োগে একই ভাবে উত্তেজিত হয় না এবং এই ব্যাপারটার উপরই গাছপালার নড়াচড়া নির্ভর করে। জগদীশচন্দ্রের আগে পণ্ডিতেরা মনে করতেন, গাছপালার নড়াচড়া নির্ভর করে জীবনীশক্তির উপর ; সে জীবনীশক্তি যে কি জিনিস তা তাঁরা বলতে পারতেন না। জগদীশচন্দ্র বহুপ্রকার পরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন, যেহেতু জড় ও জীব সকল পদার্থই অণুদ্বারা গঠিত এবং যেহেতু শক্তির কর্ম ই হল অণুসজ্জা বদলে দেওয়া, সেই হেতু জীব ও জড়-ভেদে শক্তির কাজের কোনো পার্থক্য নাই। তিনি নির্জীব ধাতু এবং সজীব প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌দেহে বিষ ও মাদক দ্রব্য প্রয়োগ করে দেখালেন, সকলেই একই রকম সাড়া দিচ্ছে। জগদীশচন্দ্র দেখালেন, জড়, উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর সাড়ার মধ্যে কোনো সীমারেখা টানা যায় না। আগেকার পণ্ডিতরা বলতেন, জড় আর জীবের মধ্যে তফাত এই যে, জীবে জীবনীশক্তি আছে ; জীব মরে। জগদীশচন্দ্র মৃত্যুকে সজীবতার লক্ষণ বলে স্বীকার করলেন না। তিনি দেখালেন, ধাতুপিণ্ডেও বেশীমাত্রায় বিষ-প্রয়োগ করলে তার মৃত্যু ঘটে, কারণ মৃত্যু তো হচ্ছে দেহাণুগুলোর বাইরের উত্তেজনার একেবারে চিরতরে নিঃসাড় হয়ে পড়া। সেগুলো শক্তিপ্রয়োগে যতক্ষণ তাদের পূর্বাবস্থা পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করতে পারে ততক্ষণই দেহকে সজীব বলা যায়।

বাইরে শক্তি জীবের উপর যে কাজ করে, জীবের একটা ভিতরের শক্তি তার উল্টোটা করবার চেষ্টা করে,—এই ব্যাপার

দেখে পণ্ডিতরা মনে করতেন ভিতরের শক্তি আর বাইরের শক্তি দুটি আলাদা শক্তি; তাঁরা ঐ ভিতরের শক্তিকেই জীবনীশক্তি বলে নির্দেশ করার চেষ্টা করতেন। জগদীশচন্দ্র দেখালেন ঐ দুই শক্তি মূলতঃ এক। এই প্রসঙ্গে তিনি বায়ু-চালিত বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সঙ্গে উদ্ভিদ্‌দেহের তুলনা করলেন। ঐ যন্ত্র প্রবল বায়ুর তাড়নায় কাজ করে আর সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত বিদ্যুৎকোষে সেই বায়ুর শক্তির একাংশ বিদ্যুৎশক্তিরূপে জমা হয়ে যায়। প্রবল বায়ুর অভাব হলে কোষ-সঞ্চিত বিদ্যুৎ এসে যন্ত্রটাকে চালাতে থাকে—এবার কিন্তু উল্টো দিকে। বায়ুর অভাবেও কল ঘোরে বলেই কোষ-সঞ্চিত বিদ্যুৎ-শক্তিটাকে যেমন জীবনীশক্তি নামক কোনো বিশেষ শক্তি বলা উচিত নয়, জীব বা উদ্ভিদের ভিতরের শক্তিকেও কোনো স্বতন্ত্র শক্তি বলে ধরা যায় না। এখানেও শক্তি-আহত অণুগুলোর পূর্বাবস্থা ফিরে পাওয়ার অণুরূপ ব্যাপার মাত্র।

১৯০০ সালে জগদীশচন্দ্র ইউরোপ গিয়ে রয়াল সোসাইটিতে যেসব নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন, বিদ্যুৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিখ্যাত ইংরেজী পত্র ইলেক্‌ট্রিসিয়ানে তার একটা মর্ম প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তার থেকে যে সার সঙ্কলন করে দিয়েছিলেন, এখানে আমরা সেটা উদ্ধৃত করছি :

"সজীব মাংসপেশীকে যদি চিম্‌টি কাটা যায় বা তাহাতে মোচড় বা চাপ দেওয়া যায়, তবে তাহা লম্বায় ছোট হইয়া চওড়ার দিকে ফুলিয়া ওঠে। চাপ উঠাইয়া লইলে মাংসপেশী আবার প্রকৃতিস্থ হয়। বিশেষ যন্ত্রের দ্বারা মাংসপেশীর এই

বিকৃতি ও প্রকৃতির উত্থান-পতন-রেখা আঁকিয়া লওয়া যায়। যদি মাংসপেশীতে থাকিয়া থাকিয়া চাপ পড়ে, তবে তাহার তরঙ্গরেখা করাতের মত দন্তুর হইয়া অঙ্কিত হয়। যদি এই চাপ অত্যন্ত ঘন ঘন হইতে থাকে, তবে অবশেষে এমন একটি অবস্থা আসে যখন মাংসপেশী নিরন্তর সঙ্কুচিত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের আক্ষেপ উৎপন্ন করে।

"অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা গরমে মাংসপেশী আড়ষ্ট হইয়া যায়, তখন আঘাতে তাহার সাড়া পাওয়া যায় না এবং প্রকৃতিস্থ হইতেও বিলম্ব ঘটে। আবার বিশেষ মাত্রার উত্তাপে মাংসপেশীর সাড় সর্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠে। এই উত্তাপের মাত্রা ভিন্ন মাংসপেশীর পক্ষে ভিন্ন রূপ।

"দ্রব্যগুণে মাংসপেশীর সাড় বাড়ে কমে। উত্তেজক পদার্থে সাড় প্রবল হইয়া উঠে এবং প্রকৃতিস্থতাও শীঘ্র ফিরিয়া আসে। অবসাদক পদার্থে বিপরীত ফল হয় এবং বিষে এই সাড়-শক্তি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহাও দেখা গিয়াছে, কোন কোন দ্রব্য মাত্রাবিশেষে উত্তেজনা ও অল্পমাত্রায় অবসাদ আনয়ন করে।

"সজীব মাংসপেশীকে ছাড়িয়া যদি স্নায়ুকে লইয়া পরীক্ষা করা যায়, তবে তাহাতেও এইরূপ পরে পরে সাড় ও প্রকৃতি-লাভ দেখা যায়। কিন্তু স্নায়ুতে এই সাড়ার প্রকাশ অন্যপ্রকার। ঘা লাগিলে স্নায়ুর আহত বা উত্তেজিত অংশ হইতে সুস্থ অংশ পর্যন্ত একটি বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। পুনঃপুনঃ আঘাত, শীতাতপের মাত্রাধিক্য এবং উত্তেজক বা অবসাদক দ্রব্য দ্বারা

স্নায়ুতে যে ক্রিয়া ও ক্রিয়াশান্তি উপস্থিত হয় যন্ত্রবিশেষের দ্বারা তাহার রেখা-চিত্র লওয়া হইয়াছে। মাংসপেশীর চিত্রের সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখা যায়। অধ্যাপক বসু এইরূপ বিবিধ চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। দেহবিদ্‌গণ বলেন, দেহপদার্থের মধ্যে এই সাড়ই জীবনের সুস্পষ্ট লক্ষণ, মৃত পদার্থে ইহার সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়।

"এখন জড় পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। অধ্যাপক বসু দেখাইয়াছেন, একটি তারের এক প্রান্তে যদি মোচড় বা ঘা দেওয়া যায়, তবে সেই আহত বা উত্তেজিত প্রান্ত হইতে প্রকৃতিস্থ প্রান্ত পর্যন্ত একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। তড়িৎ-মাপক সূচির বিচলন দ্বারা এই সাড়ের পরিমাণ ধরা পড়ে। যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া অধ্যাপক বসু দেখাইয়াছেন, জড় পদার্থের এই আঘাতজনিত সাড় ও প্রকৃতিলাভের তরঙ্গরেখার সহিত স্নায়ুমাংসপেশীর তরঙ্গরেখার অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে।

"ধাতুপদার্থে ঘন ঘন তাড়না করিলে যে তরঙ্গরেখা পাওয়া যায়, তাহা দন্তুর—সেই তাড়না আরও দ্রুত করিলে তরঙ্গরেখা নিরন্তর স্ফীত হইয়া ধনুষ্টঙ্কারের অবস্থা প্রকাশ করে। শীতাতপের মাত্রা অধিক হইলে ধাতুপদার্থে আড়ষ্টতা জন্মে এবং বিশেষ উত্তাপে তাহার সাড়শক্তি সর্বাপেক্ষা বিকাশ পায় ;—ধাতু-তারের মধ্যে বিশেষ দ্রব্য প্রয়োগ করিলে তাহার সাড়ের প্রবলতা মদমত্ততার মত আশ্চর্য বাড়িয়া উঠে, আবার দ্রব্যবিশেষে অবসাদের লক্ষণ আনয়ন করে, আবার কোন কোন দ্রব্যে বিষের মত কাজ করে। কোন কোন দ্রব্য ধাতুপদার্থের পক্ষে বিশেষ

মাত্রায় উত্তেজক এবং মাত্রান্তরে অবসাদক, আবার ইহাও দেখা গিয়াছে, সময় মত ঔষধ দিতে পারিলে বিষপ্রয়োগের প্রতিকার করা যায়।

“এইরূপ নানা আঘাত-অপঘাতে ধাতুদ্রব্যে যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার তরঙ্গচিত্র জৈবতরঙ্গের এতই সদৃশ যে, দেহবিদ্‌গণ উভয় চিত্রকে পৃথক করিয়া নির্দেশ করিতে পারেন না।

“এই গেল আঘাতজনিত সাড়। আলোকজনিত সাড় সম্বন্ধেও অধ্যাপক মহাশয় পরীক্ষা করিয়া সমফল পাইয়াছেন। তিনি একটি কৃত্রিম চক্ষু নির্মাণ করিয়াছেন; যে সকল রশ্মি সম্বন্ধে আমাদের চক্ষু অসাড়, তাঁহার কৃত্রিম চক্ষুতে সে সকল রশ্মিও সাড়া জাগাইয়া থাকে। আলো লাগিলে সজীব চক্ষু যেমন করিয়া মস্তিষ্কে বেগ প্রেরণ করে, এই কৃত্রিম চক্ষুর ক্রিয়া ঠিক সেইরূপ। সুতরাং এই আবিষ্কারের ফলে দর্শনক্রিয়া ব্যাপারটি দেহবিদ্যার কোঠা হইতে পদার্থবিদ্যার কোঠায় আসিয়া পড়িতে পারে। এই কৃত্রিম চক্ষুর আবিষ্কারে বর্তমান তারহীন টেলিগ্রাফী ও ঐথরিক বার্তাবহন-প্রণালী উলটপালট করিয়া দিবে।”

আলো-আঁধারির পথে

দ্বিতীয়বারের বৈজ্ঞানিক অভিযানের পর, ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে, জগদীশচন্দ্র জীব ও উদ্ভিদের স্নায়ুর সাড়া সম্বন্ধে সাতটি প্রবন্ধ রচনা করে রয়াল সোসাইটিতে প্রকাশের জন্য পাঠালেন। ইতিমধ্যে, জগদীশচন্দ্রের বিলাতে অনুপস্থিতির সুযোগ পেয়ে তাঁর মতবাদের শত্রুরা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। তাদের চেষ্টার ফলে রয়াল সোসাইটি জগদীশচন্দ্রকে জানাল যে, সোসাইটি তাঁর গবেষণার সমাদর করে বটে তবে সে গবেষণার ফলগুলো চলতি মতের বিরোধী যে, গাছপালা স্বয়ং তাদের স্নায়ু-ক্রিয়া লিখে না দেখানো পর্যন্ত তাঁর প্রবন্ধগুলো প্রকাশ করা সম্ভব হবে না, সুতরাং সেগুলোকে সোসাইটির শিকেয় তুলে রাখা হল!

জগদীশচন্দ্র তাঁর জীবনের এই পর্যায়ের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "সব দিকের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া গেল এবং সমস্ত আলো যেন অকস্মাৎ নিবিয়া গেল। কিন্তু ইহার পর হইতেই অন্তরের ক্ষীণ আলো অধিকতর পরিস্ফুট হইতে লাগিল। প্রখর আলোকে যাহা দেখিতে পাই নাই, এখন তাহা দেখিতে পাইলাম।…"

রয়াল সোসাইটির কাছে এই প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে জগদীশ-চন্দ্র মরিয়া হয়ে আবার কাজে লাগলেন। তাঁর ভিতরের যোগী-পুরুষ কর্মফল ভগবানে সমর্পণ করে অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলল। তিন বছর ধরে তিনি বহু পরীক্ষা চালালেন; সেসব পরীক্ষার ফলাফল সম্বলিত দুখানি বিরাট গ্রন্থ লিখে ফেললেন। ১৯০৬ সালে তাঁর "উদ্ভিদের সাড়া" এবং ১৯০৭ সালে "তুলনামূলক বৈদ্যুতিক শারীরবৃত্ত" নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হল। বই দুখানি ইংরেজী ভাষায় লেখা। তাঁর অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক রচনা মাতৃভাষায় লেখা কেন সম্ভব হয় নি, জগদীশচন্দ্র তাঁর দেশবাসীর কাছে তার যে কৈফিয়ত দিয়েছিলেন, আজও এ দেশের জ্ঞানী-গুণীদের পক্ষে তা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য :

"ভিতর ও বাহিরের উত্তেজনায় জীব কখনও কলরব, কখনও আর্তনাদ করিয়া থাকে। মানুষ মাতৃক্রোড়ে যে ভাষা শিক্ষা করে সে ভাষাতেই সে আপনার সুখদুঃখ জ্ঞাপন করে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে (কৈফিয়তটি ১৩২৮ সালে লেখা হয়েছিল) আমার বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধ মাতৃভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল। তাহার পর বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ও জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং সেই উপলক্ষ্যে বিবিধ মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত হইয়াছি। এ বিষয়ের আদালত বিদেশে; সেখানে বাদ-প্রতিবাদ কেবল ইউরোপীয় ভাষাতেই গৃহীত হইয়া থাকে। এ দেশেও প্রিভিকাউন্সিলের রায় না পাওয়া পর্যন্ত কোনো মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না।

"জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপমান আর কি হইতে পারে ?..."

এই বই দুখানির আগে জগদীশচন্দ্রের আর একখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে বিজ্ঞানী মহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সে বইখানি "জীব ও জড়ের সাড়া"র সম্পর্কে (১৯০২ সালে প্রথম প্রকাশিত)। সে-গ্রন্থে জগদীশচন্দ্র জড় ও জীবের মধ্যে সীমারেখা টানার ভুল দেখিয়েছিলেন। প্রথম গ্রন্থেরই জের টেনে জগদীশচন্দ্র তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ "উদ্ভিদের সাড়া"য় প্রমাণ করলেন যে, উদ্ভিদ্ ও প্রাণী বাইরের আঘাতে শরীরের আকুঞ্চন প্রসারণাদির দ্বারা যে সাড়া দেয় তার মধ্যেও চমৎকার মিল দেখা যায়। উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও রসশোষণ এবং লতার সঞ্চলন প্রভৃতির কারণ অনুসন্ধান করে জগদীশচন্দ্র দেখালেন যে, বাইরের শক্তির উত্তেজনাই এসব কার্যের মূল। তাঁর আগে, বিজ্ঞানীরা বলতেন, কামানের ভিতরকার গোলা-বারুদ যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শে বৃহৎ শক্তির প্রকাশ করে তেমনি বাইরের উত্তেজনায় উদ্ভিদের ভিতরের শক্তি বড় হয়ে দেখা দেয়; তাঁরা উদ্ভিদের ঐ ভিতরের শক্তির কোনো সঠিক সংবাদ জানতেন না।

জগদীশচন্দ্রের "তুলনামূলক বৈদ্যুতিক শারীরবৃত্ত" গ্রন্থটি তার পূর্বগামী "উদ্ভিদের সাড়া"র অনুবৃত্তি মাত্র। প্রত্যক্ষ সাড়া পরীক্ষা করে তিনি উদ্ভিদের যেসব তথ্য আগে আবিষ্কার করেছিলেন, এই গ্রন্থে তিনি বৈদ্যুতিক সাড়া দ্বারা তারই অনেক ছোট বড় ব্যাপার নতুন করে আবিষ্কার করে দেখিয়ে দিলেন।

তাছাড়া, আঘাত উত্তেজনায় সাড়া দেওয়ার গুণটা উদ্ভিদ্ থেকে ক্রমে স্ফূর্তিলাভ করে কি ভাবে জটিল ইন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণীতে এসে পরিণতি লাভ করেছে, এই গ্রন্থে জগদীশচন্দ্র তারও একটা ধারা দেখিয়ে দিলেন।

জগদীশচন্দ্রের "উদ্ভিদের সাড়া" ও "তুলনামূলক বৈদ্যুতিক শারীরবৃত্ত" প্রকাশিত হওয়ার অল্পকালের মধ্যেই জার্মান ও রুশ ভাষায় অনূদিত হয়ে যায়।

"উদ্ভিদের সাড়া" ও "তুলনামূলক বৈদ্যুতিক শারীরবৃত্তে" জগদীশচন্দ্র যেসব পরীক্ষা-প্রক্রিয়ার কথা লিখেছিলেন, বিজ্ঞান-জগতে সেগুলো ছিল কিছুটা নতুন ধরনের। সুতরাং ইউরোপে ঐসব প্রক্রিয়া ব্যাপকভাবে অবলম্বন করা ছিল শক্ত। তবু কেম্ব্রিজ ও উট্রেক্ট-এ এবং আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সেগুলো আংশিকভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল এবং সুফলও পাওয়া গিয়েছিল।

যা হোক, পশ্চিমী পণ্ডিতদের অনুরোধে, ভারত সরকার ১৯০৭ সালে জগদীশচন্দ্রকে তাঁর তৃতীয় বৈজ্ঞানিক অভিযানে পাঠালেন, তাঁর পরীক্ষাপ্রণালীগুলো নিজে গিয়ে দেখাবার জন্যে। ইংলণ্ড ও আমেরিকা ঘুরে জগদীশচন্দ্র তাঁর পরীক্ষাগুলো দেখিয়ে এলেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক বক্তৃতাগুলোর সমাদরও হল। দেশে ফিরে এসে জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ্ সম্পর্কে তাঁর পরীক্ষা চালিয়ে গেলেন; সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন ও উন্নয়নও চলতে লাগল।

১৯১১ সালে ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রকে সি. এস. আই. উপাধি দিয়ে আর এক দফা সম্মান দেখালেন।

১৯১৩ সাল নাগাদ, তাঁর নবোদ্ভাবিত যন্ত্রগুলোর সাহায্যে জগদীশচন্দ্র নিঃশংসয়ে প্রমাণ করলেন যে, উদ্ভিদের স্নায়ুজাল প্রাণীদের মতই—সে প্রমাণ এতই অকাট্য হল যে রয়াল সোসাইটি তার পত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের গবেষণা-ফল প্রকাশ করতে বাধ্য হল। ঐ সময় "উদ্ভিদ্‌দের উত্তেজনাশীলতা" সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের আর একখানি গ্রন্থও প্রকাশিত হল। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগদীশচন্দ্র বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হলেন। ১৯১৪ সালে ভারত সরকার জগদীশ-চন্দ্রকে তাঁর চতুর্থ বৈজ্ঞানিক জয়যাত্রায় পাঠালেন।

জগদীশচন্দ্র এবার যাত্রার সময় নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলো তো সঙ্গে নিলেনই, উপরন্তু নিজেদের কথা যন্ত্রযোগে লিপিবদ্ধ করার জন্যে এ দেশের নিম প্রভৃতি গাছও নিয়ে গেলেন। এ দেশের গাছ শীতের দেশে সহজে বাঁচে না, তাই সেগুলো নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে জগদীশচন্দ্রকে অনেক বুদ্ধি খরচ করতে হয়েছিল।

বিলাত পৌঁছে জগদীশচন্দ্র প্রথমে অক্সফোর্ড, পরে কেম্ব্রিজ ও লণ্ডনে বক্তৃতা দিলেন, তাঁর নতুন আবিষ্কারগুলো দেখালেন। সর্বত্রই তাঁর মত সাদরে গৃহীত হল। রয়াল সোসাইটির সভাপতি সার উইলিয়ম ক্রুক্‌স প্রমুখ অনেক বৈজ্ঞানিকরা জগদীশচন্দ্রের নিজস্ব পরীক্ষণাগারে এসে পরীক্ষা দেখে গেলেন। যে শারীরবৃত্তবিদের ভোটের দরুন জগদীশচন্দ্রের প্রবন্ধগুলো রয়াল সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হতে পারে নাই, তিনি সর্বান্তঃকরণে জগদীশচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে স্বীকার করলেন,

"আমি ভেবেছিলাম, আপনার প্রাচ্য কল্পনা আপনাকে বিপথে চালিয়েছিল। দেখছি, বরাবরই ভুল হয়েছিল আমারই।"

মনোবিজ্ঞানের উপর জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের প্রভাব পড়ে দেখে মিঃ ব্যালফুর এলেন, বার্নার্ড শ আমিষভোজী ছিলেন, তিনি স্বচক্ষে একটা বাঁধাকফির কাতরানি দেখে গেলেন।

উদ্ভিদের স্নায়ুর উপর ঔষধের ক্রিয়া সংক্রান্ত জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার চিকিৎসা বিজ্ঞানীদেরও আকৃষ্ট করল। জগদীশচন্দ্র তাদের রয়াল সোসাইটি অব মেডসিনে বক্তৃতা দিতে আহূত হলেন। এই সোসাইটি ভারত সরকারের কাছে জগদীশচন্দ্রের "জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একেবারে অভিনব" আবিষ্কারগুলোর প্রশংসা করে চিঠি পাঠাল।

লণ্ডন থেকে জগদীশচন্দ্র ভিয়েনা যান। অস্ট্রিয়া ও জার্মানীর নেতৃস্থানীয় শারীরবৃত্তবিশারদরা এই উপলক্ষে জগদীশচন্দ্রকে এই বলে সমাদর করেন যে, "গবেষণার এই সব নূতন ধারায় কলকাতা আস্ট্রিয়া ও জার্মানীকে অনেক পিছনে রেখে এগিয়ে গিয়েছে।" ফ্রান্সের ও জার্মানীর পণ্ডিতরাও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। জগদীশচন্দ্র জার্মানীতে যখন বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন তখন প্রথম যুদ্ধ প্রায় বাধে বাধে অবস্থায়। সৌভাগ্যবশতঃ তিনি যুদ্ধ ঘোষণার আগেই সে-দেশ থেকে বেরিয়ে আসেন।

অতঃপর, জগদীশচন্দ্র ইউরোপ ছেড়ে আমেরিকায় যান। সেখানেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতরা তাঁর বক্তৃতা শুনে ও পরীক্ষা দেখে মুগ্ধ হন। জগদীশচন্দ্রের গৌরবে, বাংলা তথা ভারত গৌরবান্বিত হয়।

'উদ্ভিদের উত্তেজনাশীলতা'

১৯১৩ বা ১৯১৪ সালে জগদীশচন্দ্র যে নতুন বই প্রকাশ করেন, তার মূল কথাটি আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করব। উদ্ভিদে ধাতুর চেয়ে বেশী স্পষ্টভাবে উত্তেজনা দেখা যায়—জীবনতত্ত্বের ব্যাপারে এইটুকু আবিষ্কার করে জগদীশচন্দ্র বিশুদ্ধ পদার্থবিদ্যায় ফিরে আসতে চেয়েছিলেন; কিন্তু রয়াল সোসাইটিতে উদ্ভিদের সাড়া সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতার পর ইংলণ্ডের প্রধান জীবতত্ত্ববিদ্ স্যাণ্ডারসন সায়েব যখন জগদীশচন্দ্রকে বললেন, "জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি যে-সব পরীক্ষা করেছেন সে সম্বন্ধে আমাদের চেষ্টা পূর্বেই নিষ্ফল হয়েছে, সুতরাং আপনার মত অগ্রাহ্য," জগদীশচন্দ্র তখনই সঙ্কল্প নিলেন, "আজ যাহা প্রত্যাখ্যাত হইল তাহাই সত্য", সুতরাং তাঁকে তা প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্র ত্যাগ করে জগদীশচন্দ্র ক্রমেই উদ্ভিদ্-শারীরবৃত্তের ক্ষেত্রে গবেষণায় জড়িয়ে পড়লেন। পূর্ববর্তী বই দুখানির মত 'উদ্ভিদের উত্তেজনাশীলতা' হচ্ছে তারই ফল।

এই নূতন বিষয় সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র এক প্রবন্ধে বলেছেন:

"জীব কোনরূপ আঘাত পাইলে চকিত হয়। সেই সঙ্কোচনই জীবনের সাড়া। জীবনের পরিপূর্ণ অবস্থায় সাড়া বৃহৎ হয়, অবসাদের সময় ক্ষীণ হয় এবং মৃত্যুর পর সাড়ার অবসান হয়। বৃক্ষও আহত হইলে ক্ষণিকের জন্য সঙ্কুচিত হয়;… কলের সাহায্যে সেই আকুঞ্চন বৃহদাকারে লিপিবদ্ধ হইতে পারে। ইহার বাধা এই যে, বৃক্ষের আকুঞ্চন-শক্তি অতি ক্ষীণ এবং সাড়া লিখিত হইবার সময় লেখনী ফলকের ঘর্ষণে থামিয়া যায়। এই বাধা দূর করিবার জন্য "সমতাল" যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। যদি বেহালার দুই বিভিন্ন তার একই সুরে বাঁধা যায় তাহা হইলে একটি তার বাজাইলে অন্য তারটি সমতালে ঝঙ্কার দিয়া থাকে। তরুলিপি যন্ত্রের লেখনীটি লৌহতার-নির্মিত এবং এই তারটি বাহিরের অন্য তারের সহিত একসুরে বাঁধা। বাহিরের তারটি একশতবার কম্পিত হইলে লেখনীও একশতবার স্পন্দিত হইবে এবং ফলকে একশত বিন্দু অঙ্কিত করিবে।

"সব গাছই যে সাড়া দেয় তাহা বৈদ্যুতিক উপায়ে দেখান যাইতে পারে। তবে লজ্জাবতী লতাই কেন পাতা নাড়িয়া সাড়া দেয়, সাধারণ গাছ কেন দেয় না? … আমাদের বাহুর এক পাশের মাংসপেশী সঙ্কোচন দ্বারাই আমরা হাত নাড়িয়া সাড়া দেই। উভয় দিকের মাংসপেশীই যদি সঙ্কুচিত হইত তবে হাত নড়িত না। সাধারণ বৃক্ষের চতুর্দিকের পেশী আহত হইয়া সম-ভাবে সঙ্কুচিত হয়; তাহার ফলে কোন দিকেই নড়া হয় না। যদি একদিকের পেশী ক্লোরোফরম দিয়া অসাড় করিয়া লওয়া

যায় তাহা হইলে সাধারণ গাছের সাড়া দিবার শক্তি সহজেই প্রমাণিত হয়।

"জীব যখন আহত হয় ঠিক সেই মুহূর্তে সাড়া দেয় না। ভেকের পায়ে চিমটি কাটিলে সাড়া পাইতে ন্যূনাধিক $\frac{১}{১০০}$ সেকেণ্ড সময় লাগে।··· বাহিরের অবস্থা অনুসারে এই অননুভূতি-কালের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। মৃদু আঘাত অনুভব করিতে একটু সময় লাগে, কিন্তু প্রচণ্ড আঘাত অনুভব করিতে বেশী সময়ের অপব্যয় হয় না। আর যখন শীতে জীব আড়ষ্ট থাকে তাহার অননুভূতি-কাল তখন দীর্ঘ হইয়া পড়ে। আমরা যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ি তখনও অনুভূতি করিবার পূর্বকাল একান্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ে, এনন কি সে সময়ে কখন কখন একেবারেই অনুভব-শক্তি লোপ পায়। গাছের অনুভূতি সম্বন্ধে একই প্রথা। লজ্জাবতীর তাজা অবস্থায় অননুভূতি-কাল $\frac{৬}{১০০}$ সেকেণ্ড মাত্র। আর একটি আশ্চর্য বিষয় এই যে, স্থূলকায় বৃক্ষ দিব্য ধীরেসুস্থে সাড়া দিয়া থাকে। কিন্তু কৃশকায়টি একেবারে সপ্তমে চড়িয়া বসে। মনুষ্যলোকেও ইহার সাদৃশ্য আছে···। শীতে গাছের অননুভূতি-কাল প্রায় দ্বিগুণ দীর্ঘ হইয়া পড়ে। আঘাতের পর গাছের প্রকৃতিস্থ হইতে প্রায় পনের মিনিট লাগে। তাহার পূর্বেই আঘাত করিলে অননুভূতি-সময় প্রায় দেড়গুণ দীর্ঘ হয়। অধিক ক্লান্ত হইলে অনুভূতি-শক্তির সাময়িক লোপ হয়, তখন গাছ একেবারেই সাড়া দেয় না।

"সময়-ভেদে একই আঘাতে সাড়ার প্রবলতার তারতম্য ঘটে, সকাল বেলা রাত্রির নিশ্চেষ্টতাজনিত গাছের একটু জড়তা থাকে।

আঘাতের পর আঘাতে সে জড়তা চলিয়া যায় এবং সাড়ার মাত্রা ক্রমেই বাড়িতে থাকে; সেটা যেন জাগরণের অবস্থা। গরম জলে স্নান করাইয়া লইলে গাছের জড়তা শীঘ্রই দূর হয়। বিকাল বেলায় এসব উল্টা হইয়া যায়; ক্লান্তিবশতঃ সাড়া ক্রমে ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু বিশ্রামের জন্য সময় দিলে সেই ক্লান্তি চলিয়া যায়। আঘাতের মাত্রা বাড়াইলে সাড়ার মাত্রাও বাড়িতে থাকে; কিন্তু তাহারও একটা সীমা আছে। এ বিষয়ে মানুষের সহিত গাছের প্রভেদ নাই। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শীতকালে ঘা খাইলে যেমন সারিতে আমাদের অনেকটা সময় লাগে, শীতকালে গাছেরও আঘাত খাইয়া প্রকৃতিস্থ হইতে অনেক বিলম্ব ঘটে। ...

"জন্তুদেহে এক স্থান আঘাত করিলে আঘাতের ধাক্কা স্নায়ু দ্বারা দূরে পৌঁছে। স্নায়বীয় প্রবাহের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রথমতঃ, স্নায়বীয় বেগ বিবিধ অবস্থায় হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। উষ্ণতায় বেগ বৃদ্ধি এবং শৈত্যে বেগ হ্রাস পায়। এতদ্‌ব্যতীত,...যতক্ষণ স্নায়ু দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিতে থাকে ততক্ষণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে না। কিন্তু বিদ্যুৎ-প্রবাহ প্রেরণ এবং বন্ধ করিবার সময় কোন বিশেষ স্থলে উত্তেজনা এবং অন্যস্থানে অবসাদ পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহ বহিবার মুহূর্তে যে স্থান দিয়া বিদ্যুৎ স্নায়ুসূত্র পরিত্যাগ করে সেই স্থলেই স্নায়ু হঠাৎ উত্তেজিত হয়। এতদ্‌ব্যতীত যদি স্নায়ুর কোন অংশে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করা যায় তবে সেই অংশ দিয়া আর কোন সংবাদ যাইতে পারে না। কিন্তু বিদ্যুৎপ্রবাহ

বন্ধ করিলে অমনি রুদ্ধ পথ খুলিয়া যায়, স্নায়ুসূত্র পুনরায় সংবাদবাহক হয়।

"যন্ত্রের সাহায্যে বৃক্ষদেহেও যে স্নায়বীয় সংবাদ প্রেরিত হয় তাহা অতি সূক্ষ্মভাবে ধরা যাইতে পারে এবং একই কলের সাহায্যে এক স্থান হইতে অন্যস্থানে সংবাদ পৌঁছিতে কত সময় লাগে তাহাও নির্ণীত হয়। স্নায়বীয় বেগ বৃক্ষদেহে ভেকদেহের তুলনায় মন্থর; কিন্তু নিম্নজাতীয় জন্তু হইতে দ্রুত। প্রাণী ও উদ্ভিদে ৯ ডিগ্রি উষ্ণতায় স্নায়ুবেগ প্রায় দ্বিগুণ বর্ধিত হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহের আরম্ভকালে বৃক্ষস্নায়ুর এক স্থান উত্তেজিত, অন্য-স্থল অবসাদিত হয়। বিদ্যুৎপ্রবাহের দ্বারা বৃক্ষের স্নানবীয় ধাক্কা হঠাৎ বন্ধ হয়। স্নায়ু সম্বন্ধে যত প্রকার পরীক্ষা আছে সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা জীব ও উদ্ভিদে যে এ সম্বন্ধে কোন ভেদ নাই তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

"···মানব এবং জীবে এরূপ পেশী আছে যাহা আপনাআপনি স্পন্দিত হয়। যতকাল জীবন থাকে ততকাল হৃদয় অহরহ স্পন্দিত হইতেছে।···

"উদ্ভিদেও এইরূপ স্বতঃস্পন্দন দেখা যায়।···

"শারীরতত্ত্ববিদেরা মানুষের হৃদয় জানিতে যাইয়া ভেক ও কচ্ছপের হৃদয় লইয়া খেলা করেন।···সমস্ত ব্যাঙটিকে লইয়া পরীক্ষা সুবিধাজনক নহে, এজন্য তাঁহারা হৃদয় কাটিয়া বাহির করেন, পরীক্ষা করেন কি কি অবস্থায় হৃদয়গতির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

"হৃদয় কাটিয়া বাহির করিলে তাহার স্বাভাবিক স্পন্দন বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। তখন সূক্ষ্ম নল দ্বারা হৃদয়ে রক্তের চাপ

দিলেই স্পন্দনক্রিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া অক্ষুণ্ণ গতিতে চলিতে থাকে। এ সময়ে উত্তাপিত করিলে হৃদয়স্পন্দন অতি দ্রুত বেগে সম্পাদিত হয়; কিন্তু ঢেউগুলি খর্বকায় হয়। শৈত্যের ফল ইহার বিপরীত। নানাবিধ ভৈষজ্যদ্বারা হৃদয়ের স্বাভাবিক তাল বিভিন্নরূপে পরিবর্তিত হয়। ইহার প্রয়োগে ক্ষণিকের জন্য হৃদয়স্পন্দন স্থগিত হয়, হাওয়া করিলে সেই অচৈতন্য অবস্থা চলিয়া যায়। ক্লোরোফরমের প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত সাংঘাতিক। মাত্রাধিক্য হইলেই হৃদয়ক্রিয়া একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। এতদ্‌ব্যতীত বিবিধ বিষপ্রয়োগে হৃদয়স্পন্দন বন্ধ হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে এক আশ্চর্য রহস্য এই যে, কোন বিষে হৃদয়স্পন্দন সঙ্কুচিত অবস্থায়, অন্য বিষে ফুল্ল অবস্থায় নিঃস্পন্দিত হয়। এইরূপ পরস্পরবিরোধী এক বিষ দ্বারা অন্য বিষ ক্ষয় হইতে পারে।

"বনচাঁড়াল গাছ দিয়া উদ্ভিদের স্পন্দনশীলতা অনায়াসে দেখা যাইতে পারে। ইহার ক্ষুদ্র পাতাগুলি আপনাআপনি নৃত্য করে।...তরুস্পন্দনের সাড়ালিপি পাঠ করিয়া জন্তু ও উদ্ভিদের স্পন্দন যে একই নিয়মে নিয়মিত তাহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারিয়াছি।

"প্রথমতঃ, পরীক্ষার সুবিধার জন্য বনচাঁড়ালের পত্র ছেদন করিলে স্পন্দনক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু নলদ্বারা উদ্ভিদ্‌-রসের চাপ দিলে স্পন্দনক্রিয়া পুনরায় আরম্ভ হয় এবং অনিবারিত গতিতে চলিতে থাকে। তাহার পর দেখা যায় যে উত্তাপে স্পন্দনসংখ্যা বর্ধিত, শৈত্যে স্পন্দনের মন্থরতা ঘটে।

ইহার প্রয়োগে স্পন্দনক্রিয়া স্তম্ভিত হয়; কিন্তু বাতাস করিলে অচৈতন্য ভাব দূর হয়। ক্লোরোফরমের প্রভাব মারাত্মক। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, যে বিষ দ্বারা যে ভাবে স্পন্দনশীল হৃদয় নিঃস্পন্দিত হয়, সেই বিষে সেই ভাবে উদ্ভিদের স্পন্দনও নিরস্ত হয়। উদ্ভিদেও এক বিষ দিয়া অন্য বিষ ক্ষয় করিতে সমর্থ হইয়াছি।

"এক্ষেত্রে দেখিতে হইবে, স্বতঃস্পন্দনের মূল রহস্য কি। উদ্ভিদ্ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে, কোন কোন উদ্ভিদ্-পেশীতে আঘাত করিলে সেই মুহূর্তে তাহার কোন উত্তর পাওয়া যায় না। তবে যে বাহিরের শক্তি উদ্ভিদে প্রবেশ করিয়া একেবারে বিনষ্ট হইল তাহা নহে; উদ্ভিদ্ সেই আঘাতের শক্তিকে সঞ্চয় করিয়া রাখিল। এইরূপে আহারজনিত বল, বাহিরের আলোক উত্তাপ ও অন্যান্য শক্তি উদ্ভিদ্ সঞ্চয় করিয়া রাখে; যখন সম্পূর্ণ ভরপুর হয় তখন সঞ্চিত শক্তি বাহিরে উথলিয়া পড়ে। সেই উথলিয়া পড়াকে আমরা স্বতঃস্পন্দন মনে করি। যাহা স্বতঃ বলিয়া মনে করি প্রকৃতপক্ষে তাহা সঞ্চিত বলের বহিরোচ্ছ্বাস। যখন সঞ্চয় ফুরাইয়া যায় তখন স্বতঃস্পন্দনেরও শেষ হয়। ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া বনচাঁড়ালের সঞ্চিত তেজ হরণ করিলে স্পন্দন বন্ধ হইয়া যায়। খানিকক্ষণ পর বাহির হইতে উত্তাপ সঞ্চিত হইলে পুনরায় স্পন্দন আরম্ভ হয়।···

"পরিশেষে উদ্ভিদের জীবনে এরূপ সময় আসে যখন কোন এক প্রচণ্ড আঘাতের পর হঠাৎ সমস্ত সাড়া দিবার শক্তির অবসান হয়। সেই আঘাত, মৃত্যুর আঘাত। কিন্তু সেই

অন্তিম মুহূর্তে গাছের স্থির স্নিগ্ধ মূর্তি ম্লান হয় না। হেলিয়া পড়া কিম্বা শুষ্ক হইয়া যাওয়া অনেক পরের অবস্থা।…মানুষের মৃত্যুকালে যেমন একটা দারুণ আক্ষেপ সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া বহিয়া যায় তেমনি দেখিতে পাই, অন্তিম মুহূর্তে বৃক্ষদেহের মধ্য দিয়াও একটা বিপুল কুঞ্চনের আক্ষেপ প্রকাশ পায়। এই সময়ে একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ মুহূর্তের জন্য মুমূর্ষু বৃক্ষগাত্রে তীব্র বেগে ধাবিত হয়। লিপিযন্ত্রে এই সময় হঠাৎ জীবনের লেখার গতি পরিবর্তিত হয়—ঊর্ধ্বগামী রেখা নিম্ন দিকে ছুটিয়া গিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়। এই সাড়াই বৃক্ষের অন্তিম সাড়া।

"জীব ও উদ্ভিদের মধ্যে যে কৃত্রিন ব্যবধান রচিত হইয়াছিল, তাহা দূরীভূত হইল। কল্পনারও অতীত অনেকগুলি সংবাদ আজ বিজ্ঞান স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া বহুত্বের ভিতর একত্ব প্রমাণ করিল।"

বস্থ বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা

১৯১৪ সালের জয়যাত্রা সেরে জগদীশচন্দ্র যখন দেশে ফিরলেন দেশবাসী তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডি. এসসি.' উপাধি দিল। ভারত সরকার তার অভ্যস্ত জড়তা কটিয়ে জগদীশচন্দ্রের বহু আকাঙ্ক্ষিত একটা সুসজ্জিত গবেষণাগার স্থাপনে অগ্রসর হল; জগদীশচন্দ্র সে গবেষণাগারে কাজ করার সুযোগ বড় একটা পেলেন না বটে, তবু প্রেসিডেন্সি কলেজ তাঁর দ্বারা সমৃদ্ধ হল। ১৯১৩ সালেই জগদীশচন্দ্রের সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সরকার তাঁর কার্যকাল আরও দু বছর বাড়িয়ে দেওয়ায় ১৯১৫ সাল পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে নিয়মিত অধ্যাপনা করলেন। অবসর গ্রহণের সময় হবার আগেই সরকারী চাকরিতে প্রবীণতম অধ্যাপক হিসাবে, ইচ্ছা করলেই তিনি শিক্ষা-বিভাগের পরিচালকের পদ অধিকার করতে পারতেন; কিন্তু তিনি তা না করে অধ্যাপকই থেকে যান। অধ্যাপক হিসাবেও কয়েক বছর আগেই তিনি শিক্ষা-বিভাগের

উচ্চতম বেতন পাওয়ার অধিকারী হতে পারতেন; কিন্তু জগদীশচন্দ্র চাকরির ব্যাপারে ছিলেন কতকটা উদাসীন, কোনো দিন তিনি 'সিভিল লিস্ট' (সরকারী চাকুরেদের পঞ্জী) খুলে দেখেন নি, সরকারী শিক্ষা-বিভাগও কোনোদিন সম্ভবতঃ ইচ্ছা করেই—জগদীশচন্দ্রের উচ্চতম বেতন পাওয়ার অধিকার সরকারের নজরে আনে নাই। কলেজ থেকে অবসর নেওয়ার কিছু আগে ব্যাপারটা সরকারের নজরে আসায়, সরকার তাঁর অধিকার স্বীকার করে নিয়ে বাকি পাওনা তাঁকে এক থোকে দিয়ে দিলেন। জগদীশচন্দ্র তাঁর কষ্টসঞ্চিত অন্য টাকার সঙ্গে এ টাকাটাও রেখে দিলেন, তাঁর সঙ্কল্পিত পরীক্ষাগার স্থাপনের জন্যে। ১৯১৫ সালে জগদীশচন্দ্রের চাকরির সময় শেষ হয়ে গেলে, সরকার তাঁকে চিরজীবনের জন্যে পুরা বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজের 'এমেরিটাস্' অধ্যাপক করে নিলেন। এইভাবে ঐ কলেজের সঙ্গে আমরণ তাঁর সম্পর্ক বজায় রাখা হল।

১৯১৫ সালে তাঁর চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার বছর জগদীশচন্দ্র আর একবার নানা দেশ ঘুরে তাঁর আবিষ্কারগুলোর কথা প্রচার করে এলেন। ১৯১৬-১৭ সালের নববর্ষে ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রকে 'নাইট' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করলেন। এত সম্মান, এত স্বীকৃতি ও অর্থাদি পেয়ে অনেকেই কর্মজীবন ত্যাগ করে; কিন্তু জগদীশচন্দ্র সে-প্রকৃতির লোক ছিলেন না। বিশেষতঃ তাঁর সমস্ত কর্মজীবনের লক্ষ্যটি তখনও পৌঁছানো হয় নাই—তখনও তাঁর বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এবার তার সময় এল। দৈনন্দিন জীবনেও নানা কৃচ্ছ্রসাধনা করে

তিনি চাকরি জীবনে যা কিছু সঞ্চয় করেছিলেন, সে-টাকা এবং এক বিশিষ্ট বন্ধুর উইলের বলে প্রাপ্ত টাকা হাতে গিয়েছিল; সুতরাং টাকার দিক থেকে একটা উপায় হয়ে গিয়েছিল। চাকরি থেকে অবসর পেয়েই জগদীশচন্দ্র তাঁর গবেষণাগার নির্মাণ করাতে লাগলেন। এই সময়েও তাঁর গবেষণার বিরতি ঘটে নাই। তিনি তাঁর দার্জিলিঙএর বাড়িতে এবং (উলুবেড়িয়ার নিকটবর্তী) সিজবেড়িয়া গ্রামের বাড়িতে তাঁর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

১৯১৭ সালের ৩০শে নভেম্বর তারিখে বসু বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হল। তেইশ বছর আগে, ঐ তারিখেই আর এক জন্মদিনে জগদীশচন্দ্র বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জীবনোৎসর্গ করার সঙ্কল্প প্রথম নিয়েছিলেন, সেই সঙ্কল্পের কথা স্মরণ করেই বসু বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার দিনটি স্থির করা হয়েছিল বলে মনে হয়।

বসু বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা হচ্ছে শুনে রবীন্দ্রনাথ জগদীশ-চন্দ্রকে লিখেছিলেন:

"এতদিন তোমার সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল আজকে তার সৃষ্টির দিন এসেছে। কিন্তু এ তো তোমার একলার সঙ্কল্প নয়, এ আমাদের সমস্ত দেশের সঙ্কল্প, তোমার জীবনের মধ্যে দিয়ে এর বিকাশ হতে চলল। জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের উদ্বোধন হয়—তোমার প্রাণের সামগ্রীকে তুমি আমাদের দেশের প্রাণের সামগ্রী করে দিয়ে যাবে—তারপর্ থেকে সেই চিরন্তন প্রাণের প্রবাহে আপনিই যে এগিয়ে চলতে থাকবে।··· কেবলমাত্র অভিমান দিয়ে ত কোন সত্য বস্তু আমরা সৃজন

করতে পারিনে। কিন্তু এ যে তোমার চিরদিনের সত্যসাধনা—এর মধ্যে যে তুমি আপনাকে দিয়েচ, আপনাকে পেয়েচ—তুমি যে মন্ত্রস্রষ্টা ঋষির মত তোমার মন্ত্রকে তোমার অন্তরে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েচ, এইজন্যে বাইরে তাকে প্রকাশ করবার পূর্ণ অধিকার ঈশ্বর তোমাকে দিয়েচেন। সেই অধিকারের জোরে আজ তুমি একলা দাঁড়িয়ে তোমার মানসপদ্মের বিজ্ঞানসরস্বতীকে দেশের হৃদয়পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করচ। তোমার মন্ত্রের গুণে, তোমার তপস্যার বলে দেবী সেই আসনে অচলা হবেন এবং প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে তাঁর ভক্তদের নব নব বর দান করতে থাকবেন।"

বসু বিজ্ঞানমন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে জগদীশচন্দ্র যে 'নিবেদন' পাঠ করেন, সেটিতে জগদীশচন্দ্রের জীবনের পূর্ণ রূপটি সহজেই চোখে পড়ে, ধরা পড়ে তাঁর নিষ্কলঙ্ক ভারতীয়তা, তাঁর নিষ্কাম কর্মসাধনা। সে বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন :

"আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যসত্য পরীক্ষাদ্বারা নির্ধারিত হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও অতীত দুই একটি মহাসত্য আছে; তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাসের আশ্রয় করিতে হয়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও পরীক্ষা আছে; তাহা দুই একটি ঘটনার দ্বারা হয় না; তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমস্ত জীবনব্যাপী সাধনার আবশ্যক। সেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।··· কি সেই মহাসত্য যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার

জীবন ও আরাধনা কোন উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না ; তখন অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে।”

জগদীশচন্দ্র তাঁর নিবেদনে জানালেন, ভারতবাসীর পক্ষে যে বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব সম্ভব, এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তাঁকে বহু দুঃখ ও নৈরাশ্যের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, বহু সংগ্রাম করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু “এই আসল সংগ্রামে **ভারতেরই** জয় হইল।” তিনি কামনা করলেন, “আমার কার্য যাঁহারা অনুসরণ করিবেন তাঁহাদের পথ যেন কোনদিন অবরুদ্ধ না হয়।”

এই বক্তৃতায় জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানপ্রচারে ভারতের বিশেষ স্থান কি, সে সম্বন্ধে যা কিছু বলেছিলেন, তার সবটুকুই উদ্ধৃতি-যোগ্য। তিনি বলেছিলেন :

“বিজ্ঞান ত সার্বভৌমিক, তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে এমন কি কোন স্থান আছে যাহা ভারতীয় সাধক ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে ? তাহা নিশ্চয়ই আছে। বর্তমান কালে বিজ্ঞানের প্রসার বহুবিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রতীচ্য দেশে কার্যের সুবিধার জন্য তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। দৃশ্যজগৎ অতি বিচিত্র এবং বহুরূপী। এত বিভিন্নতার মধ্যে যে কিছু সাম্য আছে তাহা কোনরূপেই বোধগম্য হয় না। এই সতত চঞ্চল প্রাণী আর এই চিরমৌন অবিচলিত উদ্ভিদ্‌, ইহাদের ম্যধ্য কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। আর এই উদ্ভিদের মধ্যে একই কারণে বিভিন্ন-রূপে সাড়া দেখা যায়। কিন্তু এত বৈষম্যের মধ্যও ভারতীয়

চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে ছুটিয়া জড় উদ্ভিদ এবং জীবের মধ্যে সেতু বাঁধিয়াছে। এতদর্থে ভারতীয় সাধক কখনও তাহার চিন্তা কল্পনার উন্মুক্ত রাজ্যে অবাধে প্রেরণ করিয়াছে এবং পরমুহূর্তেই তাহাকে শাসনের অধীনে আনিয়াছে। আদেশের বলে জড়বৎ অঙ্গুলিতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে এবং যে স্থানে মানুষের ইন্দ্রিয় পরাস্ত হইয়াছে তথায় কৃত্রিম অতিন্দ্রিয় সৃজন করিয়াছে। তাহা দিয়া এবং অসীম ধৈর্য সম্বল করিয়া অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্য, পরীক্ষা প্রণালীতে স্থির প্রতিষ্ঠা করিবার সাহস বাঁধিয়াছে। যাহা চক্ষুর অগোচর ছিল তাহা দৃষ্টিগোচর করিয়াছে, কৃত্রিম চক্ষু পরীক্ষা করিয়া মনুষ্যদৃষ্টির অভাবনীয় এমন এক নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে যে, তাহার দুইটি চক্ষু এক সময়ে জাগরিত থাকে না; পর্যায়ক্রমে একটি ঘুমায় আর একটি জাগিয়া থাকে। ধাতুপাত্রে লুক্কায়িত স্মৃতির অদৃশ্য ছাপ প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছে। অদৃশ্য আলোক সাহায্যে কৃষ্ণপ্রস্তরের ভিতরের নির্মাণ-কৌশল বাহির করিয়াছে। আণবিক কারুকার্য ঘূর্ণ্যমান বিদ্যুৎ-ঊর্মির দ্বারা দেখাইয়াছে। বৃক্ষজীবনে মানবীয় জীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া নির্বাক জীবনের উত্তেজনা মানবের অনুভূতির অন্তর্গত করিয়াছে। বৃক্ষের অদৃশ্য বৃদ্ধি মাপিয়া লইয়াছে এবং বিভিন্ন আহার ও ব্যবহারে সেই বৃদ্ধি-মাত্রার পরিবর্তন মুহূর্তে ধরিয়াছে। মনুষ্যস্পর্শেও যে বৃক্ষ সঙ্কুচিত হয় তাহা প্রমাণ করিয়াছে, যে উত্তেজক মানুষকে প্রফুল্ল করে; যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও তাহাদের একইবিধ ক্রিয়া প্রমাণিত করিতে সমর্থ

হইয়াছে। বিষে অবসন্ন মুমূর্ষু উদ্ভিদ্‌কে ভিন্ন বিষ প্রয়োগ দ্বারা পুনর্জীবিত করিয়াছে। উদ্ভিদ্‌পেশীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে হৃদয়স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া দেখাইয়াছে। বৃক্ষ প্রবাহে স্নায়ুপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিয়াছে। প্রমাণ করিয়াছে যে, যে সকল কারণে মানুষের স্নায়ুর উত্তেজনা বর্ধিত বা মন্দীভূত হয় সেই একই কারণে উদ্ভিদ্‌স্নায়ুর আবেগ উত্তেজিত অথবা প্রশমিত হয়। এই সকল কথা কল্পনাপ্রসূত নহে। যে সকল অনুসন্ধান আমার পরীক্ষাগারে গত তেইশ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত হইয়াছে, ইহা তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত ও অপরিপূর্ণ ইতিহাস। যে সকল অনুসন্ধানের কথা বলিলাম তাহাতে নানা পথ দিয়া পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, এমন কি মনস্তত্ত্বও এককেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বিধাতা যদি বিজ্ঞানের কোন বিশেষ তীর্থ ভারতীয় সাধকের জন্য নির্দেশ করিয়া থাকেন তবে এই চতুর্বেণীসঙ্গমেই সেই মহাতীর্থ।"

জগদীশচন্দ্র তাঁর এই নিবেদনে বললেন, "অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে কেবলমাত্র বিশ্বাসের বলেই চিরজীবন চলিয়াছি," সুতরাং "জীবিত থাকিতেই হয়ত দেখিতে পাইব যে, এই মন্দিরের শূন্য অঙ্গন দেশবিদেশ হইতে সমাগত যাত্রীদ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।" তিনি বললেন যে, তাঁর মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য হল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা আর জগতে সেই নূতন তত্ত্ব প্রচার করা। জগদীশচন্দ্র ঘোষণা করলেন, "সর্ব জাতির সকল নরনারীর জন্য এই মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে, এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না।"

বক্তৃতার উপসংহারে জগদীশচন্দ্র মন্দির স্থাপত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, "মৃত্যু সর্বজয়ী নহে; জড়সমষ্টির উপরই কেবল তাহার আধিপত্য। মানবচিন্তাপ্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও নির্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ, চিন্তায়, বিত্তে নহে। মহাসাম্রাজ্য দেশবিজয়ে কোনদিন স্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান প্রচার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বাইশ শত বৎসর পূর্বে এই ভারতখণ্ডেই অশোক যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা কেবল বিতরণের জন্য, দুঃখ মোচনের জন্য এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্ধ আমলকমাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন—এখন ইহাই আমার সর্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়। এই আমলকের চিহ্ন মন্দিরগাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। পতাকা-স্বরূপ সর্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত—যে দৈব অস্ত্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থির দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরার্থে জীবনদান করেন তাঁহাদের অস্থিদ্বারাই বজ্র নির্মিত হয়, যাহার জ্বলন্ত তেজে জগতে দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। আজ আমাদের অর্ঘ্য অর্ধ-আমলকমাত্র, কিন্তু পূর্বদিনের মহিমা মহত্তর হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করিবেই করিবে।"

জগদীশচন্দ্র তাঁর বসু বিজ্ঞানমন্দিরের গাত্রে যে উৎসর্গ-ফলক স্থাপন করলেন সেটিতে অতি সংক্ষেপে তাঁর জীবন ও সাধনার মর্মবাণী বিঘোষিত হল :

ভারতের গৌরব ও জগতের
কল্যাণ কামনায়
এই বিজ্ঞানমন্দির
দেবচরণে নিবেদন করিলাম।

১৫ই অগ্রহায়ণ, সংবৎ ১৯৭৪ —শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

সাধনার বন্ধু

বসু বিজ্ঞানমন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে জগদীশচন্দ্র বলেছিলেন :

"রিক্তহস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্তহস্তেই ফিরিয়া যাইব ; ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয় তাহা দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব। আর একজনও এই কার্যে তাঁহার সর্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য আমার দুঃখ এবং পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে। বিধাতার করুণা হইতে কোনদিন একেবারে বঞ্চিত হই নাই। যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন তখনও দুই একজনের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে।" দেখা যাক, তিনি কাদের কথা ইঙ্গিত করেছেন।

স্পষ্টতঃ প্রথম ইঙ্গিত তাঁর সহধর্মিণী অবলা দেবী সম্বন্ধে। বিলাতে শিক্ষা শেষ করে দেশে ফেরার পর জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। চাকরির প্রথম দিকে জগদীশচন্দ্র সরকার তাঁকে ন্যায্য হারে বেতন না দেওয়ার জন্যে যখন তিনি বেতন

নিতেন না, জগদীশচন্দ্র যখন পিতার ঋণ পরিশোধের জন্যে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের মধ্যে থাকতেন এবং তারও পরের কালে বিজ্ঞানমন্দির সৃষ্টি করার জন্য যখন তিনি যথাসাধ্য সঞ্চয় করতেন, তখন এই মহীয়সী মহিলা ছিলেন তাঁর একনিষ্ঠা সহযোগিনী। অবলা দেবী ছিলেন দেশবন্ধুর জ্যাঠ্যা ৺দুর্গামোহন দাসের কন্যা, এস· আর দাশের ভগ্নী, সেকালের অভিজাত সমাজের রীতি-রেওয়াজ অনুসরণ করাই তাঁর পক্ষে হত স্বাভাবিক, কিন্তু বাড়ির যেসব কাজ অনেক সময় চাকর-বাকরদের হাতেই দেওয়া থাকে অবলা দেবী চিরজীবন তা নিজের হাতে করাই পছন্দ করতেন। স্বামীর যত্ন নেওয়া, তাঁর সাধনায় উৎসাহ দেওয়া, তাঁর বন্ধু ও ছাত্রদের সমাদর করা, স্বামীকে যথা-সম্ভব অর্থচিন্তা থেকে মুক্ত রাখা, তাঁর মেজাজ বুঝে চলা, নারীর এসব গুণই অবলা দেবীর ছিল। দুর্গম হিমালয়ের তীর্থযাত্রায় হোক, ইউরোপ-আমেরিকায় বিজ্ঞান-অভিযানে হোক, অবলা দেবী ছিলেন জগদীশচন্দ্রের একনিষ্ঠা সহচরী, তাঁর নির্ভরস্থল। তাঁর স্নিগ্ধ দৃষ্টি যেন জগদীশচন্দ্রকে সব সময় সর্বপ্রকার আপদ-বিপদ থেকে আবৃত রাখত। অবলা দেবীর মতো স্ত্রী না পেলে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনা যে কতখানি সফল হত, কে জানে?

জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকেই যখন সন্দিহান ছিলেন, তখনও যে 'দুই একজনের বিশ্বাস' তাঁকে বেষ্টন করে রেখেছিল, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা নিবেদিতা। বাংলার তথা ভারতের, নবজাগৃতির ব্যাপারে এই বিদেশিনী অথচ একান্তভাবে ভারতীয় নারীর অবদান ছিল

নানামুখী এবং অসামান্য। ১৮৯৮ সালের শেষ দিকে নিবেদিতা জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে পরিচিত হন ; নিজে সুশিক্ষিতা ও অত্যন্ত বুদ্ধিমতী হওয়ায় নিবেদিতার পক্ষে জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনার মহত্ত্ব বুঝতে বিলম্ব হয় নাই। সে সময় হতেই জগদীশচন্দ্রের সাধনার পথ সুগম করার ব্যাপারে, জগদীশচন্দ্রকে অবিরত ব্যাকুলভাবে উৎসাহদানের ব্যাপারে নিবেদিতার কোনোদিন ক্লান্তি ছিল না। বিলাতে গিয়ে একবার জগদীশচন্দ্র এবং আর একবার জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণী অসুস্থ হয়ে পড়লে, নিবেদিতা তাঁর মায়ের বাড়িতে রেখে তাঁদের সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন। নিবেদিতা কোনোদিন অবিশ্বাস করেন নাই যে, জগদীশচন্দ্রের সাধনা তাঁর ধ্যানের ভারতকে গৌরবন্বিত করবে ; এই কারণেই ছিল তাঁর এই আগ্রহ। রবীন্দ্রনাথকে লেখা নিবেদিতার জগদীশচন্দ্রের সম্বন্ধে চিঠি থেকে বোঝা যায়, নিবেদিতা জগদীশ-চন্দ্রকে ভারতের মহত্তম সন্তানদের মধ্যে গণ্য করতেন। রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর এক প্রবন্ধে নিবেদিতাকে "লোকমাতা" বলেছেন, তাঁর তপস্যাকে "সতীর তপস্যা" বলেছেন, সেটা যে কত সত্য, জগদীশচন্দ্রের প্রসঙ্গেও তার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন শুধু তাঁর নিজের স্বপ্নই ছিল না, নিবেদিতারও স্বপ্ন ছিল। বসু বিজ্ঞানমন্দিরের প্রবেশপথে যে 'মন্দিরের পথে দীপহস্তা নারীর' মূর্তি দেখা যায়, সেটার সার্থকতা বুঝতে হলে, নিবেদিতার কথাই স্মরণ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখেছেন, "জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য।"

নিবেদিতার পরেই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের কথা। জগদীশচন্দ্র যখন তাঁর প্রথমবারের বিজয়যাত্রা শেষ করে দেশে ফিরলেন (১৮৯৭ সালে), রবীন্দ্রনাথ তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে গিয়েছিলেন, তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে। ১৯০০ সালে এক চিঠিতে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখেছিলেন, "তিন বৎসর পূর্বে আমি তোমার নিকট একপ্রকার অপরিচিত ছিলাম, তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডাকিলে। ··· তোমাদের উৎসাহধ্বনিতে মাতৃস্বর শুনিলাম।" জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্যে পরিণত হয় ; একজন আর জনের সাধনায় সাহস ও শক্তি জোগান। জগদীশচন্দ্রের গবেষণার সুযোগ করে দেবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বাস্তব সাহায্য তো করেনই, উপরন্তু অন্যের কাছ থেকেও অর্থাদি সংগ্রহ করে দেন। তার চেয়ে যা বড় কথা এই যে, জগদীশ-চন্দ্রের হতাশার দিনে যাঁরা তাঁর কৃতিত্বে এতটুকু অবিশ্বাস করেন নি, জগদীশচন্দ্রের গবেষণালব্ধ সত্য প্রচারে যাঁরা যথাশক্তি চেষ্টা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

জগদীশচন্দ্র তাঁর এক নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন : "জীবনের বহু বিচিত্র বিকাশ ও ধারার পরিচয়-লাভে একদা আমি যখন তিলে তিলে অগ্রসর হইতেছিলাম, সেই ক্লান্তিহীন প্রয়াসে বৎসরের পর বৎসর তিনি আমাকে প্রতিদিন সখ্য ও সাহচর্য দান করিয়াছেন।"

বস্তুতঃ স্বদেশবাসী কোনো কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে শত্রুতা পেয়ে থাকলেও, বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের এবং বাঙালী

সাধারণের সদিচ্ছা থেকে জগদীশচন্দ্র কোনোদিন বঞ্চিত হন নাই। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ জগদীশচন্দ্রের বিজয়কে স্বদেশের জয় বলে উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন, সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র স্বদেশের গৌরব কামনায় জগদীশচন্দ্রের সাধনার পথ সুগম করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন।

জগদীশচন্দ্র যেমন কোনোদিন তাঁর দেশমাতাকে ভোলেন নাই; তাঁর দেশও তেমনি কোনোদিন জগদীশচন্দ্রকে ভোলে নাই। তাঁর বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার সময়েও জগদীশচন্দ্র মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি দেশের বহু দেশপ্রেমী ধনীর কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়েছিলেন।

বসু বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই জগদীশচন্দ্র একটা অপূর্ব যন্ত্র তৈরি করিয়েছিলেন। এ যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছিল গাছের বৃদ্ধি মাপার জন্যে। জগদীশচন্দ্র এ প্রসঙ্গে বলেছেন:

"গাছ স্বভাবতঃ কতখানি করিয়া বাড়ে তাহা জানিতে হইলে অনেক সময় লাগে। শম্বুকের গতি হইতে গাছের বৃদ্ধিগতি ছয় সহস্রগুণ ক্ষীণ; এজন্য আমাকে এক নূতন কল আবিষ্কার করিতে হইয়াছে; তাহার নাম ক্রেস্কোগ্রাফ। তাহার দ্বারা বৃদ্ধিমাত্রা কোটি গুণ বাড়াইয়া লিপিবদ্ধ হয়।...বাড়ন্ত গাছ প্রতি সেকেণ্ডে কতটুকু বৃদ্ধি পায় তাহা পর্যন্ত এই কল লিখিয়া দেয়। ইহাতে জানা যায় যে, এই গাছটি এক মিনিটে এক ইঞ্চির লক্ষ-ভাগের ৪২ ভাগ করিয়া বাড়িয়াছিল। গাছটিকে তখন একখানা বেত দিয়া সামান্য রকমে আঘাত করিলাম। অমনি গাছের বৃদ্ধি একেবারে কমিয়া গেল। সে আঘাত ভুলিতে গাছের আধঘণ্টার

অধিক সময় লাগিয়াছিল। তাহার পর অতি সন্তর্পণে সে পুনরায় বাড়িতে লাগিল।"

বসু বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, এই ক্রেস্কোগ্রাফ যন্ত্র এবং আরও নানা রকম যন্ত্রের সাহায্যে জগদীশচন্দ্র গবেষণা চালাতে থাকলেন। সে সব গবেষণার ফলে বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে সব সত্য আবিষ্কৃত হল, বিশ্বের বিজ্ঞানী-মহলে সেগুলোকে সুপ্রতিষ্ঠ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ১৯১৯ সালে ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রকে তাঁর পঞ্চমবারের বৈজ্ঞানিক অভিযানে পাঠালেন। এই অভিযানে জগদীশচন্দ্র তাঁর ক্রেস্কোগ্রাফের অদ্ভুত শক্তি যে ভুয়ো নয় সেটা প্রমাণ করলেন। ১৯২০ সালে লর্ড র‍্যালে প্রমুখ বিলাতের বৈজ্ঞানিকরা টাইম্‌স পত্রে এই যন্ত্রের শক্তির যথার্থতা স্বীকার করলেন। এর পরেই জগদীশচন্দ্রকে বিলাতের রয়াল সোসাইটির সদস্য করে নেওয়া হয়। এই বিদ্বৎসভার সদস্যপদ বহুকাল থেকেই বিজ্ঞানীমাত্রেরই কাম্য হয়ে এসেছে। জগদীশচন্দ্রকে সদস্যপদ দিয়ে এই সোসাইটি তাঁর বৈজ্ঞানিক অবদানগুলোকে চূড়ান্তভাবে স্বীকার করে নিল।

জগদীশচন্দ্র শেষবার ইউরোপ যান ১৯২৮ সালে। সে-বার তিনি যে দেশেই গেলেন সেই দেশেই সমাদর পেলেন। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা তাঁকে সাদরে নিজেদের মধ্যে স্থান করে দিলেন, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা তাঁর আবিষ্কারের অসাধারণ গুরুত্ব বুঝে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন। ইউরোপের দুইজন শ্রেষ্ঠ লেখক—রোলাঁ এবং বার্নার্ড শ তাঁকে তাঁদের গ্রন্থ

উপহার দিয়ে সম্মানিত করলেন। রোলাঁ তাঁর 'জাঁ ক্রিস্তফ'-এর পাতায় লিখলেন—নূতন একটা পৃথিবীর আবিষ্কারককে এ গ্রন্থ উপহার দিলাম; বার্নার্ড শ তাঁর গ্রন্থাবলী উপহার দিলেন এই বলে: "পৃথিবীর নিকৃষ্ট শারীরবৃত্তবিদের কাছ থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শারীরবৃত্তবিদের কাছে।"

ঐ বছর দেশে ফেরার পর, জগদীশচন্দ্রকে তাঁর দেশবাসী তাঁর ৭০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিল। এ সম্বর্ধনায় অগ্রণী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাটি পাঠ করেন সেইটিই বর্তমান বইয়ের প্রথমে দেওয়া হয়েছে।

৭০ বছরের জন্মোৎসবের পরও জগদীশচন্দ্র নিরলসভাবে বসু বিজ্ঞানমন্দিরে কাজ করে চলছিলেন। দূর দূর দেশ থেকে ছাত্ররাও এসে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে গবেষণা করছিল। বার্ধক্যের জন্যে জগদীশচন্দ্রের কর্মশক্তি ক্রমশঃ কমে আসছিল, তাঁর মধ্যে অধ্যাত্মচিন্তা ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এ প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র তাঁর জীবন-দেবতার উদ্দেশে নিজের সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "জীবনের যখন পূর্ণশক্তি তখন কোলাহলের মধ্যে তোমার নির্দেশ স্পষ্ট করিয়া শুনিতে পাইতাম না। এখন পারিতেছি; কিন্তু সব শক্তি নির্জীব হইয়া আসিতেছে। একদিন তোমার হুকুমে মাঝখানের যবনিকা ছিন্ন হইবে, মৃত্তিকা দিয়া যাহা গড়িয়াছিলে তাহা ধূলি হইয়া পড়িয়া রহিবে! কি লইয়া তখন সে তোমার নিকট উপস্থিত হইবে? ··· তখন তোমার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত সে কেবল বলিবে—'আসামী হাজির'।"

জীবনের শেষ কয় বছর তাঁর শরীর প্রায়ই খারাপ যাচ্ছিল। আজীবন-সুহৃৎ নীলরতন সরকার মহাশয়ের যত্নে শরীরটা কোনো মতে ঠেকা দিয়ে রাখা হয়েছিল। শরীরের অবস্থা বুঝে তিনি এই সময় প্রায়ই গিরিডিতে গিয়ে থাকতেন। ১৯৩৭ সালের ২৩শে নভেম্বর তারিখে সেখানেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। নব ভারতের সর্বসাধনার মধ্যে জগদীশচন্দ্রের আত্মা সক্রিয় থাকুক।

উপসংহার

"তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ"—জগদীশচন্দ্রের জীবন তাঁর কীর্তির চেয়ে মহত্তর। তাঁর জীবনটাকে সমগ্রভাবে দেখলে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, তিনি ছিলেন যুগ-প্রকাশক, যুগন্ধর। সিপাই বিদ্রোহের সময় ভারতের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, অস্ত্রবলে বৈদেশিক সভ্যতাকে ঠেকানো যাবে না—তাকে স্বীকার করে নিয়ে, তার সার বস্তুটিকে আত্মস্থ করে নব বলে বলীয়ান হতে হবে, সেইটাই হবে জাতীয় মুক্তির পথ। ভারত-আত্মার এই নূতন সঙ্কল্প জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্রের মধ্যে বেশ স্পষ্টভাবে ফুটেছিল। জগদীশচন্দ্রের মধ্যে এই সঙ্কল্প তিনি সঞ্চার করে গিয়েছিলেন। অভিজাত শ্রেণীর মানুষ হয়েও পুত্রকে তিনি সর্বসাধারণের ছেলেদের পাঠশালায় দিয়েছিলেন, যাতে ছেলে নিজের অজানিতেই তার প্রথম জীবন থেকেই মাতৃভাষার মর্যাদা বোঝে, দেশের সত্যিকার নাড়ীর সঙ্গে তার যোগসূত্র খুঁজে পায়। নিজের সত্তাকে হারিয়ে ছেলে নতুন যুগের সভ্যতার সংস্পর্শে আসুক, ভগবানচন্দ্র এটা চাইতেন না; ভগবানচন্দ্র চেয়েছিলেন, জগদীশচন্দ্র ভারতীয়

থেকেই পাশ্চাত্য ভাবধারার সার গ্রহণ করুক। ও-দিকে, নিজে সর্বস্বান্ত হয়েও ভগবানচন্দ্র দেশে নব যুগোপযোগী কৃষি ও শিল্প-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। ছেলেকে যুগোপযোগী শিক্ষাদানে তিনি কোনো ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু ছেলে সিভিলিয়ান হয়ে নিজের স্বাজাত্য হারাবে—এ চিন্তা তাঁর কাছে অসহ্য হয়েছিল। এসব দেখেই বলা যায়, ভগবানচন্দ্রের কাছে জগদীশচন্দ্র স্বদেশের দাবি বুঝে নিয়েছিলেন। তাই দেখি, মাতৃভাষায় নিজের গবেষণার সমস্ত কথা বলতে না পারায় জগদীশচন্দ্র রীতিমত বেদনা বোধ করতেন। তাঁর বসু বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠার অন্যতম হেতুই ছিল—এ দেশে বৈজ্ঞানিক আদালত স্থাপন করা। এ কথা তিনি তাঁর 'অব্যক্ত' গ্রন্থের কথারম্ভে বলে গিয়েছেন।

জগদীশচন্দ্রের সমস্ত সাধনার পিছনে ছিল ভারতলক্ষ্মীর গৌরব বর্ধন করা। 'ভারতলক্ষ্মী' যে তাঁর কাছে একটা শব্দ-মাত্র ছিল না,—তাঁর ঐকান্তিক ধ্যানের ধনই ছিল—রবীন্দ্র-নাথকে লেখা তাঁর পত্রগুলো পড়লে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। ভারতকে তিনি পশ্চিমী চোখ নিয়ে দেখেন নি; দেখেছিলেন সম্পূর্ণ ভারতীয় চোখ নিয়ে। এটা বিশেষ লক্ষ্য করার জিনিস যে, জগদীশচন্দ্র ভারতের সমস্ত বড় বড় তীর্থে গিয়েছিলেন—সাধারণ হিন্দুযাত্রীর মন নিয়ে। কেদার-বদরীর পথে যাত্রীদের 'কেদার-বদরীর জয়' শুনে তাঁর অন্তরাত্মা উল্লসিত হয়েছে, তিনি দেখেছেন, অন্ধযাত্রী দুর্গম পার্বত্য পথে চলেছে নিঃশঙ্ক চিত্তে, লোকে তাকে হুঁশিয়ার হয়ে চলতে বলায়

সে অন্ধযাত্রী তক্ষনই উত্তর দিয়েছে, "তিনি আমার হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছেন, আমার আবার ভয় কিসের ?" জগদীশচন্দ্র তাঁর জীবনীকার গেডিস সায়েবের কাছে এসব স্মৃতিকথা বলতে বলতে মন্তব্য করেছিলেন, "এই সব অভিজ্ঞতা দিয়েই ভারত আমাকে তাঁর সন্তান করে রেখেছেন। সব কিছুর গভীরে তাঁর জীবন ও ঐক্যকে আমি অতি স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করতে পারি।" জগদীশচন্দ্র তাঁর সমস্ত জীবন ধরে ভারতকে জেনেছেন। রবীন্দ্রনাথকে এক পত্রে একবার লিখেছিলেন, "আমি এতদিনে আমাদের জাতীয় মহত্ত্ব বুঝিতে পারিতেছি। ··· বিদেশীয় নিন্দুকের কথায় চক্ষে আবরণ পড়িয়াছিল। এখন তাহা ছিন্ন হইয়াছে, এখন উন্মুক্ত চক্ষে যাহা প্রকৃত তাহাই দেখিতেছি। আমাকে যদি শতবার জন্মগ্রহণ করিতে হইত তাহা হইলে প্রত্যেকবার হিন্দুস্থানে জন্মগ্রহণ করিতাম।" লক্ষ্য করার বিষয় যে, জগদীশচন্দ্র কথাগুলো লিখেছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গ একজন বন্ধুকে ; জনসভায় হাততালির মধ্যে রাজনৈতিক নেতাদের মুখের ফাঁকা বুলির ফুলঝুরি এ নয়।

জগদীশচন্দ্র তাঁর আরাধ্যার মন্দিরে যাওয়ার জন্যে বেছে নিয়েছিলেন বিজ্ঞানের পথ ; বিজ্ঞানের সত্যকে অর্ঘ্য দিয়ে তিনি তাঁর বিধাতার অর্চনা করেছিলেন। সন্ন্যাসিনী নিবেদিতার স্নেহধন্য জগদীশচন্দ্র এই হিসাবে ছিলেন সত্যিকার সাধু। এই সাধু তাঁর অর্ঘ্য হিসাবে যে ফুল নিয়ে গিয়েছিলেন, সে ফুলগুলোও ছিল খাঁটি ভারতীয়ের চোখ নিয়ে বাছাই করা। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ এবং অভিনব দান হচ্ছে এই যে, জড়

উদ্ভিদ্ ও জীবের মধ্যে তিনি ঐক্য প্রমাণ করেছেন; ভারতের ঋষিরা যুগে যুগে যে-সত্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন, ভারতের জনসাধারণ যে-সত্যকে তাদের প্রতি কর্মে স্বীকার করে চলে, সেই ভারতআত্মার উপলব্ধ শ্রেষ্ঠ সত্যকে জগদীশচন্দ্র যুক্তিগ্রাহ্য করে প্রমাণ করেছেন।

ভারতীয় সন্ন্যাসের আদর্শেতে উদ্বুদ্ধ হয়ে জগদীশচন্দ্র নিজে উপলব্ধ ও প্রমাণিত সত্যকে নিঃসঙ্কোচে সর্বজনের নিকট উপস্থিত করেছিলেন; এ ব্যাপারে প্রচুর অর্থলাভের সম্ভাবনা তাঁর ছিল, কিন্তু সে সম্ভাবনাকে তিনি অকাতরে উপেক্ষা করেছিলেন। তাছাড়া, উপার্জনের এক-পঞ্চমাংশমাত্র জীবিকা নির্বাহের জন্য রাখতে হলেও, সাংসারিক অবস্থা খুব বেশী স্বচ্ছল না হলেও জগদীশচন্দ্র নিজের চাকরির উন্নতির ব্যাপারে চিরকাল একান্ত উদাসীনই ছিলেন; যদিও চাকরিতে ভারতীয়দের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে তিনিই চাকরিজীবনের প্রথম তিন বছর কোনো বেতনই নিতেন না; নিজ স্বার্থের সম্বন্ধে উদাসীন হলেও জগদীশচন্দ্র ভারতীয় স্বার্থ সম্পর্কে ছিলেন খুবই সজাগ। নিজের চাকরির উন্নতি হবে ভেবে কোনোদিন জগদীশচন্দ্র রাজশক্তির বা কর্তৃপক্ষের মন রেখে চলার কথা ভাবতেও পারেন নাই।

শিক্ষাদান ছিল জগদীশচন্দ্রের জীবিকার্জনের প্রধান উপায়, কিন্তু সন্ন্যাসী জগদীশচন্দ্রের চোখে শিক্ষকতা ছিল একটা 'ব্রত', কোনো পেশা নয়। এই কথাই তিনি পাব্লিক সার্ভিস কমিশানের সামনে স্পষ্টভাবে জানিয়ে এসেছিলেন। জগদীশচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করতেন, এ দেশে

তখনও বিজ্ঞান-চর্চা ঠিকমত শিকড় গাড়ে নাই। তিনি জানতেন, "প্রথম পরিচয়ের স্বাদ বিস্তার করিবার জন্য শিক্ষার প্রণালীকে সরল করা চাই"; তাঁর অধ্যাপনার মধ্যে এই প্রয়াস সুস্পষ্ট ছিল। তাঁর ছাত্রদের তিনি বিজ্ঞানের কূটতত্ত্বে পণ্ডিত করার চেষ্টা না করে তাদের উদ্ভাবনীশক্তি বিকাশ করার, তাদিকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত করার চেষ্টা করতেন।

কবির মন, প্রেমিকের মন না থাকলে প্রকৃতির কোনো গূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করা যায় কি না সন্দেহ, বহু শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর মধ্যে এই কবি-মনের অস্তিত্ব সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়। ডারউইন সায়েবের 'ওরিজিন অব স্পীসিজ' যাঁরা পড়েছেন তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন কি গভীর আত্মীয়তা দিয়ে তিনি তাঁর আলোচ্য বিষয়কে বুঝতে চেয়েছেন;—পড়তে পড়তে মনে হয়, বিজ্ঞানের বই পড়ছি না, পড়ছি কোনো কাব্য। জগদীশচন্দ্রের বাঙলা-ইংরেজী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলোতেও তাঁর এই কবি-মনের পরিচয় যত্রতত্র ছড়ানো আছে। 'অব্যক্ত'-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তাঁর রচিত 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' প্রবন্ধটি ঠিক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে ফেলা যায় কি না জানি না, কিন্তু এটার সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকে না যে সে-প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে কবিত্বের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। তাঁর খাঁটি বৈজ্ঞানিক কোনো প্রবন্ধেও কবিত্বের অভাব দেখা যায় না। সমগ্রভাবে দেখলে জগদীশচন্দ্রের মধ্যে যে গুণটি সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে সেটি হচ্ছে তাঁর নিষ্কাম কর্মসাধনা। ১৯০২ সালের এপ্রিলে প্যারি থেকে তিনি একখানি চিঠিতে লেখেন :

"হিন্দু চিরকাল আসক্তিহীন। 'আমি কেহই নয়, যিনি আমাকে চালাইতেছেন তিনিই সব।'

"তিনি বিশ্বকর্মা রূপে আমাদের হৃদয়মন পরাস্ত করিয়াছেন, আবার সখারূপে অতি সন্নিকটে। যিনি আমাদিগকে প্রেমপাশে বাঁধিয়াছেন তাঁহার চরণে প্রতিমুহূর্তে আত্মবলি দিতে হৃদয় উৎসুক। সুখের দিনে কিছু জানাইতে পারি না। কিন্তু দুঃখের দিনে একটু জানাইতে পারি। তিনি আমাদিগকে যেখানে রাখিয়াছেন, দাস সে-স্থানেই থাকিবে, সমস্ত কলঙ্ক বহন করিবে, সমস্ত নিষ্ফলতার মধ্যে সমস্ত চেষ্টা নিবেদন করিবে। আমাদের শক্তিই বা কি! কিন্তু কোটী কোটী ক্ষুদ্র প্রবালপঞ্জরে মহাদেশ গঠিত হইয়াছে, এই তো আমাদের একমাত্র আশা। যে মৃত্তিকাতে আমাদের শরীর গঠিত হইয়াছে সেই জন্মভূমির জন্য আমাদের দেহমন পর্যবসিত হয় ইহা ব্যতীত তো আর আমাদের করিবার নাই।"

এই একখানি চিঠিতেই জগদীশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ পরিচয় ধরা আছে। জগদীশচন্দ্রের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বাঙালী যেন আবার তাঁর অমর আত্মাকে নিজেদের অন্তরে ফিরে পায়— সেই কবিমনীষীকে, বিজ্ঞানমন্দিরের সেই ভক্ত সাধককে, এই দুর্ভাগা দেশের সেই বীর সন্তানকে, সেই কর্মযোগীকে, সত্যিকার সেই ঋষিকে যেন নিজেদের মধ্যে অনুভব করি, এই কামনা করেই আমরা জগদীশচন্দ্রের এই চরিত-আলোচনা এখানেই শেষ করলাম।

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু

প্রিয় করকমলেষু

বন্ধু,

যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু,
প্রাণের আনন্দ নিয়ে, শঙ্কা নিয়ে, দুঃখ নিয়ে, তরু
দেখা দিল দারুণ নির্জ্জনে। কত যুগ যুগান্তরে
কান পেতে ছিল স্তব্ধ মানুষের পদশব্দ তরে
নিবিড় গহন তলে। যবে এল মানব অতিথি,
দিল তারে ফুল ফল, বিস্তারিয়া দিল ছায়াবীথি।
প্রাণের আদিম ভাষা গূঢ় ছিল তাহার অন্তরে,
সম্পূর্ণ হয়নি ব্যক্ত আন্দোলনে, ইঙ্গিতে, মর্ম্মরে।
তার দিন রজনীর জীবযাত্রা বিশ্বধরাতলে
চলেছিল নানা পথে শব্দহীন নিত্য কোলাহলে
সীমাহীন ভবিষ্যতে; আলোকের আঘাতে তণুতে
প্রতিদিন উঠিয়াছে চঞ্চলিত অণুতে অণুতে
স্পন্দবেগে নিঃশব্দ ঝঙ্কারগীতি; নীরব স্তবনে
সূর্য্যের বন্দনাগান গাহিয়াছে প্রভাত পবনে।
প্রাণের প্রথম বাণী এই মতো জাগে চারিভিতে
তৃণে তৃণে বনে বনে, তবু তাহা রয়েছে নিভৃতে,—

কাছে থেকে শুনি নাই ;—হে তপস্বী, তুমি একমনা
নিঃশব্দেরে বাক্য দিলে ; অরণ্যের অন্তর বেদনা
শুনেছ একান্তে বসি' ; মূক জীবনের যে ক্রন্দন
ধরণীর মাতৃবক্ষে নিরন্তর জাগাল স্পন্দন
অঙ্কুরে অঙ্কুরে উঠি, প্রসারিয়া শত ব্যগ্রশাখা,
পত্রে পত্রে চঞ্চলিয়া, শিকড়ে শিকড়ে আঁকাবাকা
জন্মমরণের দ্বন্দ্বে, তাহার রহস্য তব কাছে
বিচিত্র অক্ষর রূপে সহসা প্রকাশ লভিয়াছে।
প্রাণের আগ্রহবার্ত্তা নির্ব্বাকের অন্তঃপুর হ'তে
অন্ধকার পার করি' আনি দিলে দৃষ্টির আলোতে।
তোমার প্রতিভাদীপ্ত চিত্তমাঝে কহে আজি কথা
—তরুর মর্ম্মের সাছে মানব মর্ম্মের আত্মীয়তা ;
প্রাচীন আদিমতম সম্বন্ধের দেয় পরিচয়।
—হে সাধক শ্রেষ্ঠ, তব দুঃসাধ্য সাধন লভে জয় ;—
সতর্ক দেবতা যেথা গুপ্তবাণী রেখেছেন ঢাকি'
সেথা তুমি দীপহস্তে অন্ধকারে পশিলে একাকী,
জাগ্রত করিলে তারে। দেবতা আপন পরাভবে
যেদিন প্রসন্ন হন, সে দিন উদার জয়রবে
ধ্বনিত অমরাবতী আনন্দে রচিয়া দেয় বেদী
বীর বিজয়ীর তরে, যশের পতাকা অভ্রভেদী
মর্ত্ত্যের চূড়ায় উড়ে।

মনে আছে একদা যেদিন
আসন প্রচ্ছন্ন তব, অশ্রদ্ধার অন্ধকারে লীন,

ঈর্ষা কণ্টকিত পথে চলেছিলে ব্যথিত চরণে,
ক্ষুদ্র শত্রুতার সাথে প্রতিক্ষণে অকারণ রণে
হয়েছ পীড়িত শ্রান্ত। সেই দুঃখই তোমার পাথেয়,
সে অগ্নি জ্বেলেছে যাত্রাদীপ, অবজ্ঞা দিয়েছে শ্রেয়,
পেয়েছ সম্বল তব আপনার গভীর অন্তরে।
তোমার খ্যাতির শঙ্খ আজি বাজে দিকে দিগন্তরে
সমুদ্রের একূলে ওকূলে; আপন দীপ্তিতে আজি
বন্ধু, তুমি দীপ্যমান; উচ্ছ্বসি উঠিছে বাজি
বিপুল কীর্ত্তির মন্ত্র তোমার আপন কর্ম্মমাঝে।
জ্যোতিষ্ক সভার তলে যেথা তব আসন বিরাজে
সেথায় সহস্র দীপ জ্বলে আজি দীপালি উৎসবে।
আমারো একটি দীপ তারি সাথে মিলাইনু যবে
চেয়ে দেখো তার পানে, এ দীপ বন্ধুর হাতে জ্বালা;
তোমার তপস্যাক্ষেত্র ছিল যবে নিভৃত নিরালা
বাধায় বেষ্টিত রুদ্ধ, সেদিন সংশয় সন্ধ্যাকালে
কবি-হাতে বরমাল্য সে বন্ধু পরায়েছিল ভালে;
অপেক্ষা করে নি সে তো জনতার সমর্থন তরে,
দুর্দ্দিনে জ্বেলেছে দীপ রিক্ত তব অর্ঘ্যথালি পরে।
আজি সহস্রের সাথে ঘোষিল সে, ধন্য ধন্য তুমি,
ধন্য তব বন্ধুজন, ধন্য তব পুণ্য জন্মভূমি।

শান্তিনিকেতন **শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**
১৪ই অগ্রহায়ণ
১৩৩৫

আচার্য জগদীশচন্দ্রের সপ্ততিপূর্তি-উৎসব-উপলক্ষে

বিজ্ঞানে সাহিত্য

॥ জগদীশচন্দ্র বসু ॥

জড় জগতে কেন্দ্র আশ্রয় করিয়া বহুবিধ গতি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রহগণ সূর্য্যের আকর্ষণ এড়াইতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল ধূমকেতুকেও একদিন সূর্য্যের দিকে ছুটিতে হয়।

জড় জগৎ ছাড়িয়া জঙ্গম জগতে দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদের গতিবিধি বড় অনিয়মিত বলিয়া মনে হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ছাড়াও অসংখ্য শক্তি তাহাদিগকে সর্ব্বদা সন্তাড়িত করিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহারা আহত হইতেছে এবং সেই আঘাতের গুণ ও পরিমাণ অনুসারে প্রত্যুত্তরে তাহারা হাসিতেছে কিম্বা কাঁদিতেছে। মৃদুস্পর্শ ও মৃদু আঘাত; ইহার প্রত্যুত্তরে শারীরিক রোমাঞ্চ, উৎফুল্ল ভাব ও নিকটে আসিবার ইচ্ছা। কিন্তু আঘাতের মাত্রা বাড়াইলে অন্য রকমে তাহার উত্তর পাওয়া যায়। হাত বুলাইবার পরিবর্ত্তে যেখানে লগুড়াঘাত, সেখানে রোমঞ্চ ও উৎফুল্লতার পরিবর্ত্তে সন্ত্রাস ও পূর্ণমাত্রায় সঙ্কোচ। আকর্ষণের পরিবর্ত্তে বিকর্ষণ—সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখ—হাসির পরিবর্ত্তে কান্না।

জীবের গতিবিধি কেবলমাত্র বাহিরের আঘাতের দ্বারা পরিমিত হয় না। ভিতর হইতে নানাবিধ আবেগ আসিয়া বাহিরের গতিকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে। সেই ভিতরের আবেগ কতকটা অভ্যাস, কতকটা

স্বেচ্ছাকৃত। এইরূপ বহুবিধ ভিতর ও বাহিরের আঘাত-আবেগের দ্বারা চালিত মানুষের গতি কে নিরূপণ করিতে পারে? কিন্তু মাধ্যাকর্ষণশক্তি কেহ এড়াইতে পারে না। সেই অদৃশ্য শক্তিবলে বহু বৎসর পরে আজ আমি আমার জন্মস্থানে উপনীত হইয়াছি। জন্মলাভ সূত্রে জন্মস্থানের যে একটা আকর্ষণ আছে তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু আজ এই যে সভার সভাপতির আসনে আমি স্থান লইয়াছি তাহার যুক্তি একেবারে স্বতঃসিদ্ধ নহে। প্রশ্ন হইতে পারে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে কি বিজ্ঞানসেবকের স্থান আছে? এই সাহিত্য-সম্মিলন বাঙ্গালীর মনের এক ঘণীভূত চেতনাকে বাংলাদেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমায় বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছে এবং সফলতার চেষ্টাকে সর্ব্বত্র গভীরভাবে জাগাইয়া তুলিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, এই সম্মিলনের মধ্যে বাঙ্গালীর যে ইচ্ছা আকার ধারণ করিয়া উঠিতেছে তাহার মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণতা নাই। এখানে সাহিত্যকে কোন ক্ষুদ্র কোঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয় নাই, বরং মনে হয়, আমরা উহাকে বড় করিয়া উপলব্ধি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আজ আমাদের পক্ষে সাহিত্য কোন সুন্দর অলঙ্কার মাত্র নহে—আজ আমরা আমাদের চিত্তের সমস্ত সাধনাকে সাহিত্যের নামে এক করিয়া দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি।

এই সাহিত্য-সম্মিলন-যজ্ঞে যাহাদিগকে পুরোহিতপদে বরণ করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিককেও দেখিয়াছি। আমি যাঁহাকে সুহৃদ ও সহযোগী বলিয়া স্নেহ করি এবং স্বদেশীয় বলিয়া গৌরব করিয়া থাকি, সেই আমাদের দেশমান্য আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র একদিন এই সম্মিলন-সভার প্রধান আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তাঁহাকে সমাদর করিয়া সাহিত্য-সম্মিলন যে কেবল গুণের পূজা করিয়াছেন তাহা নহে, সাহিত্যের একটি উদার মূর্ত্তি দেশের সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য দেশে জ্ঞানরাজ্যে এখন ভেদবুদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন হইয়াছে।

সেখানে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখাপ্রশাখা নিজেকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্যই বিশেষ আয়োজন করিয়াছে ; তাহার ফলে নিজেকে এক করিয়া জানিবার চেষ্টা এখন লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। জ্ঞান-সাধনার প্রথমাবস্থায় এইরূপ জাতি-ভেদ প্রথায় উপকার করে, তাহাতে উপকরণ সংগ্রহ করা এবং তাহাকে সজ্জিত করিবার সুবিধা হয় ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যদি কেবল এই প্রথাকেই অনুসরণ করি তাহা হইলে সত্যের পূর্ণমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করা ঘটিয়া উঠে না ; কেবল সাধনাই চলিতে থাকে, সিদ্ধির দর্শন পাই না।

অপর দিকে বহুর মধ্যে এক যাহাতে হারাইয়া না যায়, ভারতবর্ষ সেইদিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রখিয়াছে। সেই চিরকালের সাধনার ফলে আমরা সহজেই এক-কে দেখিতে পাই, আমাদের মনে সে সম্বন্ধে কোন প্রবল বাধা ঘটে না।

আমি অনুভব করিতেছি, আমাদের সাহিত্য-সম্মিলনের ব্যাপারে স্বভাবতঃই এই ঐক্যবোধ কাজ করিয়াছে। আমরা এই সম্মিলনের প্রথম হইতেই সাহিত্যের সীমা নির্ণয় করিয়া তাহার অধিকারের দ্বার সঙ্কীর্ণ করিতে মনেও করি নাই। পরন্তু আমরা তাহার অধিকারকে সহজেই প্রসারিত করিয়া দিবার দিকেই চলিয়াছি।

ফলতঃ জ্ঞান অন্বেষণে আমরা অজ্ঞাতসারে এক সর্ব্বব্যাপী একতার দিকে অগ্রসর হইতেছি। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিজেদের এক বৃহৎ পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। আমরা কি চাহিতেছি, কি ভাবিতেছি, কি পরীক্ষা করিতেছি, তাহা একস্থানে দেখিলে আপনাকে প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইব। সেইজন্য আমাদের দেশে আজ যে-কেহ গান করিতেছে, ধ্যান করিতেছে, অন্বেষণ করিতেছে, তাঁহাদের সকলকেই এই সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত করিবার আহ্বান প্রেরিত হইয়াছে।

এই কারণে, যদিও জীবনের অধিকাংশ কাল আমি বিজ্ঞানের অনুশীলনে যাপন করিয়াছি, তথাপি সাহিত্য-সম্মিলন-সভার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে

দ্বিধা বোধ করি নাই। কারণ আমি যাহা খুঁজিয়াছি, দেখিয়াছি, লাভ করিয়াছি, তাহাকে দেশের অন্যান্য নানা লাভের সঙ্গে সাজাইয়া ধরিবার অপেক্ষা আর কি সুখ হইতে পারে? আর এই সুযোগে আজ আমাদের দেশের সমস্ত সত্য-সাধকদের সহিত এক সভায় মিলিত হইবার অধিকার যদি লাভ করিয়া থাকি তবে তাহা অপেক্ষা আনন্দ আমার আর কি হইতে পারে?

কবিতা ও বিজ্ঞান

কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্ত্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানব-ভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।

এই যে প্রকৃতির রহস্য-নিকেতন, ইহার নানা মহল, ইহার দ্বার অসংখ্য। প্রকৃতি-বিজ্ঞানবিৎ, রাসায়নিক, জীবতত্ত্ববিৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়া এক এক মহলে প্রবেশ করিয়াছেন; মনে করিয়াছেন সেই সেই মহলই বুঝি তাঁহার বিশেষ স্থান, অন্য মহলে বুঝি তাঁহার গতিবিধি নাই। তাই জড়কে, উদ্ভিদকে, সচেতনকে তাঁহারা অলঙ্ঘ্যভাবে বিভক্ত করিয়াছেন।

কিন্তু এই বিভাগকে দেখাই যে বৈজ্ঞানিক দেখা, একথা আমি স্বীকার করি না। কক্ষে কক্ষে সুবিধার জন্য যত দেয়াল তোলাই যাক্ না, সকল মহলেরই এক অধিষ্ঠাতা। সকল বিজ্ঞানই পরিশেষে এই সত্যকে আবিষ্কার করিবে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছে। সকল পথই যেখানে একত্র মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। সত্য খণ্ড খণ্ড হইয়া আপনার মধ্যে অসংখ্য বিরোধ ঘটাইয়া অবস্থিত নহে। সেইজন্য প্রতিদিনই দেখিতে পাই জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রকৃতিতত্ত্ব, আপন আপন সীমা হারাইয়া ফেলিতেছে।

বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্ব্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্ব্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসম্বরণ করা তাহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে ত প্রমাণ বাহির করিতে পারে না! এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাঁহাকে 'যেন' যোগ করিয়া দিতে হয়।

বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্ব্বদা আত্মসম্বরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্ব্বদা তাঁহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোন মতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।

ইহার পুরস্কার এই যে, তিনি যেটুকু পান তাহার চেয়ে কিছুমাত্র বেশী দাবী করিতে পারেন না বটে, কিন্তু সেটুকু তিনি নিশ্চিতরূপেই পান এবং ভাবী পাওয়ার সম্ভাবনাকে তিনি কখনও কোন অংশে দুর্ব্বল করিয়া রাখেন না।

কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই

অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন। এমন বিস্ময়ের রাজ্যের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইতেছেন যেখানে অদৃশ্য আলোকরশ্মির পথের সম্মুখে স্থূল পদার্থের বাধা একেবারেই শূন্য হইয়া যাইতেছে এবং যেখানে বস্তু ও শক্তি এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ হঠাৎ চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইয়া এক অচিন্ত্যনীয় রাজ্যের দৃশ্য যখন বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করে তখন মুহূর্ত্তের জন্য তিনিও আপনার স্বাভাবিক আত্মসম্বরণ করিতে বিস্মৃত হন এবং বলিয়া উঠেন 'যেন নহে—এই সেই'।

অদৃশ্য আলোক

কবিতা ও বিজ্ঞানের কি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহার উদাহরণ স্বরূপ আপনাদিগকে এক অত্যাশ্চর্য্য অদৃশ্য জগতে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিব। সেই অসীম রহস্যপূর্ণ জগতের এক ক্ষুদ্র কোণে আমি যাহা কতক স্পষ্ট কতক অস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিয়াছি, কেবলমাত্র তাহার সম্বন্ধেই দুই একটি কথা বলিব। কবির চক্ষু এই বহু রঙে রঞ্জিত আলোক-সমুদ্র দেখিয়াও অতৃপ্ত রহিয়াছে। এই সাতটি রং তাহার চক্ষুর তৃষ্ণা মিটাইতে পারে নাই। তবে কি এই দৃশ্য-আলোকের সীমা পার হইয়াও অসীম আলোকপুঞ্জ প্রসারিত রহিয়াছে?

এইরূপ অচিন্ত্যনীয় অদৃশ্য আলোকের রহস্য যে আছে তাহার পথ জার্ম্মাণীর অধ্যাপক হার্টজ প্রথম দেখাইয়া দেন। তড়িৎ-উর্ম্মিসঞ্জাত সেই অদৃশ্য আলোকের প্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি তত্ত্ব প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারে আলোচিত হইয়াছে। সময় থাকিলে দেখাইতে পারিতাম, কিরূপে অস্বচ্ছ বস্তুর আভ্যন্তরিক আণবিক সন্নিবেশ এই অদৃশ্য আলোকের দ্বারা ধরা যাইতে পারে। আপনারা আরও দেখিতেন, বস্তুর স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতা সম্বন্ধে অনেক ধারণাই ভুল। যাহা অস্বচ্ছ মনে করি তাহার ভিতর দিয়া আলো অবাধে যাইতেছে। আবার এমন অদ্ভুত বস্তুও আছে

যাহা একদিক ধরিয়া দেখিলে স্বচ্ছ, অন্য দিক ধরিয়া দেখিলে অস্বচ্ছ। আরও দেখিতে পাইতেন যে, দৃশ্য আলোক যেরূপ বহুমূল্য কাচ-বর্ত্তুল দ্বারা দূরে অক্ষীণভাবে প্রেরণ করা যাইতে পারে সেইরূপ মৃৎবর্ত্তুল সাহায্যে অদৃশ্য আলোকপুঞ্জও বহু দূরে প্রেরিত হয়। ফলতঃ দৃশ্য-আলোক সংহত করিবার জন্য হীরকখণ্ডের যেরূপ ক্ষমতা, অদৃশ্য আলোক সংহত করিবার জন্য মৃৎপিণ্ডের ক্ষমতা তাহা অপেক্ষাও অধিক।

আকাশ-সংগীতের অসংখ্য সুরসপ্তকের মধ্যে একটি সপ্তকমাত্র আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করে। সেই ক্ষুদ্র গণ্ডীটিই আমাদের দৃশ্য-রাজ্য। অসীম জ্যোতিরাশির মধ্যে আমরা অন্ধবৎ ঘুরিতেছি। অসহ্য এই মানুষের অপূর্ণতা। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মানুষের মন একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই; সে অদম্য উৎসাহে নিজের অপূর্ণতার ভেলায় অজানা সমুদ্র পার হইয়া নূতন দেশের সন্ধানে ছুটিয়াছে।

বৃক্ষজীবনের ইতিহাস

দৃশ্য আলোকের বাহিরে অদৃশ্য আলোক আছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলে আমাদের দৃষ্টি যেমন অনন্তের মধ্যে প্রসারিত হয়, তেমনি চেতন রাজ্যের বাহিরে যে বাক্যহীন বেদনা আছে তাহাকে বোধগম্য করিলে আমাদের অনুভূতি আপনার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিয়া দেখিতে পায়। সেই জন্য রুদ্রজ্যোতির রহস্যালোক হইতে এখন শ্যামল উদ্ভিদরাজ্যের গভীরতম নীরবতার মধ্যে আপনাদিগকে আহ্বান করিব।

প্রতিদিন এই যে অতি বৃহৎ উদ্ভিদ-জগৎ আমাদের চক্ষুর সম্মুখে প্রসারিত, ইহাদের জীবনের সহিত কি আমাদের জীবনের কোন সম্বন্ধ আছে? উদ্ভিদ-তত্ত্ব সম্বন্ধে অগ্রগণ্য পণ্ডিতেরা ইহাদের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা স্বীকার করিতে চান না। বিখ্যাত বার্ডন সেণ্ডারসন বলেন যে, কেবল দুই চারি প্রকারের গাছ ছাড়া সাধারণ বৃক্ষ বাহিরের আঘাতে দৃশ্য-

ভাবে কিম্বা বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্যের দ্বারা সাড়া দেয় না। আর লাজুক জাতীয় গাছ যদিও বৈদ্যুতিক সাড়া দেয় তবু সেই সাড়া জন্তুর সাড়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ফেফর প্রমুখ উদ্ভিদ-শাস্ত্রের অগ্রণী পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিয়াছেন যে, বৃক্ষ স্নায়ুহীন। আমাদের স্নায়ুসূত্র যেরূপ বাহিরের বার্ত্তা বহন করিয়া আনে, উদ্ভিদে এইরূপ কোন সূত্র নাই।

ইহা হইতে মনে হয়, পাশাপাশি যে প্রাণী ও উদ্ভিদ-জীবন প্রবাহিত হইতে দেখিতেছি তাহা বিভিন্ন নিয়মে পরিচালিত। উদ্ভিদ-জীবনে বিবিধ সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ—সেই দুরূহতা ভেদ করিবার জন্য অতি সূক্ষ্মদর্শী কোন কল এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রধানতঃ এজন্যই প্রত্যক্ষ পরীক্ষার পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে মনগড়া মতের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

কিন্তু প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে আমাদিগকে মতবাদ ছাড়িয়া পরীক্ষার প্রতক্ষ্য ফল পাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। নিজের কল্পনাকে ছাড়িয়া বৃক্ষকেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এবং কেবলমাত্র বৃক্ষের স্বহস্ত-লিখিত বিবরণই সাক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

বৃক্ষের দৈনন্দিন ইতিহাস

বৃক্ষের আভ্যন্তরিক পরিবর্ত্তন আমরা কি করিয়া জানিব? যদি কোন অবস্থাগুণে বৃক্ষ উত্তেজিত হয় বা অন্য কোন কারণে বৃক্ষের অবসাদ উপস্থিত হয় তবে এই সব ভিতরের অদৃশ্য পরিবর্ত্তন আমরা বাহির হইতে কি করিয়া বুঝিব? তাহার একমাত্র উপায়—সকল প্রকার আঘাতে গাছ যে সাড়া দেয় কোন প্রকারে তাহা ধরিতে ও মাপিতে পারা।

জীব যখন কোন বাহিরের শক্তি দ্বারা আহত হয় তখন সে নানারূপে তাহার সাড়া দিয়া থাকে—যদি কণ্ঠ থাকে তবে চীৎকার করিয়া, যদি মূক হয় তবে হাত পা নাড়িয়া। বাহিরের ধাক্কা কিম্বা 'নাড়ার' উত্তরে 'সাড়া'। নাড়ার পরিমাণ অনুসারে সাড়ার পরিমাণ মিলাইয়া দেখিলে আমরা জীবনের

পরিমাণ মাপিয়া লইতে পারি। উত্তেজিত অবস্থায় অল্প নাড়ায় প্রকাণ্ড সাড়া পাওয়া যায়। অবসন্ন অবস্থায় অধিক নাড়ায় ক্ষীণ সাড়া। আর যখন মৃত্যু আসিয়া জীবকে পরাভূত করে তখন হঠাৎ সর্ব্বপ্রকারের সাড়ার অবসান হয়।

সুতরাং বৃক্ষের আভ্যন্তরিক অবস্থা ধরা যাইতে পারিত, যদি বৃক্ষকে দিয়া তাহার সাড়াগুলি কোন প্ররোচনায় কাগজ কলমে লিপিবদ্ধ করাইয়া লইতে পারিতাম। সেই আপাততঃ অসম্ভব কার্য্যে কোন উপায়ে যদি সফল হইতে পারি তাহার পরে সেই নূতন লিপি এবং নূতন ভাষা আমাদিগকে শিখিয়া লইতে হইবে। নানান দেশের নানান ভাষা, সে ভাষা লিখিবার অক্ষরও নানাবিধ, তার মধ্যে আবার এক নূতন লিপি প্রচার করা যে একান্ত শোচনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এক-লিপি সভার সভ্যগণ ইহাতে ক্ষুণ্ন হইবেন, কিন্তু এই সম্বন্ধে অন্য উপায় নাই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, গাছের লেখা কতকটা দেবনাগরীর মত— অশিক্ষিত কিম্বা অর্দ্ধশিক্ষিতের পক্ষে একান্ত দুর্বোধ্য।

সে যাহা হউক, মানস সিদ্ধির পক্ষে দুইটি প্রতিবন্ধক—প্রথমতঃ গাছকে নিজের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে সম্মত করান, দ্বিতীয়তঃ গাছ ও ফলের সাহায্যে তাহার সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা। শিশুকে দিয়া আজ্ঞাপালন অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু গাছের নিকট হইতে উত্তর আদায় করা অতি কঠিন সমস্যা। প্রথম প্রথম এই চেষ্টা অসম্ভব বলিয়াই মনে হইত। তবে বহু বৎসরের ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন তাহাদের প্রকৃতি অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছি। এই উপলক্ষে আজ আমি সহৃদয় সভ্যসমাজের নিকট স্বীকার করিতেছি, নিরীহ গাছপালার নিকট হইতে বলপূর্ব্বক সাক্ষ্য আদায় করিবার জন্য তাহাদের প্রতি অনেক নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছি। এই জন্য বিচিত্র প্রকারের চিম্‌টি উদ্ভাবন করিয়াছি—সোজাসুজি অথবা ঘূর্ণায়মান। সূচ দিয়া বিদ্ধ করিয়াছি এবং এসিড দিয়া পোড়াইয়াছি। সে সব কথা অধিক বলিব

না। তবে আজ জানি যে, এই প্রকার জবরদস্তি দ্বারা যে সাক্ষ্য আদায় করা যায় তাহার কোন মূল্য নাই। ন্যায়পরায়ণ বিচারক এই সাক্ষ্যকে কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ করিতে পারেন।

যদি গাছ্ লেখনী-যন্ত্রের সাহায্যে তাহার বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিত তাহা হইলে বৃক্ষের প্রকৃত ইতিহাস সমুদ্ধার করা যাইতে পারিত। কিন্তু এই কথা ত দিবা-স্বপ্ন মাত্র। এইরূপ কল্পনা আমাদের জীবনের নিশ্চেষ্ট অবস্থাকে কিঞ্চিত ভাবাবিষ্ট করে মাত্র। ভাবুকতার তৃপ্তি সহজসাধ্য; কিন্তু অহিফেনের ন্যায় ইহা ক্রমে ক্রমে মর্ম্মগ্রন্থি শিথিল করে।

যখন স্বপ্নরাজ্য হইতে উঠিয়া কল্পনাকে কর্ম্মে পরিণত করিতে চাই তখনই সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রাচীর দেখিতে পাই। প্রকৃতিদেবীর মন্দির লৌহ-অর্গলিত। সেই দ্বার ভেদ করিয়া শিশুর আব্দার এবং ক্রন্দন-ধ্বনি ভিতরে পৌঁছে না; কিন্তু যখন বহুকালের একাগ্রতা—সঞ্চিত শক্তিবলে রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া যায় তখনই প্রকৃতিদেবী সাধকের নিকট আবির্ভূত হন।

ভারতে অনুসন্ধানের বাধা

সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণ-বিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব। একথা যদিও অনেক পরিমাণে সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইত তাহা হইলে অন্য দেশে, যেখানে পরীক্ষাগার নির্ম্মাণে কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে, সে-স্থান হইতে প্রতিদিন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শোনা যাইতেছে না। আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য, কিন্তু পরের ঐশ্বর্য্যে আমাদের ঈর্ষা করিয়া কি লাভ? অবসাদ ঘুচাও। দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর। মনে কর, আমরা যে অবস্থাতে পড়ি না কেন সে-ই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা।

ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, এখানেই আমাদের কর্ত্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরুষ হারাইয়াছে সে-ই বৃথা পরিতাপ করে।

পরীক্ষাসাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিঘ্ন আছে। আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে, প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তরদৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে, তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্য্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না; দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্ম্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়-পদ্ম।

গাছের লেখা

বৃক্ষের বিবিধ সাড়া লিপিবদ্ধ করিবার বিবিধ সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণের আবশ্যকতার কথা বলিতেছিলাম। দশ বৎসর আগে যাহা কল্পনা মাত্র ছিল তাহা এই কয় বৎসরের চেষ্টার পর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। সার্থকতার পূর্ব্বে কত প্রযত্ন যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা এখন বলিয়া লাভ নাই এবং এই বিভিন্ন কলগুলির গঠনপ্রণালী বর্ণনা করিয়াও আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। তবে ইহা বলা আবশ্যক যে, এই বিবিধ কলের সাহায্যে বৃক্ষের বহুবিধ সাড়া লিখিত হইবে; বৃক্ষের বৃদ্ধি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে

নির্ণীত হইবে, তাহার স্বতঃস্পন্দন লিপিবদ্ধ হইবে এবং জীবন ও মৃত্যুরেখা তাহার আয়ু পরিমিত করিবে। এই কলের আশ্চর্য্য শক্তি সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহার সাহায্যে সময় গণনা এত সূক্ষ্ম হইবে যে, এক সেকেণ্ডের সহস্র ভাগের একভাগ অনায়াসে নির্ণীত হইবে। আর এক কথা শুনিয়া আপনারা প্রীত হইবেন। যে কলের নির্ম্মাণ অন্যান্য সৌভাগ্যবান দেশেও অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে, সেই কল এদেশে আমাদের কারিকর দ্বারাই নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মনন ও গঠন সম্পূর্ণ এ দেশীয়।

এইরূপ বহু পরীক্ষার পর বৃক্ষজীবন ও মানবীয় জীবন যে একই নিয়মে পরিচালিত তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।

প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে কোন প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম "বৃক্ষজীবন যেন মানবজীবনেরই ছায়া"। কিছু না জানিয়াই লিখিয়াছিলাম। স্বীকার করিতে হয়, সেটা যৌবনসুলভ অতি সাহস এবং কথার উত্তেজনা মাত্র। আজ সেই লুপ্ত স্মৃতি শব্দায়মান হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং স্বপ্ন ও জাগরণ আজ একত্র আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

উপসংহার

আমি সম্মিলন-সভায় কি দেখিলাম, উপসংহার কালে আপনাদিগের নিকট সেই কথা বলিব।

বহুদিন পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে একবার গুহামন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে এক গুহার অর্দ্ধ অন্ধকারে বিশ্বকর্ম্মার মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত দেখিলাম। সেখানে বিবিধ কারুকর তাহাদের আপন আপন কাজ করিবার নানা যন্ত্র দেবমূর্ত্তির পদতলে রাখিয়া পূজা করিতেছে।

তাহাই দেখিতে দেখিতে ক্রমে আমি বুঝিতে পারিলাম, আমাদের এই বাহুই বিশ্বকর্ম্মার আয়ুধ। এই আয়ুধ চালনা করিয়া তিনি পৃথিবীর

মৃৎপিণ্ডকে নানাপ্রকারে বৈচিত্র্যশালী করিয়া তুলিতেছেন। সেই মহাশিল্পীর আবির্ভাবের ফলেই আমাদের জড়দেহ চেতনাময় ও সৃজনশীল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আবির্ভাবের ফলেই আমরা মন ও হস্তের দ্বারা সেই শিল্পীর নানা অভিপ্রায়কে নানা রূপের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে শিখিয়াছি ; কখন শিল্পকলায়, কখন সাহিত্যে, কখন বিজ্ঞানে।

গুহামন্দিরে যে ছবিটি দেখিয়াছিলাম এখানে সভাস্থলে তাহাই আজ সজীবরূপে দেখিলাম। দেখিলাম আমাদের দেশের বিশ্বকর্ম্মা বাঙ্গালী চিত্তের মধ্যে যে কাজ করিতেছেন তাহার সেই কাজের নানা উপকরণ। কোথাও বা তাহা কবিকল্পনা, কোথাও যুক্তিবিচার, কোথাও তথ্যসংগ্রহ। আমরা সেই সমস্ত উপকরণ তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত করিয়া এখানে তাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছি।

মানবশক্তির মধ্যে এই দৈবশক্তির আবির্ভাব, ইহা আমাদের দেশের চিরকালেয় সংস্কার। দৈবশক্তির বলেই জগতে সৃজন ও সংহার হইতেছে। মানুষে দৈবশক্তির আবির্ভাব যদি সম্ভব হয়, তবে মানুষ সৃজন করিতেও পারে এবং সংহার করিতেও পারে। আমাদের মধ্যে যে জড়তা, যে ক্ষুদ্রতা, যে ব্যর্থতা আছে তাহাকে সংহার করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে। এ সমস্ত দুর্ব্বলতার বাধা আমাদের পক্ষে কখনই চিরসত্য নহে। যাহারা অমরত্বের অধিকারী তাহারা ক্ষুদ্র হইয়া থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই।

সৃজন করিবার শক্তিও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান। আমাদের যে জাতীয় মহত্ত্ব লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে তাহা এখনও আমাদের অন্তরের সেই সৃজনীশক্তির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ইচ্ছাকে জাগ্রত করিয়া তাহাকে পুনরায় সৃজন করিয়া তোলা আমাদের শক্তির মধ্যেই রহিয়াছে। আমাদের দেশের যে মহিমা একদিন অভ্রভেদ করিয়া উঠিয়াছিল তাহার উত্থানবেগ একেবারে পরিসমাপ্ত হয় নাই, পুনরায় একদিন তাহা আকাশ স্পর্শ করিবেই করিবে।

সেই আমাদের সৃজনশক্তিরই একটি চেষ্টা বাঙ্গলা সাহিত্য-পরিষদে আজ সফল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই পরিষদকে আমরা কেবলমাত্র একটি সভাস্থল বলিয়া গণ্য করিতে পারি না; ইহার ভিত্তি কলিকাতার কোন বিশেষ পথপার্শ্বে স্থাপিত হয় নাই এবং ইহার অট্টালিকা ইষ্টক দিয়া গ্রথিত নহে। আন্তর-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখিতে পাইব, সাহিত্য-পরিষদ সাধকদের সম্মুখে দেব-মন্দিররূপেই বিরাজমান। ইহার ভিত্তি সমস্ত বাঙ্গলা দেশের মর্ম্মস্থলে স্থাপিত এবং ইহার অট্টালিকা আমাদের জীবনস্তর দিয়া রচিত হইতেছে। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের সর্ব্বপ্রকার অশুচি আবরণ যেন আমরা বাহিরে পরিহার করিয়া আসি এবং আমাদের হৃদয়-উদ্যানের পবিত্রতম ফুল ও ফলগুলিকে যেন পূজার উপহার স্বরূপ দেবচরণে নিবেদন করিতে পারি।

[বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর ময়মনসিংহ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ]

নিবেদন

॥ জগদীশচন্দ্র বসু ॥

বাইশ বৎসর পূর্ব্বে যে স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহাতে সেদিন দেবতার করুণা জীবনে বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছিলাম। সে দিন যে মানস করিয়াছিমাম তাহা এতদিন পরে দেবচরণে নিবেদন করিতেছি। আজ যাহা প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা মন্দির, কেবলমাত্র পরীক্ষাগার নহে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্য পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়; কিন্তু ইন্দ্রিয়েরও অতীত দুই একটি মহাসত্য আছে, তাহা লাভ করিতে হইলে কেবলমাত্র বিশ্বাস আশ্রয় করিতে হয়।

বৈজ্ঞানিক সত্য পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়। তাহার জন্যও অনেক সাধনার আবশ্যক। যাহা কল্পনার রাজ্য ছিল তাহা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে হয়। যে আলো চক্ষুর অদৃশ্য ছিল তাহাকে চক্ষুগ্রাহ্য করা আবশ্যক। শরীর-নির্ম্মিত ইন্দ্রিয় যখন পরাস্ত হয় তখন ধাতুনির্ম্মিত অতীন্দ্রিয়ের শরণাপন্ন হই। যে জগৎ কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে অশব্দ ও অন্ধকারময় ছিল এখন তাহার গভীর নির্ঘোষ ও দুঃসহ আলোকরাশিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি।

এই সকল একেবারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও মনুষ্য-নির্ম্মিত কৃত্রিম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যাইতে পারে; কিন্তু আরও অনেক ঘটনা

আছে যাহা সেই ইন্দ্রিয়েরও অগোচর, তাহা কেবল বিশ্বাসবলেই লাভ করা যায়। বিশ্বাসের সত্যতা সম্বন্ধেও পরীক্ষা আছে ; তাহা দুই একটি ঘটনার দ্বারা হয় না, তাহার প্রকৃত পরীক্ষা করিতে সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনার আবশ্যক। সেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই মন্দির উত্থিত হইয়া থাকে।

কি সেই মহাসত্য যাহার জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল? তাহা এই যে, মানুষ যখন তাহার জীবন ও আরাধনা কোন উদ্দেশ্যে নিবেদন করে, সেই উদ্দেশ্য কখনও বিফল হয় না ; তখন অসম্ভবও সম্ভব হইয়া থাকে। সাধারণের সাধুবাদ শ্রবণ আজ আমার উদ্দেশ্য নহে ; কিন্তু যাঁহারা কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন এবং প্রতিকূল তরঙ্গাঘাতে মৃতকল্প হইয়া অদৃষ্টের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমার কথা বিশেষভাবে কেবল তাঁহাদেরই জন্য।

পরীক্ষা

যে পরীক্ষার কথা বলিব তাহা শেষ করিতে দুইটি জীবন লাগিয়াছে। যেমন একটি ক্ষুদ্র লতিকার পরীক্ষায় সমস্ত উদ্ভিদজীবনের প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হয়, সেইরূপ একটি মনুষ্যজীবনের বিশ্বাসের ফল দ্বারা বিশ্বাস-রাজ্যের সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্যই স্বীয় জীবনে পরীক্ষিত সত্য সম্বন্ধে যে দুই একটি কথা বলিব তাহা ব্যক্তিগত কথা ভুলিয়া সাধারণভাবে গ্রহণ করিবেন। পরীক্ষার আরম্ভ পিতৃদেব স্বর্গীয় ভগবানচন্দ্র বসুকে লইয়া,—তাহা অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের কথা। তাঁহারই নিকট আমার শিক্ষা ও দীক্ষা। তিনি শিখাইয়াছিলেন, অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন শাসন বহুগুণে শ্রেয়স্কর। জনহিতকর নানা কার্য্যে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে তিনি তাঁহার সকল চেষ্টা ও সর্ব্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছিন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছিল। সুখসম্পদের কোমল শয্যা হইতে তাঁহাকে

দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সকলেই বলিত, তিনি তাঁহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছেন। এই ঘটনা হইতেই সফলতা কত ক্ষুদ্র এবং কোন কোন বিফলতা কত বৃহৎ, তাহা শিখিতে পারিয়াছিলাম। পরীক্ষার প্রথম অধ্যায় এই সময় লিখিত হইয়াছিল।

তাহার পর বত্রিশ বৎসর হইল শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করিয়াছি। বিজ্ঞানের ইতিহাস ব্যাখ্যায় আমাকে বহু দেশবাসী মনস্বিগণের নাম স্মরণ করাইতে হইত। কিন্তু তাহার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়? শিক্ষা-কার্য্যে অন্যে যাহা বলিয়াছে সেই সকল কথাই শিখাইতে হইত। ভারতবাসীরা যে কেবল ভাবপ্রবণ ও স্বপ্নাবিষ্ট, অনুসন্ধানকার্য্য কোন দিনই তাহাদের নহে, সেই এক কথাই চিরদিন শুনিয়া আসিতাম। বিলাতের ন্যায় এদেশে পরীক্ষাগার নাই, সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণও এদেশে কোনদিন হইতে পারে না, তাহাও কতবার শুনিয়াছি। তখন মনে হইল, যে ব্যক্তি পৌরুষ হারাইয়াছে কেবল সে-ই বৃথা পরিতাপ করে। অবসাদ দূর করিতে হইবে, দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিতে হইবে। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, সহজ পন্থা আমাদের জন্য নহে। তেইশ বৎসর পূর্ব্বে অন্ধকার দিনে এই সকল কথা স্মরণ করিয়া একজন তাহার সমগ্র মন, সমগ্র প্রাণ ও সাধনা ভবিষ্যতের জন্য নিবেদন করিয়াছিল। তাহার ধনবল কিছুই ছিল না, তাহার পথপ্রদর্শকও কেহ ছিল না। বহু বৎসর ধরিয়া একাকী তাহাকে প্রতিদিন প্রতিকূল অবস্থার সহিত যুঝিতে হইয়াছিল। এতদিন পরে তাহার নিবেদন সার্থক হইয়াছে।

জয়-পরাজয়

তেইশ বৎসর পূর্ব্বে অন্ধকার দিনে যে আশা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, দেবতার করুণায় তিন মাসের মধ্যে তাহার প্রথম ফল ফলিয়াছিল। জার্ম্মানীতে আচার্য্য হার্টস বিদ্যুৎতরঙ্গ সম্বন্ধে যে দুরূহ

কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার বহুল বিস্তার ও পরিণতি এখানেই সম্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু এদেশের কোন এক প্রসিদ্ধ সভাতে আমার আবিষ্ক্রিয়ার সংবাদ যখন পাঠ করি তখন সভাস্থ কোন সভ্যই আমার কার্য্য সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না। বুঝিতে পারিলাম, ভারতবাসীর বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁহারা একান্ত সন্দিহান। অতঃপর আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার বর্ত্তমান কালের সর্ব্বপ্রধান পদার্থবিদের নিকট প্রেরণ করি। আজ বাইশ বৎসর পরে তাহার উত্তর পাইলাম। তাহাতে অবগত হইলাম যে, আমার আবিষ্ক্রিয়া রয়েল সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত হইবে এবং এই তথ্য ভবিষ্যতে বৈজ্ঞানিক উন্নতির সহায়ক হইবে বলিয়া পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত বৃত্তি আমার গবেষণাকার্য্যে নিয়োজিত হইবে। সেই দিনে ভারতের সম্মুখে যে দ্বার অর্গলিত ছিল তাহা সহসা উন্মুক্ত হইল। আর কেহ সেই উন্মুক্ত দ্বার রোধ করিতে পারিবে না। সেই দিন যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে তাহা কখনও নির্ব্বাপিত হইবে না।

এই আশা করিয়াই আমি বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত মন ও শরীর লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলাম। কিন্তু মানুষের প্রকৃত পরীক্ষা একদিনে হয় না, সমস্ত জীবনব্যাপিয়া তাহাকে আশা ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত হইতে হয়। যখন আমার বৈজ্ঞানিক প্রতিপত্তি আশাতীত উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল তখনই সমস্ত জীবনের কৃতিত্ব ব্যর্থপ্রায় হইতেছিল।

তখন তারহীন সংবাদ ধরিবার কল নির্ম্মাণ করিয়া পরীক্ষা করিতেছিলাম। দেখিলাম, হঠাৎ কলের সাড়া কোন অজ্ঞাত কারণে বন্ধ হইয়া গেল। মানুষের লেখাভঙ্গী হইতে তাহার শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি যেরূপ অনুমান করা যায়, কলের সাড়ালিপিতে সেই একই রূপ চিহ্ন দেখিলাম। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিশ্রামের পর কলের ক্লান্তি দূর হইল এবং পুনরায় সাড়া দিতে লাগিল। উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে তাহার

সাড়া দিবার শক্তি বাড়িয়া গেল এবং বিষ প্রয়োগে তাহার সাড়া একেবারে অন্তর্হিত হইল। যে সাড়া দিবার শক্তি জীবনের এক প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত, জড়েও তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম। এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা আমি রয়েল সোসাইটীর সমক্ষে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রচলিত মত-বিরুদ্ধ বলিয়া জীবতত্ত্ববিদ্যার দুই-একজন অগ্রণী ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তদ্ভিন্ন আমি পদার্থবিৎ, আমার স্বীয় গণ্ডী ত্যাগ করিয়া জীবতত্ত্ববিদের নূতন জাতিতে প্রবেশ করিবার অনধিকার চেষ্টা রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইল। তাহার পর আরও দুই-একটি অশোভন ঘটনা ঘটিয়াছিল। যাঁহারা আমার বিরুদ্ধ পক্ষে ছিলেন তাঁহাদেরই মধ্যে একজন আমার আবিষ্কার পরে নিজের বলিয়া প্রকাশ করেন। এই বিষয়ে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ফলে, বহু বৎসর যাবৎ আমার সমুদয় কার্য্য পণ্ডপ্রায় হইয়াছিল। এতকাল একদিনের জন্যও মেঘরাশি ভেদ করিয়া আলোকের মুখ দেখিতে পাই নাই। এই সকল স্মৃতি অতিশয় ক্লেশকর। বলিবার একমাত্র আবশ্যকতা এই যে, যদি কেহ কোন বৃহৎ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুখ হন, তিনি যেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া থাকেন। যদি অসীম ধৈর্য্য থাকে, কেবল তাহা হইলেই বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন দেখিতে পাইবেন, বারংবার পরাজিত হইয়াও যে পরাঙ্মুখ হয় নাই সে-ই একদিন বিজয়ী হইবে।

পৃথিবী পর্য্যটন

ভাগ্য ও কার্য্যচক্র নিরন্তর ঘুরিতেছে—তাহার নিয়ম—উত্থান, পতন, আবার পুনরুত্থান। দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া যে ঘন দুর্দ্দিনে আমাকে ম্রিয়মান করিয়াও সম্পূর্ণ পরাভব করিতে পারে নাই, সে দুর্য্যোগও একদিন অভাবনীয়রূপে কাটিয়া গেল। আমার নূতন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচার করিবার জন্য ভারত-গভর্ণমেণ্ট ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আমাকে পৃথিবী

পর্য্যটনে প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে লণ্ডন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, সিকাগো, কালিফর্নিয়া, টোকিও ইত্যাদি স্থানে আমার পরীক্ষা প্রদর্শিত হয়। এই সকল স্থানে জয়মাল্য লইয়া কেহ আমার প্রতীক্ষা করে নাই, বরং আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিগণ আমার ত্রুটি দেখাইবার জন্যই দলবদ্ধ হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তখন আমি সম্পূর্ণ একাকী; অদৃশ্যে কেবল সহায় ছিলেন ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী। এই অসম সংগ্রামে ভারতেরই জয় হইল এবং যাঁহারা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁহারা পরে আমার পরমবান্ধব হইলেন।

বীরনীতি

বর্ত্তমান উদ্ভিদবিদ্যার অসীম উন্নতি লাইপজিগের জার্ম্মান অধ্যাপক ফেফারের অর্দ্ধশতাব্দীর অসাধারণ কৃতিত্বের ফল। আমার কোন কোন আবিষ্ক্রিয়া ফেফারে কয়েকটি মতের বিরুদ্ধে। তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছি মনে করিয়া আমি লাইপজিগ না গিয়া ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে ফেফার তাঁহার সহযোগী অধ্যাপককে আমায় নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেরণ করেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমার প্রতিষ্ঠিত নূতন তত্ত্বগুলি জীবনের সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে; তাঁহার দুঃখ রহিল যে, এই সকল সত্যের পরিণতি তিনি এ-জীবনে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। যাঁহার বৈরীভাব আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তিনিই মিত্ররূপে আমাকে গ্রহণ করিলেন। ইহাই ত চিরন্তন রীতিনীতি, যাহা আপনার পরাভবের মধ্যেও সত্যের জয় দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হয়। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই বীরধর্ম্ম কুরুক্ষেত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। অগ্নিবাণ আসিয়া যখন ভীষ্মদেবের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিল তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিয়াছিলেন, সার্থক আমার শিক্ষাদান! এই বাণ শিখণ্ডীর নহে, ইহা আমার প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনের।

পৃথিবী পর্য্যটন ও স্বীয় জীবনের পরীক্ষার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছি যে, নূতন সত্য আবিষ্কার করিবার জন্য সমস্ত জীবন পণ ও সাধনার আবশ্যক। জগতে তাহার প্রচার আরও তুরূহ। ইহাতে আমার পূর্ব্বসঙ্কল্প দৃঢ়তর হইয়াছে। বহুদিন সংগ্রামের পর ভারত বিজ্ঞানক্ষেত্রে যে স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহা যেন চিরস্থায়ী হয়। আমার কার্য্য যাঁহারা অনুসরণ করিবেন তাঁহাদের পথ যেন কোনদিন অবরুদ্ধ না হয়।

বিজ্ঞান-প্রচারে ভারতের দান

বিজ্ঞান ত সার্ব্বভৌমিক, তবে বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্রে এমন কি কোন স্থান আছে যাহা ভারতীয় সাধক ব্যতীত অসম্পূর্ণ থাকিবে? তাহা নিশ্চয়ই আছে। বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানের প্রসার বহু বিস্তৃত হইয়াছে এবং প্রতীচ্য দেশে কার্য্যের সুবিধার জন্য তাহা বহুধা বিভক্ত হইয়াছে এবং বিভিন্ন শাখার মধ্যে অভেদ্য প্রাচীর উত্থিত হইয়াছে। দৃশ্যজগৎ অতি বিচিত্র এবং বহুরূপী। এত বিভিন্নতার মধ্যে যে কিছু সাম্য আছে তাহা বোধগম্য হয় না। সতত চঞ্চল প্রাণী, আর এই চিরমৌন অবিচলিত উদ্ভিদ, ইহাদের মধ্যে কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। আর এই উদ্ভিদের মধ্যে একই কারণে বিভিন্নরূপে সাড়া দেখা যায়। কিন্তু এত বৈষম্যের মধ্যেও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালী একতার সন্ধানে ছুটিয়া জড়, উদ্ভিদ ও জীবের মধ্যে সেতু বাঁধিয়াছে। এতদর্থে ভারতীয় সাধক কখনও তাহার চিন্তা কল্পনার উন্মুক্ত রাজ্যে অবাধে প্রেরণ করিয়াছে এবং পরমুহূর্ত্তেই তাহাকে শাসনের অধীনে আনিয়াছে। আদেশের বলে জড়বৎ অঙ্গুলিতে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছে এবং যেস্থলে মানুষের ইন্দ্রিয় পরাস্ত হইয়াছে তথায় কৃত্রিম অতীন্দ্রিয় সৃজন করিয়াছে। তাহা দিয়া এবং অসীম ধৈর্য্য সম্বল করিয়া অব্যক্ত জগতের সীমাহীন রহস্যের, পরীক্ষাপ্রণালীতে স্থির প্রতিষ্ঠা করিবার সাহস বাঁধিয়াছে। যাহা চক্ষুর অগোচর ছিল তাহা

দৃষ্টিগোচর করিয়াছে। কৃত্রিম চক্ষু পরীক্ষা করিয়া মনুষ্যদৃষ্টির অভাবনীয় এমন এক নূতন রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে যে, তাহার দুইটি চক্ষু এক সময়ে জাগরিত থাকে না; পর্য্যায়ক্রমে একটি ঘুমায়, আর একটি জাগিয়া থাকে। ধাতুপাত্রে লুক্কায়িত স্মৃতির অদৃশ্য ছাপ প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছে। অদৃশ্য আলোক সাহায্যে কৃষ্ণ প্রস্তরের ভিতরের নির্ম্মাণ-কৌশল বাহির করিয়াছে। আণবিক কারুকার্য্য ঘূর্ণ্যমান বিদ্যুৎ-উর্ম্মির দ্বারা দেখাইয়াছে। বৃক্ষজীবনে মানবীয় জীবনের প্রতিকৃতি দেখাইয়া নির্ব্বাক জীবনের উত্তেজনা মানবের অনুভূতির অন্তর্গত করিয়াছে। বৃক্ষের অদৃশ্য বৃদ্ধি মাপিয়া লইয়াছে এবং বিভিন্ন আহার ও ব্যবহারে সেই বৃদ্ধি-মাত্রার পরিবর্ত্তন মুহূর্ত্তে ধরিয়াছে। মনুষ্যস্পর্শেও যে বৃক্ষ সঙ্কুচিত হয়, তাহা প্রমাণ করিয়াছে। যে উত্তেজক মানুষকে উৎফুল্ল করে, যে মাদক তাহাকে অবসন্ন করে, যে বিষ তাহার প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও তাহাদের একইবিধ ক্রিয়া প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিষে অবসন্ন মুমূর্ষু উদ্ভিদকে ভিন্ন বিষ প্রয়োগ দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিয়াছে। উদ্ভিদপেশীর স্পন্দন লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে হৃদয়স্পন্দনের প্রতিচ্ছায়া দেখাইয়াছে। বৃক্ষশরীরে স্নায়ুপ্রবাহ আবিষ্কার করিয়া তাহার বেগ নির্ণয় করিয়াছে। প্রমাণ করিয়াছে যে, যে সকল কারণে মানুষের স্নায়ুর উত্তেজনা বর্দ্ধিত বা মন্দীভূত হয় সেই একই কারণে উদ্ভিদ-স্নায়ুর আবেগও উত্তেজিত অথবা প্রশমিত হয়। এই সকল কথা কল্পনাপ্রসূত নহে। যে সকল অনুসন্ধান আমার পরীক্ষাগারে গত তেইশ বৎসর ধরিয়া পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত হইয়াছে ইহা তাহারই অতি সংক্ষিপ্ত ও অপরিপূর্ণ ইতিহাস। যে সকল অনুসন্ধানের কথা বলিলাম তাহাতে নানাপথ দিয়া পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, এমন কি মনস্তত্ত্বও এক কেন্দ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। বিধাতা যদি বিজ্ঞানের কোন বিশেষ তীর্থ ভারতীয় সাধকের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন তবে এই চতুর্বেণী-সঙ্গমেই সেই মহাতীর্থ।

আশা ও বিশ্বাস

এই সকল অনুসন্ধান বিজ্ঞানের বহু শাখা লইয়া। কেহ কেহ মনে করেন, ইহাদের বিকাশে নানা ব্যবহারিক বিদ্যার উন্নতি এবং জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে। যে সকল আশা ও বিশ্বাস লইয়া আমি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলাম তাহা কি একজনের জীবনের সঙ্গেই সমাপ্ত হইবে? একটিমাত্র বিষয়ের জন্য বীক্ষণাগার নির্মাণে অপরিমিত ধনের আবশ্যক হয়; আর এইরূপ অতি বিস্তৃত এবং বহুমুখী জ্ঞানের বিস্তার যে আমাদের দেশের পক্ষে অসম্ভব, একথা বিজ্ঞজন মাত্রেই বলিবেন। কিন্তু আমি অসম্ভাব্য বিষয়ের উপলক্ষে কেবলমাত্র বিশ্বাসের বলেই চিরজীবন চলিয়াছি; ইহা তাহারই মধ্যে অন্যতম। 'হইতে পারে না' বলিয়া কোনদিন পরাঙ্মুখ হই নাই; এখনও হইব না। আমার যাহা নিজস্ব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম তাহা এই কার্য্যেই নিয়োগ করিব। রিক্তহস্তে আসিয়াছিলাম, রিক্তহস্তেই ফিরিয়া যাইব; ইতিমধ্যে যদি কিছু সম্পাদিত হয় তাহা দেবতার প্রসাদ বলিয়া মানিব। আর একজনও এই কার্য্যে তাঁহার সর্ব্বস্ব নিয়োগ করিবেন, যাঁহার সাহচর্য্য আমার দুঃখ এবং পরাজয়ের মধ্যেও বহুদিন অটল রহিয়াছে। বিধাতার করুণা হইতে কোনদিন একেবারে বঞ্চিত হই নাই। যখন আমার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বে অনেকে সন্দিহান ছিলেন তখনও দুই-এক জনের বিশ্বাস আমাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাঁহারা মৃত্যুর পরপারে।

আশঙ্কা হইয়াছিল, কেবলমাত্র ভবিষ্যতের অনিশ্চিত বিধানের উপরেই এই মন্দিরের স্থায়িত্ব নির্ভর করিবে। অল্পদিন হইল বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমি যে আশায় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি তাহার আহ্বান ভারতের দূরস্থানেও মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, আমি যে বৃহৎ সঙ্কল্প করিয়াছিলাম তাহার পরিণতি একেবারে অসম্ভব নহে।

জীবিত থাকিতেই হয়ত দেখিতে পাইব যে, এই মন্দিরের শূন্য অঙ্গন দেশবিদেশ হইতে সমাগত যাত্রীদ্বারা পূর্ণ হইয়াছে।

আবিষ্কার এবং প্রচার

বিজ্ঞান অনুশীলনের দুইটি দিক আছে। প্রথমত নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার; ইহাই এই মন্দিরের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর, জগতে সেই নূতন তত্ত্ব প্রচার। সেইজন্যই এই সুবৃহৎ বক্তৃতাগৃহ নির্মিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক বক্তৃতা ও তাহার পরীক্ষার জন্য এইরূপ গৃহ বোধ হয় অন্য কোথাও নির্ম্মিত হয় নাই। দেড় সহস্র শ্রোতার এখানে সমাবেশ হইতে পারিবে। এস্থানে কোন বহুচর্ব্বিত তত্ত্বের পুনরাবৃত্তি হইবে না। বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই মন্দিরে যে সকল আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে সেই সকল নূতন সত্য এস্থানে পরীক্ষা সহকারে সর্ব্বাগ্রে প্রচারিত হইবে। সর্ব্ব জাতির সকল নরনারীর জন্য মন্দিরের দ্বার চিরদিন উন্মুক্ত থাকিবে। মন্দির হইতে প্রচারিত পত্রিকা দ্বারা নব নব প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জগতে পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট বিজ্ঞাপিত হইবে এবং হয়ত তদ্দ্বারা ব্যবহারিক বিজ্ঞানেরও উন্নতি সাধিত হইবে।

আমার আরও অভিপ্রায় এই যে, এ মন্দিরের শিক্ষা হইতে বিদেশবাসীও বঞ্চিত হইবে না। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে জ্ঞান সার্ব্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় দেশ-দেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে তখনই আমরা মহৎরূপে দান করিয়াছি —ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্ব্বজীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য। শিল্পী কারুকার্য্যে এই মন্দির মণ্ডিত করিয়াছেন এবং চিত্রকর আমাদের হৃদয়ের অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা চিত্রপটে বিকশিত করিয়াছেন।

আমি যে উদ্ভিদ-জীবনের কথা বলিয়াছি তাহা আমাদের জীবনেরই প্রতিধ্বনি। সে জীবন আহত হইয়া মুমূর্ষপ্রায় হয় এবং ক্ষণিক মূর্চ্ছা হইতে পুনরায় জাগিয়া উঠে। এই আঘাতের দুইটি দিক আছে; আমরা সেই দুইএর সংযোগস্থলে বর্ত্তমান। একদিকে জীবনের, অপরদিকে মৃত্যুর পথ প্রসারিত। জীবের স্পন্দন আঘাতেরই ক্রিয়া, যে আঘাত হইতে আমরা পুনরায় উঠিতে পারি। প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা আঘাত দ্বারা মুমূর্ষু হইতেছি এবং পুনরায় সঞ্জীবিত হইতেছি। আঘাতের বলেই জীবনের শক্তি বর্দ্ধিত হইতেছে। তিল তিল করিয়া মরিতেছি বলিয়াই আমরা বাঁচিয়া রহিয়াছি।

একদিন আসিবে যখন আঘাতের মাত্রা ভীষণ হইবে; তখন যাহা হেলিয়া পড়িবে তাহা আর উঠিবে না; অন্য কেহও তাহাকে তুলিয়া ধরিতে পারিবে না। ব্যর্থ তখন স্বজনের ক্রন্দন, ব্যর্থ তখন সতীর জীবন-ব্যাপী ব্রত ও সাধনা। কিন্তু যে মৃত্যুর স্পর্শে সমুদয় উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্য শান্ত হয় তাহার রাজত্ব কোন্ কোন্ দেশ লইয়া? কে ইহার রহস্য উদ্ঘাটন করিবে? অজ্ঞান-তিমিরে আমরা একেবারে আচ্ছন্ন। চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইলেই এই ক্ষুদ্র বিশ্বের পশ্চাতে অচিন্ত্যনীয় নূতন বিশ্বের অনন্ত ব্যাপ্তিতে আমরা অভিভূত হইয়া পড়ি।

কে মনে করিতে পারিত, এই আর্ত্তনাদবিহীন উদ্ভিদজগতে, এই তুষ্ণীভূত অসীম জীবসঞ্চারে অনুভূতিশক্তি বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। তাহার পর কি করিয়াই বা স্নায়ুসূত্রের উত্তেজনা হইতে তাহারই ছায়া-রূপিণী অশরীরী স্নেহমমতা উদ্ভূত হইল! ইহার মধ্যে কোন্‌টা অজর, কোন্‌টা অমর? যখন এই ক্রীড়াশীল পুত্তলিদের খেলা শেষ হইবে এবং তাহাদের দেহাবশেষ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে তখন সেই সকল অশরীরী ছায়া কি আকাশে মিলাইয়া যাইবে, অথবা অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইবে?

কোন্ রাজ্যের উপর তবে মৃত্যুর অধিকার? মৃত্যুই যদি মনুষ্যের একমাত্র পরিণাম তবে ধনধান্যে পূর্ণা পৃথিবী লইয়া সে কি করিবে? কিন্তু মৃত্যু সর্ব্বজয়ী নহে; জড়-সমষ্টির উপরই কেবল তাহার আধিপত্য। মানব-চিন্তাপ্রসূত স্বর্গীয় অগ্নি মৃত্যুর আঘাতেও নির্ব্বাপিত হয় না। অমরত্বের বীজ চিন্তায়, বিত্তে নহে। মহাসাম্রাজ্য দেশ বিজয়ে কোনদিন স্থাপিত হয় নাই। তাহার প্রতিষ্ঠা কেবল চিন্তা ও দিব্যজ্ঞান প্রচার দ্বারা সাধিত হইয়াছে। বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে এই ভারতখণ্ডেই অশোক যে মহা-সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা কেবল শারীরিক বল ও পার্থিব ঐশ্বর্য্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সেই মহাসাম্রাজ্যে যাহা সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা কেবল বিতরণের জন্য, এবং জীবের কল্যাণের জন্য। জগতের মুক্তি-হেতু সমস্ত বিতরণ করিয়া এমন দিন আসিল যখন সেই সসাগরা ধরণীর অধিপতি অশোকের অর্দ্ধ আমলক মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন তাহা হস্তে লইয়া তিনি কহিলেন—এখন ইহাই আমার সর্ব্বস্ব, ইহাই যেন আমার চরম দানরূপে গৃহীত হয়।

অর্ঘ্য

এই আমলকের চিহ্ন মন্দিরগাত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। পতাকাস্বরূপ সর্ব্বোপরি বজ্রচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত—যে দৈব অস্ত্র নিষ্পাপ দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাঁহারা পরার্থে জীবন দান করেন তাঁহাদের অস্থি দ্বারাই বজ্র নির্ম্মিত হয়, যাহার জলন্ত তেজে জগতে দানবত্বের বিনাশ ও দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। আজ আমাদের অর্ঘ্য অর্দ্ধ আমলক মাত্র; কিন্তু পূর্ব্বদিনের মহিমা মহত্তর হইয়া পুনর্জ্জন্ম লাভ করিবেই করিবে। এই আশা লইয়া অদ্য আমরা ক্ষণকালের জন্য এখানে দাঁড়াইলাম কল্য হইতে পুনরায় কর্ম্মস্রোতে জীবনতরী ভাসাইব। আজ কেবল আরাধ্যা দেবীর পূজার অর্ঘ্য লইয়া এখানে আসিয়াছি। তাঁহার

প্রকৃত স্থান বাহিরে নহে, হৃদয় মন্দিরে। তাহার প্রকৃত উপকরণ ভক্তের বহুবলে, অন্তরের শক্তিতে এবং হৃদয়ের ভক্তিতে। তাহার পর সাধক কি আশীর্ব্বাদ আকাঙ্ক্ষা করিবে? যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়াও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন পরাজিত ও মুমূর্ষু হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্যা দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপ পরাজয়ের মধ্য দিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে।

[বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ১৯১৭]

কুমুদিনীর নিশি জাগরণ

॥ জগদীশচন্দ্র বসু ॥

বৈজ্ঞানিকের আগেই কবি আসর লইয়াছেন। 'ফুল্ল জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী'তে কুমুদিনীর উন্মেষ ও দিবসে 'নির্ম্মল উজ্জ্বল সূর্য্যকরের' প্রভাবে নলিনীর বিকাশ দেখিয়া কবি গাহিলেন

'গিরৌ ময়ূরাঃ গগনে পয়োদাঃ
লক্ষান্তরে ভানুঃ জলে চ পদ্মম্।
ইন্দুর্দ্বিলক্ষে কুমুদস্য বন্ধু—
যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরম্॥'

কবি এইখানে থামিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকও কবির ন্যায় এই বৈচিত্র্যময় ব্রহ্মাণ্ডে এক মহান ছন্দ এবং বিরাট ঐক্যের সন্ধানে ফিরিতেছেন। তাই বৈজ্ঞানিক ঘন তমসাবৃত অমানিশায় কুমুদিনীর স্বরূপ দেখিবার ভার লইলেন; প্রদীপ হাতে কাছে আসিয়া বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া সেই ঘোর অন্ধকারে প্রিয়সখার অদর্শনজনিত কোন চিহ্নই তিনি কুমুদিনীতে দেখিতে পাইলেন না। বৈজ্ঞানিক দেখিলেন কুমুদবন্ধু আকাশে দেখা দিল আর না দিল প্রতি রাত্রেই কুমুদের সেই একই উন্মেষ—সেই একই উল্লাস, আরও দেখিলেন যে রবিকরস্পর্শমাত্রেই কুমুদিনীর সঙ্কোচ ঘটে না, তাহার সুষুপ্তি আসে সূর্য্যোদয়ের অনেক পরে।

একখানি ফরাসী অভিধানে কাঁকড়া সম্বন্ধে লেখা ছিল কাঁকড়া একটি ছোট লাল মাছ যাহা পিছন দিকে চলে। অভিধানকার কাঁকড়ার এই বর্ণনা যথাযথ হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিৎ কুভিয়ার-এর নিকট যান; কুভিয়ার শুনিয়া বলিলেন—চমৎকার হইয়াছে, শুধু এইটুকু তফাৎ—কাঁকড়া মাত্রেই ছোট নয়, সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা লাল নয়, ইহা মাছ নয় এবং আর যেদিকে যাউক ইহা পিছনে চলে না, এই যা প্রভেদ। নচেৎ বর্ণনা একেবারে হুবহু হইয়াছে।

কবি-বর্ণিত কুমুদিনীর প্রণয়েতিহাসও অনেকটা এইরূপই। চন্দ্র না উঠিলেও কুমুদ ফোটে এবং সূর্য্য উঠিলেই ইহা মুদিয়া যায় না।

'বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল ফুটল ঝিঙ্গার ফুল' গান শুনিয়া আর এক জাতীয় পুষ্পের বিকাশে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। গঙ্গার ধারে সিস্‌বেড়িয়ার বাগানে খানিকটা জায়গায় মালী ঝিঙ্গা গাছ দিয়াছিল। সকালের সেই বাগানকে আর অপরাহ্নে যেন চেনাই যায় না। সূর্য্যের অস্তাচল গমনের সঙ্গে সঙ্গে সদ্যপ্রস্ফুটিত ঝিঙ্গা-ফুল নব রংএ রঞ্জিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। এখানেও ফুলগুলি সমস্ত রাত্রি প্রস্ফুটিত থাকিয়া সকালবেলা মুদ্রিত হয়।

উদ্ভিদের নিদ্রা ও জাগরণ সম্বন্ধে গত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বৈজ্ঞানিক-দিগের মধ্যে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের অনেকে মনে করেন যে ঘুমান বা জাগা উদ্ভিদের সম্পূর্ণ খেয়াল মাত্র।

কুমুদ রাত্রে ফোটে এবং দিনে বন্ধ হয়—কারণ সে এই রূপই করিয়া থাকে; আর পদ্ম দিনে ফোটে রাত্রে মুদিয়া যায়, কারণ পদ্ম এ বিষয়ে কুমুদের ঠিক উল্টা করে।

একবার এক প্রশ্ন উঠিয়াছিল—

তিলঞ্চ সরিষা চৈব উভয়ে তৈলদায়িকে।
তর্পণে তিল দরকারং সরিষা নাস্তি কি কারণে॥

তাহার উত্তর আসিয়াছিল—

ঢাকঞ্চ ঢোলকঞ্চৈব উভয়ে বাদ্যদায়িকে।
গাজনে ঢাক দরকারং ঢোলং নাস্তি যে কারণে॥

কুমুদ ও পদ্মের ফোটা না-ফোটা সম্বন্ধে অনেকটা এই রকমের কৈফিয়ৎ মিলিত।

কিন্তু এ সম্বন্ধে এই কি শেষ কথা থাকিবে? কয়েক বৎসর ধরিয়া এখানে এ বিষয়ে অনেকগুলি পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছে। সেই-সকল পরীক্ষার ফল হইতে কি তথ্যে উপনীত হওয়া যায় দেখা যাউক।

টবসুদ্ধ একটা গাছকে কাৎ করিয়া গাছের ডালটিকে যদি মাটির সহিত শোয়াইয়া রাখা যায় তো দেখা যায় ডালটা বাঁকিয়া মাথা উঁচু করিয়া উঠিতেছে। পৃথিবীর টানের বিরুদ্ধে গাছ এইরূপ কবিয়া থাকে। এইরূপ বাঁকিয়া উপরে উঠিবার শক্তি কোন গাছে খুব বেশী, কোথাও বা উহা খুব কম।

মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া ব্যতীত উদ্ভিদ্ আলোকস্পর্শে পাতা উঠাইয়া নামাইয়া নানা রকমে সাড়া দিয়া থাকে। কোথাও পাতা বাঁকিয়া আলোকের দিকে অগ্রসর হয়, আবার কোন গাছে উহারা আলোক হইতে দূরে যাইবার জন্য ঘাড় বাঁকাইতে থাকে। একটি মাদার গাছের পাতার উপর আলো ফেলা হইল, পাতাটি এতক্ষণ অন্ধকারে চুপ করিয়াছিল, আলোক পাইবামাত্র মন পুলকিত হউক বা যাহাই হউক এক মিনিট দেড় মিনিটের মধ্যেই উপর দিকে বাঁকিতে লাগিল। কিন্তু লজ্জাবতী এইরূপ অবস্থায় যেন লজ্জায় মাথা হেঁট করে।

পৃথিবীর আকর্ষণ ও আলোকজনিত উত্তেজনা—মাত্র এই দুইটি শক্তি যদি উদ্ভিদের উপর কাজ করিত তাহা হইলেও উহাদের সমবেত শক্তি গাছের মধ্যে কত বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্ত্তন সংঘটিত করিত। কোথাও একটি শক্তি অপরটির বিপরীত দিকে কাজ করিতেছে, কোথাও বা তাহারা

পরস্পর সহায়তা করিতেছে ; এবং প্রত্যেক শক্তির ক্রিয়ার পরিমাণ কত বিভিন্ন। সুতরাং কোন উদ্ভিদে এই দুইটি ভিন্ন শক্তির সমবেত ফল দেখিয়াই বলা চলে না কোন্‌টা কতটুকু কাজ করিতেছে ; তজ্জন্য পৃথক পরীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। কৃপণ ১৫৲ টাকা রোজকার করিয়া তাহার মধ্যে ১০৲টাকা জমায় ; দাতা ১৫০০৲ টাকা রোজকার করিয়া আবার মাসের শেষে ধার করে ; সুতরাং সঞ্চয়ের পরিমাণ দেখিয়া কোন গৃহস্থের আয়ব্যয়ের অঙ্কের পরিমাণ দেওয়া চলে না ; তজ্জন্য তাহার হিসাবের খাতা দেখিতে হইবে।

প্রথমতঃ দেখা যাউক কুমুদের এই পাতা খোলা বা পাতা বন্ধ পৃথিবীর আকর্ষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে ঘটিতেছে কি না। একটি অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত কুমুদ ফুল লওয়া হইল ; পাপ্‌ড়িগুলি যদি উপরের দিকে উঠে তো ফুলটি মুদিয়া যাইবে, যদি নীচের দিকে নামে তো উহা আরও খুলিবে ; কিন্তু ঠিক বিপরীত হইবে যদি ফুলটিকে মাথা নীচু ও ডালটি উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখা যায় ; তখন পাপ্‌ড়িগুলির উপরে উঠার ফলে ফুলটি আরও খুলিয়া যাইবে এবং নীচে নামিলে ফুলটি বন্ধ হইবে। সুতরাং একটি ফুলকে যদি মাথা নীচু করিয়া রাখা যায় তো যখন তাহার ফুটিবার কথা তখন সে বুজিয়া যাইবে, যখন তাহার মুদিবার কথা তখন সে খুলিয়া যাইবে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে সোজাই দাঁড়াক্‌ বা উল্‌টিয়া থাকুক্‌ যখন ফুটিবার কথা তখনই কুমুদ ফোটে তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটে না।

সুতরাং কুমুদ যে মাধ্যাকর্ষণের উত্তেজনায় ফোটে না তাহা দেখা গেল। এইবার আলোর ক্রিয়ার ফল অনুসন্ধান করা যাউক।

একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মিত হইল যাহাতে পরীক্ষাকারীর সাহায্য ব্যতিরেকে তাহার অনুপস্থিতিতেও ফুলের পাপ্‌ড়ির উঠা-নামা মিনিটের পর মিনিট ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন স্বতঃই লিপিবদ্ধ হইতে চলিল। দেখা গেল সূর্য্য উঠিলেই রবিকরস্পর্শে কুমুদিনী মুদ্রিতা হয় না, বেলা ১০।১১টার পর তাহার পাপ্‌ড়ি বুজিয়া আসে।

সুতরাং ইহা আলোকের উত্তেজনার ফলেও নয়। ফুলের এই নিম্নলিখিত লিপির সাক্ষ্য হইতে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে উহা সন্ধ্যা ৬টার সময় খুলিতে আরম্ভ করে, এবং রাত্রি ১০টার সময় সম্পূর্ণরূপে খুলিয়া যায়। আর বেলা ১০টার সময় সম্পূর্ণরূপে বুজিয়া যায়। আরও দেখা যায় সন্ধ্যার সময় হইতে তাপমান যন্ত্রের পারদ বেশী নামিতে থাকে, এবং সকাল হইতে উত্তাপ বাড়িতে থাকে। কুমুদিনীর দিবানিদ্রা এবং রাত্রিজাগরণ তবে কি বাহিরের উত্তাপ ও শৈত্যের ফলে ?

পূর্ব্বের ঐ যন্ত্রটির গায়ে আর একটি যন্ত্র লাগাইয়া দেওয়া হইল যাহাতে ফুলের ঐ লিপির পাশে পাশে সমস্ত দিবারাত্রির তাপ-পরিবর্ত্তনের সংবাদ লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। দিনের পর দিন এইরূপ লিপিসাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল। পরে মিলাইয়া দেখা গেল যে দুইটি লিপিই সম্পূর্ণ এক, মিশাইলে চেনা যায় না যে দুইটিতে দুইটি বিভিন্ন বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সুতরাং দেখা গেল যে কুমুদের ফোটা বা বন্ধ হওয়া একমাত্র বাহিরের তাপের দ্বারাই সংঘটিত হয়; এবং যে কারণে ফরিদপুরের খেজুর গাছ সন্ধ্যায় মাথা নোয়ায় এবং প্রাতঃকালে সোজা হইয়া দাঁড়ায় সেই একই কারণে সমস্ত পৃথিবীর কুমুদ রাত্রে বিকশিত হইয়া দিবসে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, এবং সেই একই কারণে গঙ্গার ধারে সিস্‌বেড়িয়ার বাগানে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে ঝিঙ্গা-ফুলের রূপবৈচিত্র্য দেখা যায়।

পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে দিনের বেলায় কুমুদের চারিদিকে যদি রাত্রের শৈত্য বজায় রাখা যায় তো দিবসেও রাত্রের ন্যায়ও কুমুদ প্রস্ফুটিত থাকে, পক্ষান্তরে রাত্রে যদি উহার চতুর্দ্দিকে দিনের উত্তাপ সমপরিমাণে রাখিতে পারা যায় তো আকাশে পূর্ণচন্দ্রের আবির্ভাব হইলেও কুমুদিনী মুখ তুলিয়া চাহিবে না।

কিন্তু একটা কথা এই কুমুদিনী যখন বিকশিতা তখন নলিনী, মলিনী কেন, আবার কমলিনীর উন্মীলনে কুমুদিনী মুদ্রিতা কেন? বাহিরের উত্তাপ বা শৈত্য কিরূপে দুইটিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় লইয়া যাইতেছে ?

একখণ্ড লৌহকে সমলম্ব একখণ্ড তাম্রের সহিত সংলগ্ন করিয়া উভয়কে উত্তাপ দিতে আরম্ভ করা হইল ; তাপে উভয়েই বাড়িবে, কিন্তু সমতাপে তাম্র সমলম্ব লৌহ অপেক্ষা অধিক বাড়ে, অথচ প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক বাড়িবার জো নাই বলিয়া ফলে সমস্তটি ধনুকের ন্যায় বাঁকিয়া যাইবে, যেটি বেশী বাড়ে সেইটি থাকিবে বাহিরে, যেটি কম বাড়ে সেইটি থাকিবে ভিতরে। সেইরূপ গাছের একদিক যদি আর-একদিক অপেক্ষা বেশী বাড়ে তবে গাছটি বাঁকিতে থাকিবে, পাতার একদিক আর দিকের অপেক্ষা বাড়িলে পাতাটি ধনুকের মত হইবে।

বাহিরের উত্তাপ বা শৈত্যের সহিত গাছের বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক আছে কিনা দেখিবার জন্য নবনির্ম্মিত ম্যাগ্‌নেটিক ক্রেস্কোগ্রাফ্‌ যাহা অত্যধিক শক্তিশালী অনুবীক্ষণের দৃষ্টির অতীত গাছের বৃদ্ধিকে কোটীগুণ পরিবর্দ্ধিত করিয়া চোখের সম্মুখে ধরে, সেই ক্রেস্কোগ্রাফে একটি গাছ বসান হইল ; গাছ তাহার সাধারণ অবস্থায় বাড়িতে লাগিল। ঠাণ্ডা বরফজল চারিদিকে দেওয়া হইল। দেখিতে দেখিতে উহার বৃদ্ধি একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। এইবার বরফজল ফেলিয়া গরমজল দেওয়া হইল। গাছ তাহার সহজ অবস্থা অপেক্ষা অধিকতর দ্রুতবেগে বাড়িতে লাগিল।

বাহিরের উত্তাপে কুমুদের পাপ্‌ড়িও বাড়িতে থাকিবে, কিন্তু এই পাপ্‌ড়ির বাহিরের সবুজ দিকটা ভিতরের সাদা দিকটা অপেক্ষা বেশী কমনীয়, সুতরাং বাহিরটা ভিতর অপেক্ষা বেশী বাড়িবে, ফলে সমস্ত পাপ্‌ড়িটা ধনুকের আকার লইবে—সবুজ দিকটা থাকিবে বাহিরে, সাদা দিকটা থাকিবে ভিতরে, সুতরাং ফুলটি একেবারে মুদিয়া যাইবে। দিনে ফোটে এইরূপ একটি ফুল লওয়া হইল, দেখা গেল পাপ্‌ড়ির ভিতরটা উহার বাহির অপেক্ষা অধিক কোমল, সুতরাং এ ক্ষেত্রেও পাপ্‌ড়িটি বাঁকিবে, তবে এবার উহা উল্টা দিকে বাঁকিবে, ফলে বাহিরের উত্তাপের প্রভাবে উহা আরও খুলিয়া যাইবে।

সুতরাং একই উত্তেজনা যে ভিন্ন জাতীয় পুষ্পকে বিভিন্ন রূপ প্রদান করে তাহা কেবলমাত্র তাহাদের আভ্যন্তরিক গঠনবৈচিত্র্যের ফলে।

উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে নিম্নতম প্রাণীর সাড়া দিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত বহু ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত ছিল। জীবমাত্রেই বাহিরের যাবতীয় আঘাতে সর্ব্বদাই বিক্ষুব্ধ, কেবল উদ্ভিদকে যে দিকে নাড়াও সে সেই দিকেই নড়িবে, যে দিকে বাড়িবার সে শুধু সেই দিকেই বাড়িবে, বহির্জ্জগতের আঘাতের সাড়া দিবার কোন ক্ষমতা তাহার নাই, কেবল লজ্জাবতীর ন্যায় কয়েকটি স্পন্দনকারী উদ্ভিদ ভিন্ন যাবতীয় উদ্ভিদই নীরব নিস্পন্দ এবং এই অস্পন্দতাই যেন উদ্ভিদের বিশেষ ধর্ম্ম এই কথাই মনে করা হইত। কিন্তু উদ্ভিদকে কত অবস্থা-পরম্পরার মধ্যেই না বাড়িতে হইয়াছে। নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল আলো ও অন্ধকার, তাপ ও শৈত্য, পৃথিবীর আকর্ষণ ঝঞ্ঝা কতই না তাহাকে সংক্ষুব্ধ করিয়াছে, কত ভাবেই না সে তাহার অন্তর্নিহিত বেদনা জ্ঞাপন করিয়াছে, কিন্তু মানবচক্ষু তাহা দেখিতে পায় নাই। তাই এমন সূক্ষ্মযন্ত্র আবিষ্কার করিবার প্রয়োজন হইল যাহার সাহায্যে উদ্ভিদ আপনি আপনার অদৃশ্য বেদনার কাহিনী নিজ হাতে লিখিয়া দিতে পারে এবং তাহা এমন ভাষায় লিখিবে যাহা আমরা বুঝিতে পারি। কেবলমাত্র তখনই এই প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব হইল যে উদ্ভিদমাত্রেই, না কেবলমাত্র লজ্জাশীলা লতা, বাহিরের আঘাত উত্তেজনায় অভিভূত হয়। আজ সেই লিপির সাক্ষ্যে আমারা বলিতে পারি যে, এই ভূমণ্ডলে শুধু মানবই যে বাহিরের আঘাত উত্তেজনায় আক্রান্ত হইতেছে তাহা নয়, নীরব উদ্ভিদও সমভাবে উহা অনুভব করিতেছে এবং কত কাল কত যুগ ধরিয়া কত অশ্বত্থ বট কত তাল-তমাল সেই আঘাত উত্তেজনার ইতিহাস নিজেদের দেহে বহন করিতেছে।

[বসু বিজ্ঞানমন্দিরে বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বক্তৃতার সারাংশ। শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও অনূদিত।]

৮৫নং অপার সার্কুলার রোড।

২রা মার্চ্চ, ১৯০০।

সুহৃদ্বরেষু—

শুনিলাম, পরিবারের অসুখ বলিয়া আপনাকে শিলাইদহ যাইতে হইয়াছে। আশা করি, আপনাদের সর্ব্বথা কুশল। সেদিন লোকেনের সহিত কবিতা নির্ব্বাচন লইয়া অনেক কথা হইল। যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে inartistic লোকেনের প্রিয় কোন কবিতা থাকিবে, এরূপ বোধ হয় না। যাঁহারা অতিমাত্রায় আধুনিকত্ব দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সেকেলে পুরাতন ও সরল, সকল artএর মূলে স্থিত, কতকগুলি স্নেহবৃত্তি ও স্মৃতি সর্ব্বাপেক্ষা মধুর। জানি না কেন সে সব এত আকর্ষণ করে। লোকেন বলিল, আপনি তাহার নিকট unconditional আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। তাহা হইলে আর বলিবার কিছু নাই।

গত মঙ্গলবার দিন Belvedereএ গিয়াছিলাম। Sir J. Woodburn আমার জয়ের কথা শুনিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং আগামী সোমবার দিন Laboratoryতে আসিয়া experiment দেখিবেন ও আমার ছাত্রদিগের কার্য্য দেখিবেন বলিয়া দিলেন। আপনারা আমার Paris Congressএ যাওয়া উচিত বলিয়াছিলেন। তাঁহার অনুগ্রহ দেখিয়া আমি সে কথা বলিলাম, আর যে নিমন্ত্রণপত্র আসিয়াছে

সেকথা উল্লেখ করিলাম। Lt. Governor বলিলেন যে তিনি যথাসাধ্য আমাকে সাহায্য করিবেন, তবে এ বিষয় Secretary of State-এর হাত।

গত সপ্তাহ আমার বিশেষ উৎসাহে গিয়াছিল, আর আজ কোন নূতন experiment আশাতীতরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল। সুতরাং সেই মুহূর্ত্তেই Directorএর নিকট হইতে পত্র পাইলাম যে—"I am informed you had an interview with the Lt. Governor and have asked to be deputed to Paris Exn., to attend a meeting of European Scientists. May I ask you to inform me of the reasons for making your request to His Honor?"

এরূপ দুরাশা করিবার reason কি, ইহার explanation কি দিতে হইবে জানি না।

আমাদের কর্ম্মফল অনেক এবং অনেক দুরাশা আমাদিগকে পদে পদে লাঞ্ছিত করে।

কতদূর মন সঙ্কীর্ণ করিতে হইবে? কতদূর কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিতে হইবে? ইহার শেষ কোথায়?

আপনি এসব শুনিয়া কষ্ট পাইবেন জানিয়াও না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। কোন্ দিন কোন্ অপ্রত্যাশিত পতন আছে জানি না।

আর এক কথা। আপনারা আমার সম্বন্ধে যে interest লইয়াছেন তাহা আমার না জানিলেই ভাল হইত, কারণ এ সম্বন্ধে information তলব হইলে আমার কি বলিতে হইবে জানি না। আর এক সময়ে যে অনেক কাজ করিবার আশা করিয়াছিলাম, তাহা আমার দ্বারা যে হইবে এমন আশা করি না। অনেকগুলি বিষয়ের সূত্র ধরিয়াছিলাম; সে-

সবগুলি এখন পাক লাগিয়া গিয়াছে। সেগুলির পুনর্ব্বার উদ্ধার হইবে কিনা বলিতে পারি না।

সে যাহা হউক, আপনাদের স্নেহ স্মরণ থাকিবে এবং তাহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান পুরস্কার।

আপনি ত্রিপুরা যাইতেছেন। মহারাজাকে আমার সসম্মান সম্ভাষণ জানাইবেন। আমি ছুটি পাইলে আসিতাম। ছুটি পাইলাম না। সেই crossএর একটি ফল ত্রিপুরা পাঠাইব। আপনি মহারাজাকে দেখাইবেন।

আপনার

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

London
C/o Messrs. Henry S. King & Co.
65 Cornhill, London, E. C.
31st Aug., 1900.

সুহৃৎ—

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইয়াছি। সর্ব্বদা যেন পত্র পাই। আমি নানাবিধ stress and strainএর মধ্যে; সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও দীর্ঘ পত্র লিখিতে সময় পাই না। আজ না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। পারিসে যা যা দেখিলাম, তাহাতে যেমন নূতন বিজ্ঞানের প্রভাব দেখিয়া সুখী হইয়াছি, তেমনই দেশের কথা মনে করিয়া একেবারে নিরুৎসাহ হইয়াছি। এই ভয়ানক জীবনসংগ্রাম নির্ম্মম বিরামহীন—এই সংগ্রামে যাহাবা একটু পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, তাহারা একদিন নির্ম্মূল হইবে। এখানে কি ব্যগ্রতা! একটি নূতন আবিষ্কার হইল, আর অমনি তাহা কাজে লাগিল। যাহারা সর্ব্বপ্রথমে তাহার ব্যবহার শিখিল, তাহারা অন্য জাতিকে ব্যবসায়ে এবং manufactureএ পরাস্ত করিল। পৃথিবী ব্যাপিয়া এই সংগ্রাম অহোরাত্র চলিতেছে। নির্ম্মম প্রকৃতি! আমাদের ন্যায় উদ্যমহীন অকর্ম্মঠ জাতি আর কতকাল বাঁচিয়া থাকিবে? এসব মনে করিয়া মনের জ্বালা সম্বরণ করা অসম্ভব। কি মনে করিয়া মন দমন করা যায় বলুন। সম্মুখে আশার আলো দেখিলে মনে উৎসাহ আসে, কিন্তু ব্যর্থ উদ্যম লইয়া কে জীবন বহিতে পারে?

এসব কথা এখন থাকুক। আমার কাজের কথা জানিবার জন্য উৎসুক আছেন; সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

প্রথমতঃ, আমি দেরীতে পৌছিয়াছি এবং আমি যে বিষয় বলিব মনে করিয়াছিলাম তাহা Royal Societyতে শেষ মুহূর্ত্তে পৌছিয়াছিল, সুতরাং তাহা publish এখনও হয় নাই। এজন্য সে বিষয়ে বলিতে পারি কি না জানিতাম না। সে যাহা হউক, একদিন Congressএর President হঠাৎ আমাকে বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি কিছু কিছু বলিয়াছিলাম। তাহাতে অনেকে অতিশয় আশ্চর্য্য হইলেন। তারপর Congressএর Secretary (তিনি ইংরাজী জানেন) আমার নিকট আমার বিষয়টির পূর্ণ account চাহিলেন, তিনি ফরাসী ভাষায় তর্জমা করিবেন। এই উপলক্ষে তিনি আমার সহিত দেখা করিতে আইসেন, এবং আমার কাজ লইয়া discussion করেন। একঘণ্টা পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—But, monsieur, this is very beautiful (butএর অর্থ আমি প্রথম বিশ্বাস করি নাই।)। তারপর আরও তিন দিন এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়, প্রত্যহই more and more excited—শেষ দিন আর নিজকে সম্বরণ করিতে পারিলেন না। Congressএর অন্যান্য Secretary এবং Presidentএর নিকট অনর্গল ফরাসী ভাষায় আমার কার্য্য সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন, তাহার মধ্যে tres jolie magnifique ইত্যাদির বহু সমাবেশ ছিল। পরিশেষে আমাকে



বলিলেন যে, আপনার বিষয়টি প্রত্যেক অক্ষরে নূতন; এই theory প্রচার করিতে অন্ততঃ দু'বৎসর লাগিবে। সব একেবারে প্রচার করিবেন না—এত surprise একেবারে লোকে মনে ধারণা করিতে পারিবে না—it is human nature. A বিন্দু পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, তারপর হঠাৎ মন ভাঙ্গিয়া B বিন্দুতে নামিয়া যায়। তারপর আরও বলিলেন যে, physicistরা physiology জানেন না; vice versa। তারপর আপনি যদি Psychologyর সমাবেশ

করেন, তাহা হইলে একেবারেই বুঝিতে পারিবে না। আর psychology, memory ইত্যাদি beyond physical science। এসব আনিলে লোকে আপনাকে dreamy মনে করিবে। এজন্য প্রথমে purely physical বিষয় প্রকাশ করা উচিত।

এখানে German, Russian. American ইত্যাদি অনেক বৈজ্ঞানিকের সাথে দেখা হয়। তাঁহারা সকলেই আমার পূর্ব্ব কার্য্য অতিশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছেন।

Helmholtzএর পদে Berlinএ এখন যিনি অধ্যাপক আছেন (Prof. Warburg), তিনি আমাকে বলিলেন, তাঁহার Laboratoryতে আর একজন বৈজ্ঞানিক নূতন গবেষণা করিতে আসিয়াছিলেন।

"The subject of coherer is very obscure and very interesting. I wish to work on it." তাহাতে Warburg তাঁহাকে বলিলেন, "It is undoubtedly very interesting ; but it is no longer obscure—there is a man called Bose who has left nothing more to be done."

আর একদিন Eiffel Towerএর উপরে উঠিতেছিলাম। আমি delegate বলিয়া বিনামূল্যে যাইবার অধিকারী। আমার সহধর্ম্মিণী delegate নহেন, সুতরাং তাঁহার জন্য ৫ ফ্রাঙ্ক দিতে হইল। ফরাসী ভাষায় আমার অধিকার ত জানেন। আমার অবস্থা দেখিয়া একজন ইংরাজী ভাষায় দক্ষ ফরাসী আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, can I be of any service ? এবং নিজের কার্ড দিলেন। আমার কার্ড দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, Bose ? Surely not Jagadish Bose ? এদেশে আমি জগদীশ বসু বলিয়া পরিচিত, কারণ আরও জার্ম্মান বসু আছে। পরে যখন জানিলেন আমিই তিনি, তখন যে-ব্যক্তি আমার নিকট হইতে বসুজায়ার জন্য টিকিটের মূল্য লইয়াছিল, তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন—আমাদের অতিথি বিখ্যাত

বিদেশী, তাঁহার নিকট টিকিটের মূল্য প্রার্থনা একান্ত দোকানদারী, ইত্যাদি। দেখিতে দেখিতে আরও লোকসমাগম। তাহাদের টিকিট বিক্রেতাকে যৎপরোনাস্তি অপমান, ইত্যাদি।

Dr. Wallerএর ভেকের চক্ষুতে বিদ্যুতের স্রোত সম্বন্ধে paper এবং আমার উক্ত বিষয় সম্বন্ধে কার্য্য এক সময়েই হয়। আশ্চর্য্য, তিনিও জীবনের 'অনুভূতির' রেখা পরিসর করিতে প্রয়াসী। তিনি প্রমাণ করিতেছেন যে, বৃক্ষেও অনুভূতি আছে, বীজেও রোপণ করিবার কয়দিন পর হইতে অনুভূতি শক্তি বিকাশ পায়। এই স্থানেই জীবন ও মরণের প্রভেদ রেখা। এস্থলে বলা আবশ্যক, অন্যান্য physiologistরা এই সামান্য বিষয়টি গলাধঃকরণ করিতে পারিতেছেন না। Wallerকে বাতুল শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করেন। এই সব কারণে উক্ত Wallerএর স্বভাব অতিশয় কোপন হইয়াছে। কাহারও সঙ্গে তর্ক হইলেই হাতাহাতির কাছাকাছি। উক্ত Wallerএর একজন সহকর্ম্মীর সহিত আমার একজন ভক্তের অল্পদিন হইল ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছে। Waller-ভক্ত একস্থানে বলিতেছিলেন, "দেখ 'অনুভূতির রেখা' কতদূর প্রসারিত—জীবন ও মরণের রেখা ৪র্থ দিন মৃত্তিকায় প্রোথিত বীজে আবদ্ধ।" তখন বসু-ভক্ত বলিলেন, তাহা নহে—বীজের রেখায়, এমন কি মৃত্তিকায় পর্য্যন্ত, উক্ত রেখা প্রসারিত। তাহার পর যাহা হইল, তাহা মনে করিতে পারেন। বন্ধুরা বলিলেন যে, অন্ততঃ কয়েক মাস পর্য্যন্ত Waller কিংবা তাহার ভক্তের সংস্পর্শে আসা আমার পক্ষে অস্বাস্থ্যকর হইবে। দৈবের লিখন কে খণ্ডাইতে পারে, উভয়ের সঙ্গে দেখা হইয়াছে। আমার নিবেদন জানাইলাম তাঁহাকে। তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়াছেন।

এই গেল পারিসের পালা। তাহার পর লণ্ডনে আসিয়াছি। এখানে একজন physiologist আমার কার্য্যের জনরব শুনিয়াই বলিলেন যে, কখনও হইতে পারে না, there is nothing common between the

living and non-living। আর একজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে ৪ ঘণ্টা কথা হইয়াছিল। প্রথম ঘণ্টায় ভয়ানক বাদানুবাদ, তারপর কথা না বলিয়া কেবল শুনিতে ছিলেন, এবং ক্রমাগত বলিতেছিলেন, this is magic! this is magic! তারপর বলিলেন, এখন তাঁহার নিকট সমস্তই নূতন, সমস্তই আলোক। আরও বলিলেন, এইসব সময়ে accepted হইবে, এখন অনেক বাধা আছে। আমার theory পূর্ব্ব সংস্কারের সম্পূর্ণ বিরোধী, সুতরাং কোন কোন physicists, কোন কোন chemists এবং অধিকাংশ physiologists আমার মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন কোন কোন মহামান্য বৈজ্ঞানিকের theory আমার মত গ্রাহ্য হইলে মিথ্যা হইবে, সুতরাং তাঁহারা বিশেষ প্রতিবাদ করিবেন। এবার সপ্তরথীর হস্তে অভিমন্যু বধ হইবে; আপনারা আমোদ দেখিবেন; "বাহবা জান্টিপি, বাহবা সক্রেটিস"; কিন্তু আপনাদের গরীব প্রতিনিধির প্রাণ ওষ্ঠাগত।

কিন্তু আপনাদের প্রতিনিধি রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিবে না। সে মনশ্চক্ষুতে দেখিবে, যে, তাহার উপর অনেক স্নেহদৃষ্টি আপাততঃ রহিয়াছে।

আমি সময়াভাবে সকলকে লিখিতে পারিলাম না, আমার বন্ধুজনকে সংবাদ দিবেন। আমি আসিবার পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত মহারাজ ত্রিপুরাধিপের নিকট পত্র লিখিয়াছিলাম—পত্র লিখিলে তাঁহাকে আমার সংবাদ দিবেন। বন্ধুজায়াকে আমার বিশেষ সম্ভাষণ জানাইবেন।

আপনার—

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

লণ্ডন

২রা নভেম্বর ১৯০০

বন্ধু,

তোমার দুখানা পত্র পাইয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি। আজ প্রায় দুমাস যাবত অহোরাত্র মনের ভিতর সংগ্রাম চলিতেছে। এখানে থাকিব, কি দেশে ফিরিয়া যাইব। তুমিও কি আমাকে প্রলুব্ধ করিবে?

ভাবিয়া দেখ। যদি সকলেই আমাদের বোঝা ফেলিয়া চলিয়া আসি, তবে কে ভার বহিবে?

আরও মনে করিয়া দেখ, তিন বৎসর পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট এক প্রকার অপরিচিত ছিলাম। তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডাকিলে। তার পর একটি একটি করিয়া তোমাদের অনেকের স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম। তোমাদের উৎসাহধ্বনিতে মাতৃস্বর শুনিলাম। আমার নিজের আশা ও দুরাশা অনেক কাল পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তোমাদের স্নেহের প্রতিদান করিতে আমি অসমর্থ। আমি অনেক সময়ে একেবারে শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়ি; কিন্তু তোমাদের জন্য আমি বিশ্রাম করিতে পারি না। তোমরা আমাকে এরূপ বাঁধিয়াছ। তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীনা চীরবসনপরিহিতা মূর্ত্তি সর্ব্বদা দেখিতে পাই। তোমাদের সহিত আমি তাঁহার অঞ্চলে আশ্রয় লই। আমি ভাষায় সে সব কথা কি করিয়া প্রকাশ করিব? তুমি বুঝিবে।

সাধারণতঃ লোকের যে-সব বন্ধন থাকে, তাহা হইতে আমি মুক্ত। কিন্তু আমি সেই অঞ্চল-ডোর ছেদন করিতে পারি না।

আমি অনেক সময়ে না ভাবিয়া লিখি। অনেক সময় বিনা চেষ্টায় মনে অনেক ভাব আসে। শেষে আশ্চর্য্য হই। সে-সব আমার অতীত; কে আমাকে এ-সব কথা শুনাইতেছেন?

আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে। দেশে ফিরিয়া আসিলে যে-সব বাধা পড়িবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমার অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিব।

গতকল্য Sir William Crookesএর নিকট হইতে একখানা চিঠি পাইয়াছি; তিনি লিখিয়াছেন, "I have read the most interesting account of your researches with extreme interest. I wonder whether I could induce you to deliver a lecture on these or kindred subjects of research before the Royal Institution. If you could do so, I shall be very glad to put your name down for a Friday Evening Discourse after Easter of 1901. I have a vivid recollection of the great pleasure you gave us all on the occassion when you lectured a few years ago."

Royal Institutionএ Friday Evening Discourse দিতে পারিলে আমি অতিশয় গৌরবান্বিত হইতাম। বিশেষতঃ সেস্থানে experiment দেখাইতে পারিলে আমার সমস্ত theory বুঝাইতে পারিতাম। অনেকে এইরূপ নূতন theory দেখিয়া এখন সম্পূর্ণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কেহ বলিলেন, "Why if this goes on, we

shall have to write entirely new text-books of Physics." সুতরাং এখন experiment দিয়া বুঝাইলে নূতন মত প্রচারের সুবিধা হইবে। নতুবা অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না। দুঃখের বিষয় এই যে Easterএর পূর্ব্বেই আমার ছুটি ফুরাইয়া আসিবে। ছুটি চাহিতে ইচ্ছা করে না, আর চাহিলেও পাইব কিনা সন্দেহ। এ দিকে সেই Dr. Waller, the great physiologistএর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি এখানকার প্রধান Physiological Societyতে বক্তৃতা করিতে আহূত হইয়াছি। Dr. Waller প্রথম প্রথম অতিশয় বিরোধী ছিলেন। পরিশেষে কতক কতক বুঝিতে পারিয়া অতিশয় excitedly বলেন, "It appears that your work will probably upset mine. Truth is truth and I don't care a d—, if I am proved to be in the wrong. So come and work; I will place my laboratory at your disposal. Teach me or let us work together."

আমার সম্মুখে কত কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে বলিতে পারি না। এ পর্য্যন্ত কিছু করিতে পারি নাই। কল প্রস্তুত করিতে অনেক সময় লাগিতেছে। এতদিনে অনেকের সহিত আলাপ হওয়াতে কার্য্য আরম্ভ করিবার সুবিধা হইতেছে। এখন দুই বৎসর এখানে থাকিতে পারিলে অনেকটা শেষ করিতে পারিতাম। Physiolgical Laboratory ইত্যাদি দেশে পাইব না। আমি কি করিব স্থির করিতে পারিতেছি না। এই সময়ে বাধা পড়িলে পুনরায় কয়েক বৎসর পর আরম্ভ করিতে অনেক সময় নষ্ট হইবে। আর এই সময়ে লোকের interest হইয়াছে, এখন করিতে পারিলেই ভাল হইত। আমি মনে করিতেছি যে, দেশে ফিরিয়া আসিয়াই দুবৎসর ছুটি লইয়া এদেশে থাকিব। তারপর প্রতি তিন বৎসর পর এক বৎসর ছুটি লইয়া এদেশে থাকিব।

যদি অপরের মুখাপেক্ষা না করিয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলে এইরূপে অনেকটা কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিব।

আমার যে অসুখ হইয়াছিল, তাহা এখন অনেকটা ভাল হইয়াছে। কিন্তু দেশে যাইবার পূর্ব্বে operation করা আবশ্যক হইবে। আমি আমার কতকগুলি paper শেষ করিয়া ডাক্তারের হস্তে জীবন অর্পণ করিব।

এখন তোমার বিষয়ে দু-একটি কথা লিখিব। তুমি যে cutting পাঠাইয়াছ, তাহাতে আমি একটুও সন্তুষ্ট হই নাই। তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, **আমি** তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতাগুলি কেন এরূপ ভাষায় লিখ যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে কতক বুঝিতে পারিবে। আর ভাবিয়া দেখিও, তুমি সার্ব্বভৌমিক। এদেশের অনেকের সহিত তোমার লেখা লইয়া কথা হইয়াছিল। একজনের সহিত কথা আছে (শীঘ্রই তিনি চলিয়া যাইবেন) যদি তোমার গল্প ইতিমধ্যে আসে তবে তাহা প্রকাশ করিব। Mrs. Knightকে অন্য একটি দিব। প্রথমোক্ত বন্ধুর দ্বারা লিখাইতে পারিলে অতি সুন্দর হইবে। তার পর লোকেনকে ধরিয়া translate করাইতে পার না? আমি তাহাকে অনেক অনুনয় করিয়া লিখিয়াছি।

তোমার নূতন লেখা অনেক দিন যাবৎ পাঠাও নাই, পাঠাইও। আমি মনে করি, তোমার কবিতা চিরকালের জন্য। তোমার লেখা আমাকে যেরূপ জ্বলন্ত করে, সেরূপ যেন অসংখ্য লোককে করিতে পারে।

তোমার
জগদীশ

বন্ধুজায়া এবং তোমার পুত্রকন্যাকে আমার সম্ভাষণ জানাইও।

লণ্ডন। ১৭ই মে, ১৯০১।

বন্ধু,

তুমি আমার সংবাদ জানিবার জন্য ব্যস্ত আছ। বক্তৃতার আগের দিন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত কি বলিব স্থির করিতে পারি নাই। এক ঘণ্টার মধ্যে Physiology, Physics, এবং Chemistryর দুরূহ শেষ মীমাংসা হইতে আরম্ভ করিয়া এই নূতন বিষয় কি করিয়া বুঝাইব? আর Experimentগুলিও অতি কঠিন। কতকগুলি কল শেষ দিন মাত্র প্রস্তুত হইল। তার পর একটি ঘটনা হইল, সে-কথা স্মরণ করিলে আমার এখনও রোমাঞ্চ হয়। আমি বৃহস্পতিবার দিন দুপ্রহরের সময় একেবারে নিরুদ্যম হইয়া শয়ন করিয়াছিলাম; আমার কি এক গভীর কষ্টে বুক ফাটিতেছিল; তোমাদের এতদিনের আশা কেবল আমার শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য নির্ম্মূল হইবে একথা মনে করিয়া যে কি গভীর যাতনা পাইয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। এমন সময় এক আশ্চর্য্য unscientific ঘটনা ঘটিল। হঠাৎ ছায়াময়ী মূর্ত্তি দেখিলাম, বিধবার বেশধারিণী, কেবল এক পার্শ্বের মুখ দেখিতে পাইলাম। সেই অতি শীর্ণ, অতি দুঃখিনীর ছায়া বলিল, 'বরণ করিতে আসিয়াছি'। তারপর মুহূর্ত্তের মধ্যে সব মিলাইয়া গেল।

জানি না, কেন এরূপ হইল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্ত হইতে আমার সব যন্ত্রণা দূর হইল। কি হইবে আর কিছুমাত্র ভাবি নাই। কি বলিব তাহাও আর ভাবিলাম না। তার পর দিন যখন শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত হইলাম তখন কিয়ৎক্ষণ মাত্র অনির্ব্বচনীয়ভাবে অভিভূত হইয়াছিলাম, তারপর যেন সমস্ত অন্ধকার কাটিয়া গেল, কে আমার মুখ দিয়া কথা বলাইল, জানি না; যাহা পূর্ব্বে ভাবি নাই তাহা মুহূর্ত্তে পরিস্ফুট হইল।

Electrician পাঠাই, কতক সংবাদ তাহাতে পাইবে। হিন্দুর সূক্ষ্ম বুদ্ধি একবার patronisingরূপে পূর্ব্বে শুনিয়াছি, আমি আমার সেই জাতীয় গুণের জন্য আজ অহঙ্কার করিব। কারণ, সেই পূর্ব্বপুরুষদের গুণে বঞ্চিত হইলে আমি এত তমসাচ্ছন্ন প্রহেলিকা ভেদ করিতে পারিতাম না। আমি অনেক সময়ে একেবারে আশ্চর্য্যে অভিভূত হইয়াছি, কে আমাকে যেন এক রহস্য হইতে অন্য রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া সত্য দেখাইতেছে! তবে হিন্দুর practical বুদ্ধি নাই, তাহার উত্তরও Electricianএ দেখিবে। আমার বক্তৃতার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে একজন অতি বিখ্যাত টেলিগ্রাফ কোম্পানির ক্রোড়পতি proprietor টেলিগ্রাফ করিয়া পাঠাইলেন, দেখা করিবার বিশেষ দরকার। আমি লিখিলাম, সময় নাই। তার উত্তর পাইলাম, "আমি নিজেই আসিতেছি"। অল্পক্ষণ মধ্যেই স্বয়ং উপস্থিত। হাতে Patent form। আমাকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, আপনি যেন বক্তৃতায় সব কথা খুলিয়া বলিবেন না, "There is money in it. Let me take out a patent for you. You do not know what money you are throwing away", ইত্যাদি। অবশ্য, "I will only take half share in the profit—I will fiinance it", ইত্যাদি। এই ক্রোড়পতি আরো কিছু লাভ করিবার জন্য আমার নিকট ভিক্ষুকের ন্যায় আসিয়াছে। বন্ধু, তুমি যদি এ দেশের টাকারউপর মায়া দেখিতে—টাকা—টাকা—কি ভয়ানক

সর্ব্বগ্রাসী লোভ! আমি যদি এই যাঁতাকলে একবার পড়ি, তাহা হইলে উদ্ধার নাই। দেখ আমি যে কাজ লইয়া আছি, তাহা বাণিজ্যের লাভালাভের উপরে মনে করি। আমার জীবনের দিন কমিয়া আসিতেছে, আমার যাহা বলিবার তাহারও সময় পাই না, আমি অসম্মত হইলাম। কিন্তু সেদিন আমার বক্তৃতা শুনিতে অনেক টেলিগ্রাফ কোম্পানির লোক আসিয়াছিল; তাহারা পারিলে আমার সম্মুখ হইতেই আমার কল লইয়া প্রস্থান করিত। আমার টেবিলে assistantএর জন্য হাতে লেখা নোট ছিল, তাহা অদৃশ্য হইল।

আমার বক্তৃতা এখনও প্রকাশ হইবে না, কারণ Royal Society আমাকে তথায় বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। They made a special case, for they never accept anything read before any other Society। সে দিন যত physiological expertরা থাকিবেন। Sir Michael Foster নিজে আমার paper communicate করিবেন। আমি experiment করিয়া দেখাইব।

তবে আমার সম্মুখে বহু বাধা আছে। প্রথম—Commercial interest। অনেক patent আমার কার্য্য দ্বারা ও আমার নূতন আবিষ্ক্রিয়াতে অকর্ম্মণ্য হইবে। দ্বিতীয়—যাহারা Coherer theory বিশ্বাস করেন, তাঁহারা বিশেষ আপত্তি করিবেন। তৃতীয়—Physiologistরা জীবন বলিয়া একটা নূতন অতি মহৎ একটা কিছু বুঝেন। তাঁহাদের বিজ্ঞান mere physics, একথা কোন মতেই স্বীকার করিতে চাহেন না। ৪র্থ—কোন কোন মূঢ় লোকে মনে করেন যে, বিজ্ঞান দ্বারা জীবনতত্ত্ব বাহির হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিবার আবশ্যক নাই। তাঁহারা অতিশয় পুলকিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া খ্রীষ্টবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকেরা কিছু তটস্থ হইয়াছেন। এজন্য আমি কোন কোন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব।

Dr. Waller, যিনি জীবনের শেষ লক্ষণ বাহির করিয়াছিলেন, তিনি অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইয়াছেন। সুতরাং আমাকে একাকী এত বিপক্ষের সহিত যুঝিতে হইবে। কি হইবে জানি না।

তবে যাঁহাদের কোন self interest নাই তাঁহারা অতিশয় উল্লসিত হইয়াছেন। তবে তাঁহারা বলেন, "You must remember that the greatest discovery of the last century—the mechanical equivalent of Heat by Joule—was rejected by the Royal Society as unscientific ; but twenty years after the Royal Society published the same paper in their transactions. You have brought forward a great discovery having far-reaching consequences. Have you the courage and persistency to fight for it and force it to be universally accepted ? You who see it so clearly alone can do it ; there is none else who can take up your work. If you leave it in its present state, it will be lost."

কি করিব বল ? আমার দেশে ফিরিবার সময় আসিয়াছে (আগামী September মাসে)। সেখানে সমস্ত কাজ ত বন্ধ হইবে। আমি সমস্ত মন দিয়া সমস্ত গোলমাল হইতে দূরে থাকিয়া যদি কার্য্য করিতে পারি, তবে আর দুই বৎসরে যদি কোনপ্রকারে কার্য্য সমাধা করিতে পারি। আমাকে যে আর ছুটি দিবে এরূপ বিশ্বাস হয় না। দেশে ফিরিলে কিরূপ কার্য্যের সুবিধা হইবে তাহার নমুনাস্বরূপ একখানা চিঠি পাঠাই। উক্ত হতভাগ্য আমার recommendationএ Research Scholarship পাইয়াছিল, তাহার উপর বিশেষ জুলুম! যদি কোন বিষয় একবার race questionএ দাঁড়ায়, তাহা হইলে শেষে কি হয় তাহা জান।

আমার বক্তৃতার শেষ অংশ তোমাকে পাঠাইতেছি। Sir William Crookes বলিলেন যে, Royal Institution হইতে যখন আমার বক্তৃতা প্রকাশিত হইবে, তখন যেন শেষের দুই পংক্তি quotation দিতে ভুলিয়া না যাই। "I have scarcely heard anything so grand।" Sir Robert Austen, the greatest authority on metals, আহ্লাদে অধীর হইয়া আমাকে বলিলেন, "I have all my life studied the properties of metals. I am happy to think that they have life"! তারপর বলিলেন, সে কথা আমাকে আবার শুনিতে দিন। তারপব বলিলেন, "Can you tell me whether there is a future life—what will become of me after my body dies ?"

বন্ধু, আমাদের যাহা অমূল্য রত্ন আছে তাহা ভুলিয়া মিছামিছি না বুঝিয়া হিন্দুয়ানী লইয়া গর্ব্ব করি। আমাদের প্রকৃত Inheritence বুঝাইয়া দাও, প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝাইয়া দাও।

আজ এখানেই শেষ কবি।

তোমার

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

লণ্ডন

১৫ই অক্টোবর, ১৯০১

বন্ধু,

তুমি লিখিয়াছ, আমার বন্ধুত্ব তোমাকে এমন প্রবল ও গভীরভাবে আকৃষ্ট করিবে, তাহা এক বৎসর পূর্ব্বে জানিতে না। হয়ত জান না যে, আমার অবস্থাও ঐরূপ। কেন আকৃষ্ট হইয়াছি তাহার কারণ এই যে হৃদয়ের অনেক আকাঙ্ক্ষা যাহা আমার মনেই থাকিত তাহা তোমার মুখে তোমার লেখাতে পরিস্ফুট দেখিতে পাই। নিরাশার মধ্যে কে মন বাঁধিতে পারে? তবুও এক বিশ্বাস যে আমরা একদিন আলোর সন্ধান পাইবই, সেই আশায় তোমাকে দেখিয়া বিশ্বস্ত হইয়াছি। দুই অভ্যন্তরের শত্রু হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে,—প্রথম মিথ্যা-অভিমানী স্বজাতি-বৎসল আর স্বার্থে সন্তুষ্ট স্বজাতিদ্রোহী। আমার মনে হয় এখন বিনয়ী, বিশ্বাসী, ধৈর্য্যশালী, স্বজাতিপ্রেমিকের সংখ্যা দিনদিন বর্দ্ধিত হইতেছে। তুমি ইহাদিগকে আকৃষ্ট করিও। এবং এক সূত্রে গ্রথিত করিও। তুমি যে নূতন বিদ্যাশ্রম খুলিয়াছ তাহাতে সুখী হইলাম। বৎসরে ২।৪টি পুরুষও যদি এইভাবে প্রণোদিত হয়, তাহা হইলে আমরা বিনষ্ট হইব না।

তুমি জান না তোমার পত্র পাইয়া আমি কিরূপ আশ্বস্ত হই। আমার পদে পদে কত বিঘ্ন তাহা তুমি মনেও করিতে পার না। আমি কখন কখন একেবারে নিরাশাস হই। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার কার্য্যে যত নূতনত্ব থাকিবে, সে-পরিমাণে বাধা পাইব। প্রচলিত যে-মত, যাহার ভিত্তিতে সমস্ত Electro-physiology স্থাপিত হইয়াছে, তাহার উপর হাত দিলে অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের কার্য্যের উপর হস্তক্ষেপ হয়।

অথচ সত্য অপলাপ করিয়া চুপ করিয়া থাকিলে কোন দিন সত্য প্রচারিত হইবে না। আর আমার কার্য্য এরূপ কঠিন যে, ইংলণ্ডে ২।৩ জন লোক ব্যতীত আমার শ্রোতামণ্ডলী নাই। তাহারাও পুরাতন মতের অবলম্বী। Physicist এবং physiologistদের মধ্যে অনেক কাল সংগ্রাম চলিয়াছে, এখন একে অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে চাহেন না।

আমাকে এজন্য সম্পূর্ণ একাকী কার্য্য করিতে হইবে, কার্য্যও এত বিস্তীর্ণ যে, অনেক সময় লাগিবে, কত সময় লাগিবে তাহা এখন বলা অসম্ভব। অর্থাৎ প্রতি বিষয় নূতন করিয়া স্থাপিত করিতে হইবে।

তোমাকে বলিয়াছি যে, আমি আমার থিওরির প্রত্যহই নূতন ও অত্যাশ্চর্য্য প্রমাণ পাইতেছি। ক্রমে ক্রমে অন্ধকারে আলোকরাশি দেখিতেছি। তুমি যদি এখানে থাকিতে তাহা হইলে তোমাকে দেখাইয়া বড় সুখী হইতাম। তুমি অনায়াসে বুঝিতে পার, এবং নিশ্চয়ই উৎসাহিত হইতে।

যাহা প্রমাণ দ্বারা এক মুহূর্ত্তে দেখাইতে পারি তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা দুরূহ। তবুও মনে করিতেছি যে, একখানা পুস্তক লিখিব, তাহাতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত experiment বিবৃত থাকিবে। তাহাও অনেক সময়সাপেক্ষ।

Prince Kropotkin সে-দিন বিশেষরূপে আমার সমস্ত experiment দেখিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় মনস্বী ইয়োরোপে দুর্লভ। তিনি সমস্ত দেখিয়া বলিলেন, "আপনার experiment এবং argument পরম্পরার মধ্যে সূচ্যগ্র প্রবেশ করাইবার ছিদ্র নাই। আপনি অবধ্য, কেহ আপনার কেশ স্পর্শ করিতে পারিবে না। আপনি অনেক আবরণ ছিন্ন করিয়াছেন, কিন্তু এজন্যই আপনাকে বহু প্রতিবাদ সহ্য করিতে হইবে।"

তোমার
জগদীশ

এবার B. Assn.এ যে নূতন paper পড়িয়াছি তাহা পাঠাই।

1, Birch Grove, Acton.
London W.
21st, March, 1902 (?)

বন্ধু,

তোমার পত্র পাইয়া আমি মুহূর্ত্তের জন্য এখানকার সংগ্রাম ক্ষেত্র হইতে তোমার শান্তিময় আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। ক্ষণেক কালের জন্য গভীর শান্তিতে হৃদয় পূর্ণ হইল। আমার সমস্ত হৃদয় মন তোমাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য আকুল। তুমি যাহা করিতেছ তাহাই শ্রেষ্ঠ। এবিষয়ে আগামী বারে অনেক লিখিব। আজ আমার কর্ণে এখনও রণ-ক্ষেত্রের দুন্দুভি বাজিতেছে, কারণ এইমাত্র আমি সংগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। তুমি আমার জয়-সংবাদে সুখী হইবে।

তোমরা চিন্তিত হইবে বলিয়া আমি এখানকার সব কথা খুলিয়া লিখি নাই। ইযোরোপের একজন প্রধান Physiology-তে অগ্রণী, Burden Sandersonএর নাম শুনিয়াছ। Sanderson এবং Waller এই দুইজন Physiology-র উচ্চ সিংহাসন অনেককাল যাবৎ নির্ব্বিবাদে অধিকার করিয়াছিলেন।

আমি Royal Societyতে যখন বক্তৃতা করি, তাঁহাকে দেখাই যে যদি নির্জ্জীব ও জন্তুর responsivenessএর একই আধার হয় তাহা হইলে মধ্যবর্ত্তী উদ্ভিদের responseও একই রকম হইবে। তাহাতে Burden Sanderson উঠিয়া বলিলেন, আমি উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে সমস্ত জীবন অনুসন্ধান করিয়াছি, কেবল লজ্জাবতী লতা সাড়া দেয় কিন্তু That ordinary plants should give electrical response is simply impossible. *It cannot be.* আরও বলিলেন, Prof. Bose has applied physiological terms in describing his physical effects on metals. Though his paper is printed yet we hope he will revise it and use physical terms and not

use *our* physiological expressions in describing phenomena of dead matter.

তাহার উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম Scientific terms কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে, আর এই সব phenomena এক সুতরাং আমি একের মধ্যে বহুত্ব প্রচারের বিরোধী।

ফল হইল যে আমার সেই Paper প্রকাশ বন্ধ হইল। কয়জন Physiologist এর প্রাণপণ চেষ্টায় Conspiracy of silence হইল। কারণ আমার এই থিয়োরী স্থির হইলে উক্ত বৈজ্ঞানিকদের theory একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহারা মনে করিলেন, আমার দেশে ফিরিয়া যাইবার সময় নিকটবর্ত্তী; একবার আমি সমুদ্র পার হইলে বিপদ কাটিয়া যাইবে।

তখন তোমাদের উৎসাহে এখানে থাকা স্থির করিলাম। কিন্তু কি করিয়া আমার experiment প্রকাশ করিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। এ বিষয়ে একেবারে নিরাশ্বাস হইয়াছিলাম। কারণ "whom are we to believe—Physiologists who have grown grey in working out their special subjects—or a young *physicist* who comes all of a sudden to upset all our convictions ?" সাধারণের মত এইরূপ ছিল।

ইতিমধ্যে Linnean Societyর President, Prof. Vinesএর সহিত আমার দৈবক্রমে দেখা হয়। ইনি আধুনিক Vegetable Physiologistsএর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। আর Linnean Society, Biology সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান Society। Prof. Vines একদিন Prof. Hornes (successor of Huxley at the Royal College of Science)-কে সঙ্গে করিয়া আমার experiment দেখিতে আসেন। তাঁহারা এই সব দেখিয়া কিরূপ চমৎকৃত হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। Prof. Hornes পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন, "I wish

Huxley had been living now, he would have found the dream of his live fulfilled".

তাহার পর Vines, as President of Linnean Society, আমাকে উক্ত সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন।

সমবেত Physiologist-Biologist-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী, তাহার মধ্যে তোমার বন্ধু একাকী এই প্রতিপক্ষকূলের সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত। ১৫ মিনিটের মধ্যেই বুঝিতে পারিলাম যে রণে জয় হইয়াছে। Bravo! Bravo! ইত্যাদি অনেক উৎসাহবাক্য শুনিলাম। বক্তৃতার পর President তিনবার উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার আছে কি? একেবারে নিরুত্তর। তাহার পর Prof. Hartog উঠিয়া বলিলেন যে, we have nothing but admiration for this wonderful piece of work. Presidentও অনেক সাধুবাদ করিলেন।

সুতরাং এতদিন পর আমার এই প্রথম সংগ্রামে কৃতকার্য্য হইয়াছি। আরও এখন অনেক করিবার আছে। আমি কি করিব বুঝিতে পারি না। আমি একান্ত শ্রান্ত, এবং আমার সমস্ত মন এখন নির্জ্জনে যাইবার জন্য ব্যাকুল।

কিন্তু আমি যে অগ্নি জ্বালাইয়াছি তাহার ইন্ধন আরও অনেক দিন জোগাইতে হইবে।

তুমি মহারাজাকে আমার এই সংবাদ জানাইও। তোমরা যদি আমার এখানে থাকিবার উপায় না করিতে—তাহা হইলে আমাকে নিষ্ফল-প্রয়াস হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত।

বন্ধু, আমার পরিপূর্ণ হৃদয়ের ভালবাসা প্রেরণ করিতেছি।

তোমাদের
জগদীশ

তোমার জন্য John Chinaman পাঠাইতেছি। পড়িয়া দেখিও। আমরা স্বর্ণ ফেলিয়া ইয়োরোপীয় ভস্ম লেপন করিতেছি।

২৯-৬-১৯০৪

বন্ধু,

তোমার শারীরিক অবস্থা কিরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে-সম্বন্ধে যে নিরুত্তর! ইঁহার অর্থ কি? তুমি যদি সম্পূর্ণরূপে সারিয়া না আইস তবে তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া আছে।

তোমার সহিত দেখা কবে হইবে? আমার মনটা একটু বিষন্ন আছে, একটা বড় কিছু লইয়া এখন থাকিতে চাহি, আমার নিজের কাজ ত একরূপ বন্ধ। কারণ ১৯টি Papers লিখিয়াছি, তাহার একটাও প্রকাশিত হইতে পারিতেছে না, কি হইল তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। বই লিখিব মনে করি, কিন্তু সেই পুরাতন লেখা এখন দেখিতে ইচ্ছা করে না।

ভাল কথা, আমার যে প্রতিদ্বন্দ্বী আমার আবিষ্ক্রিয়া চুরি করিয়াছিল, সে একখানা পুস্তক লিখিয়াছে, তাহাতে লেখা আছে যে, পূর্ব্বে লোকে মনে করিত যে, কেবল sensitive plantএ সাড়া দেয়; "But these notions are to be extended and we are to recognise that *any* vegetable protoplasm gives electric response."

"I have used all kinds of vegetable protoplasms."

"We are :to recognise"; কাহার discoveryর দ্বারা ইহা হইয়াছে তাহার কোন উল্লেখ নাই।

তারপর আমার পুস্তকে physiologistদের একটা প্রকাণ্ড ভুল ধরিয়া দিয়াছিলাম—আমার আবিষ্কার হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে, তাহাদের গোড়ায় গলদ—যাহা তাহারা negative বলে তাহা positive। ইহা অপেক্ষা সাংঘাতিক আর কি ভুল হইতে পারে? তাহার উত্তরে প্রতিদ্বন্দ্বী লিখিয়াছে (আমার নাম করিতে নাই—আমার নাম physicist)—

"But in the present state of our physiological literature, is it wise to attempt to use the proper expression? No doubt the confusion is very great, no doubt the main bulk of our electro-physiological literature is totally unintelligible to physicists. Shall we not however, lay the foundation of a further mass of worse-confounded confusion by any sudden and unauthorised endeavour to call white white and black black, when for the last twenty or thirty years our rerders have been content to call white black and black white?"

আমরা এতদিন Whiteকে Black বলিয়াছি। Unauthorised physicist আসিয়া আমাদিগকে শিখাইতে চায় white is white! কি ভয়ানক!

তুমি কি মনে করিতে পার, বিলাতের বিজ্ঞান এখন কিরূপ অবস্থায় পড়িয়াছে?

ইহা হইতে বুঝিতে পারিবে যে, কিরূপ বাধার সহিত আমায় সংগ্রাম করিতে হয়। এসব কথা তোমাকে লিখিয়া, বোঝা অনেকটা দূর হইল, কয়দিন পর পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিব।

স্কুলের কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। ভাল কথা, সেদিন আমার কোন বিশেষ বন্ধু তাঁহার সন্তানের শিক্ষার জন্য আমার পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। দেশী লোকদের জন্য ৫৲টাকার পরিবর্তে ১০৲টাকা বেতন St. Xaviersএ ধার্য্য হইয়াছিল। ইহাতে দেশীয় কর্তৃপক্ষগণ পরম সৌভাগ্য মনে করিতে-

ছিলেন। এখন সরকার হইতে হুকুম আসিয়াছে যে, দেশীয়দিগকে যেন আর না ভর্ত্তি করা হয়। Loretto হইতে—এক চিঠি আসিয়াছে মেয়েগুলিকে দূর করিবার জন্য। এখন কথা, কোন্ নেটিভ্ স্কুলে ছেলে-মেয়ে দেওয়া যায়। হায়, এত অপর্য্যাপ্ত রাজভক্তির এই পুরস্কার!

মায়াবতীতে একজন আমেরিকান আসিয়াছে, সে কল-কারখানায় বিশেষ মজবুত। আমার ইচ্ছা তুমি শীতকালে কয়মাসের জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্কুলে আনাও।

সদানন্দ মৃতপ্রায় হইয়া আসিয়াছেন। দিনু ও রথীর কি পরিবর্ত্তন দেখিলে? সদানন্দ তোমার উৎসাহপূর্ণ চিঠির জন্য উন্মুখ হইয়া আছেন। বুঝিতে পারিলাম যে, শেষ মুহূর্ত্তে অনেকে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়ার জন্য খরচ অনেক বেশী লাগিয়াছে।

Sister নিবেদিতা ও Christine তোমার বাড়ীতে স্কুল খুলিবার জন্য বিশেষরূপে লাগিয়াছেন। তবে ছাত্রী জোগাড় কি করিয়া করিবেন জানি না—আর টাকারও দরকার মনে হয়। নিবেদিতা আশা করিতেছেন যে, তাঁহার নূতন পুস্তক বিক্রয় দ্বারা এই অভাব কতকটা দূর হইবে। তুমি শুনিয়া সুখী হইবে যে, বিলাতে Web of Indian Life পুস্তকের বহু প্রশংসা হইতেছে—ভারত-বিদ্বেষী কাগজেও লিখিতেছে যে Kipling ইত্যাদির ভারতবর্ষের চিত্র হয় ত ঠিক নয়, ভিতরের যথার্থ চিত্র এইরূপই হইবে। সম্ভবতঃ এই পুস্তক বহুল প্রচার হইবে, আমেরিকান এডিশন্ ইহার মধ্যেই বাহির হইয়াছে। তবে publisherএর নিকট হইতে পয়সা আদায় করা কঠিন।

বঙ্গদর্শনের ইউনিভারসিটির বিল পড়িয়া সুখী হইয়াছি। ভাষার ইঙ্গিতে অতি সুন্দর হইয়াছে।

তোমার
জগদীশ

জগদীশচন্দ্রের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের দুইখানি পত্র

ওঁ

শিলাইদহ

২১শে মে

১৯০১

বন্ধু,

অনেকদিন থেকে তোমার চিঠির জন্যে প্রত্যাশিত হয়েছিলুম। আজ পেয়ে খুব খুসী হলুম। পাছে তোমার কাজের লেশমাত্র ক্ষতি হয় সেইজন্যে আমি তোমাকে কখন তাগিদ করি নে।

পৃথিবীকে সর্ব্বত্র চিম্‌টি কাটবার যে উপায় তুমি বের করেছ সেইটে পড়ে গর্ব্ব অনুভব করা গেল। এতদিন জড় পদার্থ আমাদের বিধিমতে পীড়ন করে আস্‌ছিলেন এবারে তোমার কল্যাণে তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারব। তাদের দেদার চিম্‌টি কাট আর বিষ খাওয়াও— ওগুলোকে কোনমতে ছেড়োনা। এখন থেকে আদালতে যদি অপরাধী জড় পদার্থের বিচার হয় তাহলে বিচারক তাদের চিম্‌টি দণ্ড বিধান কর্ত্তে পারবে।

যদি পাঁচ ছ বৎসর তোমাকে বিলাতে থাকৃতে হয় তুমি তারই জন্যে প্রস্তুত হোয়ো, অনর্থক ভারতবর্ষের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে এসে কাজ নষ্ট কোরো না। তুমি আমাকে একটু বিস্তারিত করে লিখো এই ৫।৬ বৎসর সেখানে থাকতে গেলে ঠিক কি পরিমাণ সাহায্য তোমার দরকার হবে। আমার কাছে লেশমাত্র সঙ্কোচ কোরো না। বৎসরে তোমাকে কত পরিমাণে দিলে তুমি বিনা বেতনে দীর্ঘ ছুটি নিতে পার আমাকে লিখো। যাতে

তুমি সচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত চিত্তে সেখানে থেকে তোমার কাজ করতে পার আমি বোধ হয় তার ব্যবস্থা করে দিতে পারব। তুমি আমাকে খোলসা করে লিখো।

লোকেন যাত্রা করে বেরিয়ে পড়েছে। এতদিনে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করেছে। তার প্রতি আমার ঈর্ষ্যা হচ্চে। আমার ভারি ইচ্ছা করচে আমরা জন দুই তিনে মিলে তোমার ওখানে মাছের ঝোল খেয়ে আগুনের কাছে ঘরের কোণে ঘণ্টা দুই তিনের জন্যে জমিয়ে বসি। আর একবার আমি লেকেনের সঙ্গে লণ্ডনে গিয়েছিলুম— তখন তোমরা কেউ সেখানে ছিলেনা— আমি দুদিন থেকেই নিতান্ত ধিক্কার সহকারে সেখান থেকে দৌড় দিয়েছিলুম। কিন্তু তোমার যদি বিলাতে পাঁচ ছয় বৎসর থাকা হয় তাহলে কি একবার সেখানেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে না? আশা করচি দেখা হবে। হয় ত কোন দিন তোমার দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দে ঘা পড়বে।

বঙ্গদর্শন প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে। নানা হাঙ্গামে আমি মন দিতে পারি নি— অনেক ভুলচুক থেকে গেছে। আমার একটা কবিতা এমন বিকৃত হয়ে গেছে তার মানেই বোঝা যায় না। তোমাকে পাঠিয়ে দিতে বলে দেব।

তোমার রবি

[এপ্রিল ১৯০২]

ওঁ

বন্ধু,

তোমাকে চিঠি লিখতে পারি নাই কিন্তু কত দিন যে তোমাকে লইয়া কাটাইয়াছি, হৃদয়ের অন্তরঙ্গ প্রদেশে তোমাকে অনুভব করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। আজ তোমার জয়সংবাদ পাইয়া নবমেঘগর্জ্জন-পুলকিত ময়ূরের মত আমার হৃদয় নৃত্য করিতেছে। মাতাল মদের বোতলের শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত যেমন পান করে তোমার চিঠির ভিতর হইতে আমি সমস্ত মত্ততাটুকু একেবারে উপুড় করিয়া ধরিয়া চাখিবার চেষ্টা করিতেছি। বহু বিলম্বে তোমার জয় হইলেও আমি হতাশ্বাস হইতাম না— তবু নগদ পাওনার প্রবল আনন্দ।

গত কাল প্যারিসে তোমার বলিবার কথা ছিল— নিশ্চয় সেখানে তোমার জয় হইয়াছে— তোমার সেই বক্তৃতাসভায় আমাদের হৃদয় উপস্থিত ছিল।

য়ুরোপের মাঝখানে ভারতবর্ষের জয়ধ্বজা পুঁতিয়া তবে তুমি ফিরিয়ো —তাহার আগে তুমি কিছুতেই ফিরিয়ো না। গারিবাল্ডি যেমন জয়ী হইয়া রণক্ষেত্র হইতে কৃষিক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তেমনি তোমাকেও অভ্রভেদী জয়তোরণের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের গভীর নির্জ্জনতার মধ্যে দারিদ্র্যের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইবে— তখন তোমাকে সকলে খুঁজিয়া লইবে তুমি কাহাকেও খুঁজিবে না— তখন তোমার কাছে আসিতে ভারতবর্ষের কাছে সকলে মাথা নত করিবে— বিদেশী ছাত্রকে ডাকিবার জন্য বিদেশের প্ল্যানে প্রাসাদ রচনা করিলে চলিবে না— মাঠের

মধ্যে কুটীরের মধ্যে মৃগচর্ম্মে যে বসিবে সেই তোমাকে পাইবে। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে এমন প্রবল তেজে জয়ী করিবার ক্ষমতা বিধাতা আমাদের আর কাহারো হাতে দেন নাই— তোমাকেই সেই মহাশক্তি দিয়াছেন। যেদিন স্নিগ্ধ পবিত্র প্রভাতে প্রাতঃস্নান করিয়া কাষায় বসন পরিয়া তোমার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে তুমি আসিয়া বসিবে— সেদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ তোমার জয়শব্দ উচ্চারণ করিবার জন্য সেদিনকার পুণ্য সমীরণে এবং নির্ম্মল সূর্য্যালোকের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন। ভারতবর্ষের সমস্ত শূন্য প্রান্তর এবং উদার আকাশ তৃষিত বক্ষের ন্যায় ব্যাকুল প্রসারিত বাহুর ন্যায় সেই দিনের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে আমরাও সেই দিনের জন্য তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের রাজা যে কেহ হউক, আমাদের আকাশ, আমাদের দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ কে কাড়িয়া লইবে? আমাদের জ্ঞানের অবকাশ, আমাদের ধ্যানের অবকাশ, আমাদের দারিদ্র্যের অবকাশ হইতে আমাদিগকে কে বঞ্চিত করিতে পারিবে? আমাদের দেশে যে পরমা মুক্তির অচল প্রতিষ্ঠা হইয়াছে— তাহা স্তব্ধ, তাহা নির্ব্বাক্, তাহা দীন, তাহা দিগম্বর, তাহা শাশ্বত— তাহাকে বলীর বাহু ও ক্ষমতা-শালীর স্পর্দ্ধা স্পর্শ করিতে পারে না— ইহাই চিত্তের মধ্যে স্থিরনিশ্চয়রূপে জানিয়া শান্তমনে সন্তোষের সহিত প্রসন্নমুখে ইহারই বিরলভূষণ বিশালতার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। বিদেশীর কটাক্ষে আর ভ্রূক্ষেপ করিব না— তাহার ধিক্কারে আর কর্ণপাত করিব না— তাহার কাছ হইতে যে বর্ব্বর রংচং বসনভূষণ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম তাহা তপোবনের দ্বারে আবর্জ্জনার মত ফেলিয়া দিয়া প্রবেশ করিব।

পত্রের মধ্যে আমাদের আশ্রমবৃক্ষ হইতে কালিদাসের শিরীষ পুষ্প তোমাকে পাঠাইলাম।

তোমার রবি

আচার্য্য জগদীশের জয়বার্ত্তা

॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

নিজের প্রতি শ্রদ্ধা মনের মাংসপেশী। তাহা মনকে ঊর্দ্ধে খাড়া করিয়া রাখে এবং কর্ম্মের প্রতি চালনা করে। যে জাতি নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতে বসে, সে চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়ে।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাব ভারতবাসীর পক্ষে গুরুতর অভাব নহে; কারণ, ভারতবর্ষে রাষ্ট্রতন্ত্র তেমন ব্যাপক ও প্রাণবৎ ছিল না। মুসলমানের আমলে আমরা রাজ্য-ব্যাপারে স্বাধীন ছিলাম না, কিন্তু নিজেদের ধর্ম্মকর্ম্ম, বিদ্যাবুদ্ধি ও সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিবার কোন কারণ ঘটে নাই।

ইংরাজের আমলে আমাদের সেই আত্মশ্রদ্ধার উপরে ঘা লাগিয়াছে। আমরা সুখে আছি, স্বচ্ছন্দে আছি, নিরাপদে আছি; কিন্তু আমরা সকল বিষয়েই অযোগ্য, এই ধারণা বাহির হইতে ও ভিতর হইতে আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে। এমন আত্মঘাতিধারণা আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না।

নিজের প্রতি এই শ্রদ্ধা রক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা লড়াই চলিতেছে। ইহা আত্মরক্ষার লড়াই। আমাদের সমস্তই ভাল, ইহাই আমরা প্রাণপণে ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই

চেষ্টার মধ্যে যেটুকু সত্য আশ্রয় করিয়াছে, তাহা আমাদের মঙ্গলকর, যেটুকু অন্ধভাবে অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিতেছে, তাহাতে আমাদের ভাল হইবে না। জীর্ণবস্ত্রকে ছিদ্রহীন বলিয়া বিশ্বাস করিবার জন্য যতক্ষণ চক্ষু বুজিয়া থাকিব, ততক্ষণ শেলাই করিতে বসিলে কাজে লাগে।

আমরা ভাল, একথা রটনা করিবার লোক যথেষ্ট জুটিয়াছে। এখন এমন লোক চাই, যিনি প্রমাণ করিবেন, আমরা বড়। আচার্য্য জগদীশ বসুর দ্বারা ঈশ্বর আমাদের সেই অভাব পূরণ করিয়াছেন। আজ আমাদের যথার্থ গৌরব করিবার দিন আসিয়াছে,—লজ্জিত ভারতকে যিনি সেই সুদিন দিযাছেন, তাঁহাকে সমস্ত অন্তঃকরণেব সহিত প্রণাম করি।

আমাদের আচার্য্যের জয়বার্ত্তা এখনো ভারতবর্ষে আসিয়া পৌছে নাই, য়ুরোপেও তাঁহার জয়ধ্বনি সম্পূর্ণ প্রচার হইতে এখনো কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। যে সকল বৃহৎ আবিষ্কারে বিজ্ঞানকে নূতন করিয়া আপন ভিত্তি স্থাপন করিতে বাধ্য করে, তাহা একদিনেই গ্রাহ্য হয় না। প্রথমে চারিদিক হইতে যে বিরোধ জাগিয়া উঠে, তাহাকে নিরস্ত করিতে সময় লাগে; সত্যকেও সুদীর্ঘকাল লড়াই করিয়া আপনার সত্যতা প্রমাণ করিতে হয়।

আমাদের দেশে দর্শন যে পথে গিয়াছিল, য়ুরোপে বিজ্ঞান সেই পথে চলিতেছে। তাহা ঐক্যের পথ। বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত এই ঐক্যের পথে গুরুতর যে কয়েকটি বাধা পাইয়াছে, তাহার মধ্যে জড় ও জীবের প্রভেদ একটি। অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষায় হক্‌স্‌লি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই প্রভেদ লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। জীবতত্ত্ব এই প্রভেদের দোহাই দিয়া পদার্থতত্ত্ব হইতে বহুদূরে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে।

আচার্য্য জগদীশ জড় ও জীবের ঐক্যসেতু বিদ্যুতের আলোকে আবিষ্কার করিয়াছেন, আচার্য্যকে কোন কোন জীবতত্ত্ববিদ্ বলিয়াছিলেন,

আপনি ত ধাতব-পদার্থের কণা লইয়া এতদিন পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু যদি আস্ত একখণ্ড ধাতুপদার্থকে চিম্‌টি কাটিয়া তাহার মধ্য হইতে এমন কোন লক্ষণ বাহির করিতে পারেন, জীবশরীরে চিম্‌টির সহিত যাহার কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবে আমরা বুঝি।

জগদীশবাবু ইহার উত্তর দিবার জন্য এক নূতন কল বাহির করিয়াছেন। জড়বস্তুকে চিম্‌টি কাটিলে যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, এই কলের সাহায্যে তাহার পরিমাণ স্বত লিখিত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদের শরীরে চিম্‌টির ফলে যে স্পন্দনরেখা পাওয়া যায়, তাহার সহিত এই লেখার কোন প্রভেদ নাই।

জীবনের স্পন্দন যেরূপ নাড়ীদ্বারা বোঝা যায় সেইরূপ জড়েরও জীবনী শক্তির নাড়ীস্পন্দন এই কলে লিখিত হয়। জড়ের উপর বিষপ্রয়োগ করিলে তাহার স্পন্দন কিরূপে বিলুপ্ত হইয়া আসে, এই কলের দ্বারা তাহা চিত্রিত হইয়াছে।

বিগত ১০ই মে তারিখে আচার্য্য জগদীশ রয়াল ইন্‌ষ্টিট্যুশনে বক্তৃতা করিতে আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল— যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক তাড়নায় জড় পদার্থের সাড়া (The response of inorganic matter to mechanical and electrical stimulus)। এই সভায় যথাক্রমে লর্ড রেলি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, কিন্তু প্রিন্স ক্রপট্‌কিন্‌ এবং বৈজ্ঞানিক সমাজের প্রতিষ্ঠাবান্‌ লোকেরা অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

এই সভায় উপস্থিত কোন বিদুষী ইংরাজ মহিলা, সভার যে বিবরণ আমাদের নিকট পাঠইয়াছেন, নিম্নে তাহা হইতে স্থানে স্থানে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

সন্ধ্যা নয়টা বাজিলে দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং বসু-জায়াকে লইয়া সভাপতি সভায় প্রবেশ করিলেন। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী অধ্যাপকপত্নীকে

সাদরে অভ্যর্থনা করিল। তিনি অবগুণ্ঠনাবৃতা এবং শাড়ী ও ভারতবর্ষীয় অলঙ্কারে সুশোভনা। তাঁহাদের পশ্চাতে যশস্বী লোকের দল, এবং সর্বপশ্চাতে আচার্য্য বসু নিজে। তিনি শান্ত নেত্রে একবার সমস্ত সভার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অতি স্বচ্ছন্দে সমাহিত ভাবে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তাঁহার পশ্চাতে রেখাঙ্কন-চিত্রিত বড় বড় পট টাঙান রহিয়াছে। তাহাতে বিষপ্রয়োগে, শ্রান্তির অবস্থায়, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি আক্ষেপে, উত্তাপের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্নায়ু ও পেশীর এবং তাহার সহিত তুলনীয় ধাতুপদার্থের স্পন্দনরেখা অঙ্কিত রহিয়াছে। তাঁহার সম্মুখের টেবিলে যন্ত্রোপকরণ সজ্জিত।

তুমি জান, আচার্য্য বসু বাগ্মী নহেন। বাক্যরচনা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য নহে ; এবং তাঁহার বলিবার ধরণও আবেগে ও সাধ্বসে পূর্ণ। কিন্তু সে রাত্রে তাঁহার বাক্যের বাধা কোথায় অন্তর্ধান করিল। এত সহজে তাঁহাকে বলিতে আমি শুনি নাই। মাঝে মাঝে তাঁহার পদবিন্যাস গাম্ভীর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল,—এবং মাঝে মাঝে তিনি সহাস্যে সুনিপুণ পরিহাস-সহকারে অত্যন্ত উজ্জ্বল সরলভাবে বৈজ্ঞানিক ব্যূহের মধ্যে অস্ত্রের পর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি রসায়ন, পদার্থতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাপ্রশাখার ভেদ অত্যন্ত সহজ উপহাসেই যেন মিটাইয়া দিলেন।

তাহার পরে, বিজ্ঞানশাস্ত্রে জীব ও অজীবের মধ্যে যে সকল ভেদনিরূপক সংজ্ঞা ছিল, তাহা তিনি মাকড়সার জালের মত ঝাড়িয়া ফেলিলেন। যাহার মৃত্যু সম্ভব, তাহাকেই ত জীবিত বলে ;—অধ্যাপক বসু একখণ্ড টিনের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে দাঁড় করাইয়া আমাদিগকে তাহার মরণাক্ষেপ দেখাইতে প্রস্তুত আছেন, এবং বিষপ্রয়োগে যখন তাহার অন্তিম দশা উপস্থিত, তখন ঔষধপ্রয়োগে পুনশ্চ তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিতে পারেন।

অবশেষে অধ্যাপক যখন তাঁহার স্বনির্ম্মিত কৃত্রিম চক্ষু সভার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং দেখাইলেন, আমাদের চক্ষু অপেক্ষা তাহার শক্তি অধিক, তখন সকলের বিস্ময়ের অন্ত রহিল না।

ভারতবর্ষ যুগে যুগে যে মহৎ ঐক্য অকুণ্ঠিতচিত্তে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, আজ যখন সেই ঐক্যসংবাদ আধুনিক কালের ভাষায় উচ্চারিত হইল, তখন আমাদের কিরূপ পুলকসঞ্চার হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। মনে হইল, যেন বক্তা নিজের নিজত্ব-আবরণ পরিত্যাগ করিলেন, যেন তিনি অন্ধকারের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন,—কেবল তাঁহার দেশ এবং তাঁহার জাতি আমাদের সম্মুখে উত্থিত হইল,—এবং বক্তার নিম্নলিখিত উপসংহারভাগ যেন সেই তাহারই উক্তি!

I have shown you this evening the autographic records of the history of stress and strain in both the living and non-living. How similar are the two sets of writings, so similar indeed that you cannot tell them one from the other! They show you the waxing and waning pulsations of life—the climax due to stimulants, the gradual decline of fatigue, the rapid setting in of death-rigor from the toxic effect of poison.

It was when I came on this mute witness of life and saw an all pervading unity that binds together all things—the mote that thrills on ripples of light, the teeming life and earth on the radiant suns that shine on it—it was then that for the first time I understood the message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago—

"They who behold the One, in all the changing manifoldness of the universe, unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else."

বৈজ্ঞানিকদের মনে উৎসাহ ও সমাজের অগ্রণীদের মধ্যে শ্রদ্ধা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সভাস্থ দুই একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী ধীরে ধীরে আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার উচ্চারিত বচনের জন্য ভক্তি ও বিস্ময় স্বীকার করিলেন।

আমরা অনুভব করিলাম যে, এতদিন পরে ভারতবর্ষ—শিষ্যভাবেও নহে, সমকক্ষভাবেও নহে, গুরুভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সভায় উত্থিত হইয়া আপনার জ্ঞানশ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিল,—পদার্থতত্ত্বসন্ধানী ও ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা পরিস্ফুট করিয়া দিল।

লেখিকার পত্র হইতে সভার বিবরণ যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অহঙ্কার বোধ করি নাই। আমরা উপনিষদের দেবতাকে নমস্কার করিলাম; ভারতবর্ষের যে পুরাতন ঋষিগণ বলিয়াছেন "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি" এই যাহা কিছু সমস্ত জগৎ প্রাণেই কম্পিত হইতেছে, সেই ঋষিমণ্ডলীকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া বলিলাম, হে জগদ্‌গুরুগণ, তোমাদের বাণী এখনও নিঃশেষিত হয় নাই, তোমাদের ভস্মাচ্ছন্ন হোমহুতাশন এখনো অনির্ব্বাণ রহিয়াছে, এখনো তোমরা ভারতবর্ষের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছ! তোমরা আমাদিগকে ধ্বংস হইতে দিবে না, আমাদিগকে কৃতার্থতার পথে লইয়া যাইবে। তোমাদের মহত্ত্ব আমরা যেন যথার্থভাবে বুঝিতে পারি। সে মহত্ত্ব অতি ক্ষুদ্র আচারবিচারের তুচ্ছ সীমার মধ্যে বদ্ধ নহে,—আমরা অদ্য যাহাকে "হিঁদুয়ানি" বলি, তোমরা তাহা লইয়া তপোবনে বসিয়া কলহ করিতে না, সে সমস্তই পতিত ভারতবর্ষের আবর্জনা মাত্র;—তোমরা যে অনন্তবিস্তৃত লোকে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে, সেই লোকে যদি আমরা চিত্তকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারি, তবে আমাদের জ্ঞানের দৃষ্টি গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে প্রতিহত না হইয়া বিশ্বরহস্যের অন্তরনিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিবে। তোমাদিগকে স্মরণ করিয়া যতক্ষণ

আমাদের বিনয় না জন্মিয়া গর্ব্বের উদয় হয়, কর্ম্মের চেষ্টা জাগ্রত না হইয়া সন্তোষের জড়ত্ব পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, এবং ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের উদ্যম ধাবিত না হইয়া অতীতের মধ্যে সমস্ত চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া লোপ পায়, ততক্ষণ আমাদের মুক্তি নাই।

আচার্য্য জগদীশ আমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি বিজ্ঞান-রাজ্যে যে পথের সন্ধান পাইয়াছেন, সে পথ প্রাচীন ঋষিদিগের পথ—তাহা একের পথ। কি জ্ঞানে বিজ্ঞানে, কি ধর্ম্মে কর্ম্মে, সেই পথ ব্যতীত "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"।

কিন্তু আচার্য্য জগদীশ যে কর্ম্মে হাত দিয়াছেন, তাহা শেষ করিতে তাঁহার বিলম্ব আছে। বাধাও বিস্তর। প্রথমত, আচার্য্যের নূতন সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষার দ্বারা অনেকগুলি পেটেণ্ট অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে এবং একদল বণিকসম্প্রদায় তাঁহার প্রতিকূল হইবে। দ্বিতীয়ত, জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ জীবনকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ ব্যাপার বলিয়া জানেন, তাঁহাদের বিজ্ঞান যে কেবলমাত্র পদার্থতত্ত্ব, একথা তাঁহারা কোনমতেই স্বীকার করিতে চাহেন না। তৃতীয়ত, কোন কোন মূঢ় লোকে মনে করেন যে, বিজ্ঞান দ্বারা জীবনতত্ত্ব বাহির হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন থাকে না, তাঁহারা পুলকিত হইয়াছেন। তাঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া খৃষ্টান্ বৈজ্ঞানিকেরা তটস্থ, এজন্য অধ্যাপক কোন কোন বৈজ্ঞানিকের সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইবেন। সুতরাং একাকী তাঁহাকে অনেক বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।

তবে, যাঁহারা নিরপেক্ষ বিচারের অধিকারী, তাঁহারা উল্লসিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এমন ঘটনা হইয়াছে যে, যে সিদ্ধান্তকে রয়াল সোসাইটি প্রথমে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিহার করিয়াছিলেন, বিশ বৎসর পরে পুনরায় তাঁহারা আদরের সহিত তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশ যে মহৎ তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক-সমাজে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার

পরিণাম বহুদূরগামী। এক্ষণে আচার্য্যকে এই তত্ত্ব লইয়া সাহস ও নির্ব্বন্ধের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাকে সাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠিত করিয়া তবে তিনি বিশ্রাম করিতে পাইবেন। এ কাজ যিনি আরম্ভ করিয়াছেন, শেষ করা তাহারই সাধ্যায়ত্ত। ইহার ভার আর কেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না। আচার্য্য জগদীশ বর্ত্তমান অবস্থায় যদি ইহাকে অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান, তবে ইহা নষ্ট হইবে।

কিন্তু তাঁহার ছুটি ফুরাইয়া আসিল। শীঘ্রই তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপনাকার্য্যে যোগ দিতে আসিতে হইবে এবং তিনি তাঁহার অন্য কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইবেন।

কেবল অবসরের অভাবকে তেমন ভয় করি না। এখানে সর্ব্বপ্রকার আনুকূল্যের অভাব। আচার্য্য জগদীশ কি করিতেছেন, আমরা তাহা ঠিক বুঝিতেও পারি না। এবং দুর্গতিপ্রাপ্ত জাতির স্বাভাবিক ক্ষুদ্রতাবশত আমরা বড়কে বড় বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারি না, শ্রদ্ধা করিতে চাহি-ও না। আমাদের শিক্ষা, সামর্থ্য, অধিকার যেমনই থাক, আমাদের স্পর্দ্ধার অন্ত নাই। ঈশ্বর যে সকল মহাত্মাকে এদেশে কাজ করিতে পাঠান, তাহারা যেন বাংলা গবর্মেণ্টের নোয়াখালি-জেলায় কার্য্যভার প্রাপ্ত হয়, সাহায্য নাই, শ্রদ্ধা নাই, প্রীতি নাই,—চিত্তের সঙ্গ নাই, স্বাস্থ্য নাই, জনশূন্য মরুভূমিও ইহা অপেক্ষা কাজের পক্ষে অনুকূল স্থান;—এই ত স্বদেশের লোক—এ দেশীয় ইংরাজের কথা কিছু বলিতে চাহি না। এ ছাড়া যন্ত্র-গ্রন্থ, সর্ব্বদা বিজ্ঞানের আলোচনা ও পরীক্ষা ভারতবর্ষে সুলভ নহে।

আমরা অধ্যাপক বসুকে অনুনয় করিতেছি, তিনি যেন তাঁহার কর্ম্ম সমাধা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন। আমাদের অপেক্ষা গুরুতর অনুনয় তাঁহার অন্তঃকরণের মধ্যে নিয়ত ধ্বনি হইতেছে, তাহা আমরা জানি। সে অনুনয় সমস্ত ক্ষতি ও আত্মীয়বিচ্ছেদদুঃখ হইতেও বড়। তিনি সম্প্রতি নিঃস্বার্থ জ্ঞানপ্রচারের জন্য তাঁহার দ্বারে আগত প্রচুর ঐশ্বর্য্য-

প্রলোভনকে অবজ্ঞাসহকারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সে সংবাদ আমরা অবগত হইয়াছি, কিন্তু সে সংবাদ প্রকাশ করিবার অধিকার, আমাদের আছে না আছে, দ্বিধা করিয়া আমরা মৌন রহিলাম। অতএব এই প্রলোভনহীন পণ্ডিত জ্ঞানস্পৃহাকেই সর্ব্বোচ্চে রাখিয়া জ্ঞানে, সাধনায়, কর্ম্মে, এই হতচারিত্র হতভাগ্য দেশের গুরু ও আদর্শস্থানীয় হইবেন, ইহাই আমরা একান্ত মনে কামনা করি।

[১৩০৮]

জগদীশচন্দ্র

॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

তরুণ বয়সে জগদীশচন্দ্র যখন কীর্তির দুর্গম পথে সংসারে অপরিচিতরূপে প্রথম যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, যখন পদে পদে নানা বাধা তাঁর গতিকে ব্যাহত করছিল, সেই সময়ে আমি তাঁর ভাবী সাফল্যের প্রতি নিঃসংশয় শ্রদ্ধাদৃষ্টি রেখে বারে বারে গদ্যে পদ্যে তাঁকে যেমন করে অভিনন্দন জানিয়েছি, জয়লাভের পূর্বেই তাঁর জয়ধ্বনি ঘোষণা করেছি, আজ চির-বিচ্ছেদের দিনে তেমন প্রবল কণ্ঠে তাঁকে সম্মান নিবেদন করতে পারি সে শক্তি আমার নেই। আর কিছু দিন আগেই অজানা লোকে আমার ডাক পড়েছিল। ফিরে এসেছি। কিন্তু সেখানকার কুহেলিকা এখনও আমার শরীর মনকে ঘিরে রয়েছে। মনে হচ্ছে, আমাকে তিনি তাঁর অন্তিম পথের আসন্ন অনুবর্তন নির্দেশ করে গেছেন। সেই পথযাত্রী আমার পক্ষে আমার বয়সে শোকের অবকাশ দীর্ঘ হতে পারে না। শোক দেশের হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের সাধনায় যিনি তাঁর কৃতিত্ব অসমাপ্ত রেখে যাননি, বিদায় নেওয়ার দ্বারা তিনি দেশকে বঞ্চিত করতে পারেন না। যা অজয় যা অমর তা রইল। শারীরিক বিচ্ছেদের আঘাতে সেই সম্পদের উপলব্ধি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, যেখানে তিনি সত্য সেখানে তাঁকে বেশি করে পাওয়ার সুযোগ ঘটবে। বন্ধুরূপে আমার যা কাজ সে

আমার যখন শক্তি ছিল তখন করতে ত্রুটি করি নি। কবিরূপে আমার যা কর্ত্তব্য সেও আমার পূর্ণ সামর্থ্যের সময় প্রায় নিঃশেষ করে দিয়েছি—তাঁর স্মৃতি আমার রচনায় কীর্তিত হয়েই রয়েছে।

বিজ্ঞান ও রসসাহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে, কিন্তু তাদের মধ্যে যাওয়া-আসার দেনা-পাওনার পথ আছে। জগদীশ ছিলেন সেই পথের পথিক। সেই জন্যে বিজ্ঞানী ও কবির মিলনের উপকরণ দুই মহল থেকেই জুটত। আমার অনুশীলনের মধ্যে বিজ্ঞানের অংশ বেশি ছিল না, কিন্তু ছিল তা আমার প্রবৃত্তির মধ্যে। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ছিল অনুরূপ অবস্থা। সেই জন্যে আমাদের বন্ধুত্বের কক্ষে হাওয়া চলত দুই দিকের দুই খোলা জানলা দিয়ে। তাঁর কাছে আর একটা ছিল আমার মিলনের অবকাশ যেখানে ছিল তাঁর অতি নিবিড় দেশপ্রীতি।

প্রাণ পদার্থ থাকে জড়ের গুপ্ত কুঠুরিতে গা ঢাকা দিয়ে। এই বার্তাকে জগদীশ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পাকা করে গেঁথে দেবেন, এই প্রত্যাশা তখন আমার মনের মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়ে দিয়েছিল—কেননা ছেলেবেলা থেকেই আমি এই ঋষিবাক্যের সঙ্গে পরিচিত—"যদিদং কিঞ্চ জগৎ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং", "এই যা কিছু জগৎ, যা কিছু চলছে, তা প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পমান।" সেই কম্পনের কথা আজও বিজ্ঞানে বলছে। কিন্তু সেই স্পন্দন যে প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে এক, এ কথা বিজ্ঞানের প্রমাণ-ভাণ্ডারের মধ্যে জমা হয়নি। সেদিন মনে হয়েছিল আর বুঝি দেরি নেই।

তারপর জগদীশ সরিয়ে আনলেন তাঁর পরীক্ষাগার জড়রাজ্য থেকে উদ্ভিদরাজ্যে, যেখানে প্রাণের লীলার সংশয় নেই। অধ্যাপকের যন্ত্রউদ্ভাবনী শক্তি ছিল অসাধারণ। উদ্ভিদের অন্দরমহলে ঢুকে গুপ্তচরের কাজে সেই সব যন্ত্র আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখাতে লাগল। তাদের কাছ থেকে নতুন নতুন খবরের প্রত্যাশায় অধ্যাপক সর্বদা উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতেন। এ পথে

তার সহযোগিতার উপযুক্ত বিদ্যা আমার না থাকলেও তবুও আমার অশিক্ষিত কল্পনার অত্যুৎসাহে তিনি বোধ হয় সকৌতুক আনন্দ বোধ করতেন। কাছাকাছি সমজদারের আনাগোনা ছিল না; তাই আনাড়ি দরদীর অত্যুক্তিমুখর ঔৎসুক্যেও সেদিন তাঁর প্রয়োজন ছিল। সুহৃদের প্রত্যাশাপূর্ণ শ্রদ্ধার মূল্য যাই থাক, গম্যস্থানের উজান পথে এগিয়ে দেবার কিছু না কিছু পালের হাওয়া সে জুগিয়ে থাকে। সকল বাধার উপরে তিনি যে জয়লাভ করবেনই, এই বিশ্বাস আমার মধ্যে ছিল অক্ষুণ্ণ। নিজের শক্তির পরে তাঁর নিজের যে শ্রদ্ধা ছিল, আমার শ্রদ্ধার আবেগ তাতে অনুরণন জাগাত সন্দেহ নেই।

এই গেল আদিকাণ্ড। তার পরে আচার্য তাঁর পরীক্ষালব্ধ তত্ত্ব ও সহধর্মিণীকে নিয়ে সমুদ্রপারের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হলেন। স্বদেশের প্রতিভা বিদেশের প্রতিভাশালীদের কাছ থেকে গৌরব লাভ করবে, এই আগ্রহে দিন রাত্রি আমার হৃদয় ছিল উৎফুল্ল। এই সময় যখন জানতে পারলুম যাত্রার পাথেয় সম্পূর্ণ হয়নি, তখন আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুললে। সাধনার আয়োজনে অর্থাভাবের শোচনীয়তা যে কত কঠোর, সে কথা দুঃসহভাবেই তখন আমার জানা ছিল। জগদীশের জয়যাত্রায় এই অভাব লেশমাত্রও পাছে বিঘ্ন ঘটায়, এই উদ্বেগ আমাকে আক্রমণ করলে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার নিজের সামর্থ্যে তখন লেগেছে পূরো ভাঁটা। লম্বা লম্বা ঋণের গুণ টেনে আভূমি নত হয়ে চালাতে হচ্ছিল আমার আপন কর্মতরী। অগত্যা সেই দুঃসময়ে আমার একজন বন্ধুর শরণ নিতে হোলো। সেই মহদাশয় ব্যক্তির ঔদার্য্য স্মরণীয় বলে জানি। সেই জন্যেই এই প্রসঙ্গে তাঁর নাম সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করা আমি কর্তব্য মনে করি। তিনি ত্রিপুরার পরলোকগত মহারাজা রাধাকিশোর দেবমাণিক্য। আমার প্রতি তাঁর প্রভূত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা চিরদিন আমার কাছে বিস্ময়ের বিষয় হয়ে আছে। ঠিক সেই সময়টাতে তাঁর পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ চলছিল।

আমি তাঁকে জানালুম শুভ অনুষ্ঠানের উপলক্ষ্যে আমি দানের প্রার্থী, সে দানের প্রয়োগ হবে পুণ্যকর্মে। বিষয়টা কী শুনে তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, "জগদীশচন্দ্র এবং তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি নে, আমি যা দেব, সে আপনাকেই দেব, আপনি তা নিয়ে কী করবেন আমার জানবার দরকার নেই।" আমার হাতে দিলেন পনেরো হাজার টাকার চেক। সেই টাকা আমি আচার্যের পাথেয়র অন্তর্গত করে দিয়েছি। সেদিন আমার অসামর্থ্যের সময় যে বন্ধুকৃত্য করতে পেরেছিলুম, সে আর এক বন্ধুর প্রসাদে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ পাশ্চাত্য মহাদেশকে আশ্রয় করেই দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে, সেখানকার দীপালিতে ভারতবাসী এই প্রথম ভারতের দীপশিখা উৎসর্গ করতে পেরেছেন, এবং সেখানে তা স্বীকৃত হয়েছে। এই গৌরবের পথ সুগম করবার সামান্য একটু দাবিও মহারাজ নিজে না রেখে আমাকেই দিয়েছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে সেই উদারচেতা বন্ধুর উদ্দেশে আমার সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

তারপর থেকে জগদীশচন্দ্রের যশ ও সিদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়ে দূরে প্রসারিত হোতে লাগল, একথা সকলেরই জানা আছে। ইতিমধ্যে কোনো উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তাঁর কীর্তিতে আকৃষ্ট হলেন, সহজেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁর পরীক্ষা-কাননের প্রতিষ্ঠা হোলো, এবং অবশেষে ঐশ্বর্যশালী বসু-বিজ্ঞানমন্দির স্থাপনা সম্ভবপর হোতে পারল। তাঁর চরিত্রে সংকল্পের যে একটি সুদৃঢ় শক্তি ছিল, তার দ্বারা তিনি অসাধ্য সাধন করেছিলেন। কোনো একক ব্যক্তি আপন কাজে রাজকোষ বা দেশীয় ধনীদের কাছ থেকে এত অজস্র অর্থ-সাহায্য বোধ করি ভারতবর্ষে আর কখনো পায়নি। তাঁর কর্মারম্ভের ক্ষণস্থায়ী টানাটানি পার হবামাত্র লক্ষ্মী এগিয়ে এসে তাঁকে বরদান করেছেন এবং শেষপর্যন্তই আপন লোকবিখ্যাত চাপল্য প্রকাশ করেন নি। লক্ষ্মীর পদ্মকে লোকে সোনার পদ্ম বলে থাকে। কিন্তু কাঠিন্য বিচার করলে তাকে লোহার পদ্ম বলাই সংগত। সেই লোহার

আসনকে জগদীশ আপনার দিকে যে এত অনায়াসে টেনে আনতে পেরেছিলেন, সে তার বৈয়ক্তিক চৌম্বকশক্তি, অর্থাৎ ইংরাজিতে যাকে বলে পার্সোনাল ম্যাগনেটিজ্‌ম্‌, তারই গুণে।

এই সময়ে তার কাজে ও রচনায় উৎসাহদাত্রীরূপে মূল্যবান সহায় তিনি পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে। জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য। তখন থেকে তাঁর কর্মজীবন সমস্ত বাহ্য বাধা অতিক্রম করে পরিব্যাপ্ত হোলো বিশ্বভূমিকায়। এখানকার সার্থকতার ইতিহাস আমার আয়ত্তের অতীত।

এদিকে আমার পক্ষে সময় এল যখন থেকে আমার নির্মম কর্মক্ষেত্রের ক্ষুদ্র সীমায় রোদে বাদলে মাটিভাঙা আলবাঁধার কাজে আমি একলা ঠেকে গেলুম। তার সাধনকৃচ্ছ্রতায় আত্মীয়বন্ধুদের থেকে আমার চেষ্টাকে ও সময়কে নিল দূরে টেনে।

[১৩৪৪]

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও চারণ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বাঙালী জগদীশচন্দ্র বসুর স্বদেশপ্রেমের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এস্থলে উপস্থাপিত করা যাইতেছে। ইতিপূর্ব্বে কবিবর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবনে জগদীশচন্দ্রের প্রভাব ও উৎসাহের কথা আমরা বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছি রবীন্দ্র-জগদীশ পত্রাবলীর মধ্য দিয়া।

গয়ার বিষ্ণুমন্দির আদিতে বৌদ্ধমন্দির বলিয়া বৌদ্ধেরা দাবি জানান। স্বত্ব নির্ধারণের জন্য ১৯০৮ খৃস্টাব্দের জুন মাসে সিস্টার নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি দেশবরেণ্য ব্যক্তিরা গয়ায় উপস্থিত হন। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তখন গয়ায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি মাননীয় অতিথিদের যথাচিত সংবর্ধনা করেন। দেশপ্রেমমূলক স্বরচিত সঙ্গীত গাহিয়া ও নাটকের অংশ বিশেষ পড়িয়া অতিথিগণকে আপ্যায়িত করেন। জগদীশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলালের অসাধারণ ক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালকে তাঁহার রচনা সম্বন্ধে যে পরামর্শ দেন তাহার ফলে দ্বিজেন্দ্রলাল কিরূপে অনুপ্রাণিত হন তাহার পরিচয় পাই দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখিত দেবকুমার রায়চৌধুরীর একটি পত্রে।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন তারিখে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার বন্ধু ও জীবনীকার দেবকুমারকে লেখেন: "গত পরশু স্বদেশপ্রাণ মনীষী

জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় আমাকে স্বদেশী সঙ্গীত রচনা সম্পর্কে একটা বিবেচ্য পরামর্শ দিয়ে গেলেন।" পরামর্শটি জগদীশচন্দ্র বসুর ভাষায় এই :—

"আপনি রাণা প্রতাপ, দুর্গাদাস প্রভৃতি চরিত-গাথা বঙ্গবাসীকে শুনাইতেছেন বটে; কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালীর সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি বা একেবারেই আপন ঘরের জন নহেন। এখন আদর্শ বাঙ্গালীকে দেখাইতে হইবে—যাহাতে এই মুমূর্ষু জাতটা আত্মশক্তিতে আস্থাবান হইয়া আত্মোন্নতির জন্য আগ্রহান্বিত হয়। আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের আবহাওয়ায় জন্মিয়া, আমাদের ভিতর দিয়াই বাড়িয়া উঠিয়া, সমগ্র জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছেন, যদি সম্ভব হয়, যদি পারেন ত' একবার সেই আদর্শ এ বাঙ্গালী জাতিকে দেখাইয়া আবার তাহাদিগকে জীয়াইয়া মাতাইয়া তুলুন!"

—"দ্বিজেন্দ্রলাল" : দেবকুমার রায়চৌধুরী
১৩২৪ সাল, পৃ: ৫৪২

ইহারই ফলে কিছুদিনের মধ্যেই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার বিখ্যাত "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার আমার দেশ" গানটি রচনা করিয়া জগদীশচন্দ্রের উপদেশ কার্যে পরিণত করিতে আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কিত স্মৃতি কথায় জগদীশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন :—

"কয়েক বৎসর পূর্বে একবার গয়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে তাঁহার কয়েকটি গান শুনাইয়াছিলেন। সেদিনের কথা কখনও ভুলিব না। নিপুণ শিল্পীর হস্তে, আমাদের মাতৃভাষার কি যে অসীম ক্ষমতা, সেদিন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। যে ভাষার করুণ ধ্বনি মানবের অক্ষমতা, প্রেমের অতৃপ্ত বাসনা ও নৈরাশ্যের শোক

গাহিয়াছিল, সেই ভাষারই অন্য রাগিণীতে অদৃষ্টের প্রতিকূল আচরণে উপেক্ষা, মানবের শৌর্য্য ও মরণের আলিঙ্গন-ভিক্ষা ভৈরব নিনাদে ধ্বনিত হইল।

"ধরণী এক্ষণে দুর্ব্বলের ভার-বহনে প্রপীড়িতা। রুদ্র সংহার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে বীর্য্য অপেক্ষা ভারতের উচ্চতর ধর্ম্ম নাই। কে-মরণ-সিন্ধু মন্থন করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে?—ধর্ম্ম-যুদ্ধের এই আহ্বান দ্বিজেন্দ্রলাল বজ্র ধ্বনিতে ঘোষণা করিতেছেন।"

—"দ্বিজেন্দ্রলাল" : দেবকুমার রায়চৌধুরী
১৩২৪ সাল, পৃ: ৫৪১

[শ্রীযুক্ত সনৎকুমার গুপ্ত মহাশয়ের সৌজন্যে]

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

॥ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥

আবিষ্কার না বলিয়া আবিষ্কারপরম্পরা বলা উচিত; কেন না, গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র কর্তৃক নূতন নূতন তথ্যের আবিষ্কার স্রোতের মত ধারা বাঁধিয়া চলিতেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি নূতন তথ্যের নির্ণয় হইয়াছে, আবার প্রত্যেক নির্ণীত তত্ত্ব এক একটা আঁধার দেশ আলোকপূর্ণ করিয়া দিয়াছে—বিজ্ঞান-শাস্ত্রের ইতিহাসে ইহার তুলনা যে অত্যন্ত অধিক আছে, তাহা নহে।

আমাদের ছোট মুখে বড় কথা বলিতে ভয় হয়, কিন্তু সত্তর বৎসর পূর্ব্বে যখন লণ্ডনের রাজকীয় বিজ্ঞানসমাজের (রয়াল ইনষ্টিটিউশনের) প্রাচীরাভ্যন্তর হইতে মাইকেল ফ্যারাডের আবিষ্কারপরম্পরা একের পর এক বাহির হইয়া বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর শ্বাসরোধের উপক্রম করিয়াছিল, সেই সত্তর বৎসরের প্রাচীন ইতিহাস কতকটা মনে আসে। কিন্তু আমাদের এত ছোট মুখে এত বড় কথা না আনাই ভাল।

অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র তাড়িত উর্ম্মির অস্তিত্ব ধরিবার জন্য নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন, প্রথম যখন শোনা যায়, তখন কথাটাতে বিশ্বাস হয় নাই। কেন না, বাঙ্গালীর মস্তিষ্কে হাজার চাষ দিয়াও বৈজ্ঞানিক

ফসলের উৎপাদন অসম্ভব, ইহা ত একটা ধ্রুব বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া বহু পূর্ব্বে অবধারিত হইয়া গিয়াছিল।

কিন্তু যখন স্বচক্ষে দেখা গেল, একটা অতি ক্ষুদ্র বাক্সের ভিতর হইতে তাড়িত তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া আর একটা ছোট বাক্সের ভিতর রক্ষিত লোহার তারের উপর পতিত হইবামাত্র সেই তারে তাড়িত প্রবাহ উৎপন্ন হইতেছে, এবং প্রবাহ-বলে কম্পাসের কাঁটা নাড়া হইতে পিস্তলের আওয়াজ পর্য্যন্ত চলিতে পারিতেছে, তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।

বস্তুতই সেদিন বিজয়ের দিন বটে; কেন না, এত অল্প আয়াসে এত বড় দুঃসাধ্য কাজ যে সাধিত হইতে পারে, তাহা ইহার পূর্ব্বে শুনি নাই।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মান অধ্যাপক হার্ৎজ্ তাড়িত তরঙ্গের উৎপাদনের ও তাড়িত তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রতিপাদনের উপায় বাহির করিয়াছিলেন, এবং পণ্ডিতেরা এই ব্যাপার লইয়া আন্দোলন আলোচনা করিতেছিলেন। কিন্তু সেই অস্তিত্বপ্রতিপাদন যে এত অল্প আয়াসে সম্পাদিত হইতে পারে, তাহা জানিতাম না। যাহাই হউক, বিজ্ঞানের রণক্ষেত্রে সেনানীগণ যেখানে যতদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, আমাদের স্বদেশীয় এক ব্যক্তি সেখানে অগ্রণী হইয়াছেন, ইহা প্রকৃতই বিজয়বার্ত্তা।

সেইদিন হইতে নূতন নূতন সংবাদ সহকারে ভারতবাসীর এই বিজয়-বার্ত্তা পৃথিবী জুড়িয়া ঘোষিত হইতেছে, ইহা অসীম আনন্দের কথা, কিন্তু আনন্দপ্রকাশে যেটুকু স্বাস্থ্যের ও সবলতার প্রয়োজন, সেটুকু বল ও স্বাস্থ্য বুঝি আমাদের নাই।

ঘটনা বৃহৎ, কিন্তু এই বৃহৎ ঘটনা কিরূপে সংক্ষিপ্ত করিয়া পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিব, তাহা বুঝিতেছি না।

ধাতুদ্রব্য কাহাকে বলে, বুঝাইতে হইবে না; কোন্ জিনিষ ধাতু নহে, তাহাও বুঝাইতে হইবে না। ধাতু, যথা—সোনা, রূপা, তামা। ধাতু নহে—জল, বায়ু, ইট, কাঠ। কিন্তু যাহা ধাতু ও যাহা ধাতু নহে, উভয়ের

অভ্যন্তরে যে আকাশ নামক সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, তাহার স্বরূপ ঠিক বুঝাইয়া না দিলে অনেকেই হয় ত বুঝিবেন না। কিন্তু সে কথা বুঝাইবার এখন সময় নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, এই সূক্ষ্ম পদার্থ বিশ্ব ব্যাপিয়া বর্ত্তমান, এবং সূর্য্যমণ্ডল ও নক্ষত্রমণ্ডলী হইতে সংবাদবহন এই আকাশের নিরূপিত কার্য্য। সূর্য্যের ও নক্ষত্রের শরীরগত পরমাণুগুলি এই আকাশে যে ধাক্কা দেয়, তাহাই ঢেউ উৎপাদন করিয়া আমাদের চোখে লাগে। সেই ঢেউয়ের ধাক্কা মস্তিষ্কে উপনীত হইলে যে অনুভূতি জন্মে, তাহাকেই বলি আলো ও তাহার অভাবই আঁধার। এবং সেই আলোকের অনুভূতি দ্বারা আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া লই, ঐখানে ওটা সূর্য্য, আর ঐখানে ওটা একটা তারকা। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আকাশের স্থিতিস্থাপকতা এত বেশী যে, সেই ঢেউগুলি প্রায় সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে আকাশ বাহিয়া চলিয়া থাকে।

আলোকের উৎপাদক শক্তি সেই আকাশের ঢেউ, কিন্তু তাড়িত শক্তি ও চৌম্বক শক্তি নামে আরও দুইটা আমাদের অতি পরিচিত শক্তি আছে, সেই দুইটার সহিত আকাশের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, সত্তর বৎসর পূর্ব্বে তাহা কাহারও কল্পনায় আসে নাই। উপরে যে মনস্বী-পুরুষ মাইকেল ফ্যারাডের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহারই আবিষ্কারপরম্পরা প্রথমে সম্ভাবনা দেখাইয়া দেয় যে, সেই আলোকবাহী আকাশপদার্থই তাড়িত শক্তির ও চৌম্বক শক্তিরও আধার হইতে পারে।

তৎপরে মাক্সোয়েল, ফ্যারাডের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলিকে ভিত্তিভূমি করিয়া প্রায় প্রতিপন্ন করেন যে, সেই আকাশ মধ্যে কোনরূপ টান পড়িলেই তাড়িত শক্তির ও আকাশ মধ্যে কোনরূপ ঘূর্ণি উৎপন্ন হইলেই চৌম্বক শক্তির উৎপত্তি হয়। একখানা তামার থালা ও একখানা দস্তার থালা উপরি উপরি স্পর্শ করিয়া দুইখানাকে বিচ্ছিন্ন করিলেই, উভয়ের মধ্যগত আকাশে, অর্থাৎ উভয়ের ব্যবধানভূত বায়ুর মধ্যস্থ আকাশে টান পড়ে;

তখন আমরা বলি, থালা দুখানা তাড়িতযুক্ত হইয়াছে। এই টানটা বায়ুর মধ্যগত আকাশেই পড়ে, এবং বায়ুর ন্যায় যে সকল দ্রব্য ধাতু নহে, তাহাদের মধ্যস্থ আকাশেই পড়ে, ধাতুদ্রব্যের মধ্যস্থ আকাশে এই টান সংক্রান্ত হয় না। ধাতুর মধ্যে আকাশটা যেন স্থিতিস্থাপকতাবর্জ্জিত; যেন উহা টান সহিতে পারে না। আর অপধাতু বা অধাতব পদার্থের মধ্যস্থ আকাশ যেন টানসহ। অধাতব পদার্থের আকাশ যেন রবারের মত বা ইস্পাতের মত, আর ধাতব পদার্থের মধ্যস্থ আকাশ যেন মোমের মত বা কাদার মত। ধাতব পদার্থের মধ্যস্থ আকাশে এই টান দিলে সেই আকাশ যেন মোমের মত বা কাদার মত বা গুড়ের মত বা জলের মত সরিয়া যায় ও গড়াইয়া যায়, উহাতে টান পড়ে না; এইরূপে উহাতে তাড়িত প্রবাহ উৎপন্ন হয়। আর অধাতব পদার্থের অভ্যন্তরস্থিত আকাশে টান দিলে উহা রবারের মত বা স্প্রিংএর মত খেঁচিয়া ধরে; উহাতে তাড়িত প্রবাহ জন্মে না।

ধাতু পদার্থের উদাহরণ একটা তামার তার। এই তারের ভিতর আকাশে টান পড়িলে উহা ক্রমেই সরিয়া যায় ও গড়াইয়া যায় ও এইরূপে উহার মধ্যে তাড়িত প্রবাহ জন্মে। এই তাড়িত প্রবাহের সাহায্যে আমরা আজকাল টেলিগ্রাফের সংবাদ প্রেরণ করি ও টেলিফোনের শব্দ চালনা করি ও ট্রাম-পথে গাড়ী চালাই ও রাজপথে গৃহমধ্যে আলো জ্বালি।

তারপথে এই তাড়িত প্রবাহ চলিবার সময় তাহার চতুঃপার্শ্বে বাহিরে বায়ুমধ্যস্থ আকাশে ঘূর্ণাবর্ত্ত উপস্থিত হয়। সেইখানে একটা লোহার কাঁটা ধরিলে লোহার অণুগুলা সেই ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরিয়া যায়, কাঁটাটাও ঘুরিয়া গিয়া সেই আবর্ত্তের পাকের অনুকূলে দণ্ডায়মান হয়। এই ব্যাপারের নাম চৌম্বক ব্যাপার, এবং সেই তদবস্থ লোহার কাঁটার নাম চুম্বকের কাঁটা বা কম্পাসের কাঁটা বা দিগ্দর্শন-শলাকা।

মাক্সোয়েল দেখাইয়াছিলেন, সেই আকাশের কোন অংশে একটা টান দিয়া ছাড়িয়া দিলে, সেই অংশটা কিছুক্ষণ তুলিবার সম্ভাবনা;—একটা স্প্রিংকে যেমন টানিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা তুলিতে থাকে। এবং আকাশ যখন বিশ্বব্যাপী, তখন উহার এক অংশে এইরূপ একটা দোলন ঘটাইয়া দিলে সেই আন্দোলনের ধাক্কায় চারিদিকে ঢেউ উঠিয়া দিগ্বিদিকে ছুটিবার সম্ভাবনা। আলোকের ঢেউগুলি যদি আকাশপথে সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে চলিতে পারে, তবে এই তাড়িতের টানে উৎপন্ন ঢেউগুলিও ঠিক সেই লক্ষ ক্রোশ বেগেই চলিবার সম্ভাবনা।

মাক্সোয়েল বলিয়াছিলেন, আকাশই যদি তাড়িত শক্তির আধার হয়, তাহা হইলে আকাশে যখন ছোট ছোট আলোকের ঊর্ম্মি চলিয়া থাকে, তবে বড় বড় তাড়িত ঊর্ম্মিরও আকাশপথে চলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু সম্ভাবনাই প্রমাণ নহে। আকাশই তাড়িত শক্তির আধার বটে কি না; আর আধার হইলেও আকাশে সেইরূপ বড় বড় ঢেউ উঠে কি না, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবশ্যক। আলোক বহন করে যে আকাশ, সেই আকাশই তাড়িত শক্তির আধার না হইতেও পারে। তজ্জন্য স্বতন্ত্র আকাশ বা আকাশতুল্য পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। এবং তাড়িতের ঢেউ একটা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত অপরিচিত নূতন ব্যাপার—কেবল অনুমান বা যুক্তিবলে ইহার অস্তিত্ব সপ্রমাণ হইতে পারে না, প্রত্যক্ষ নিদর্শন আবশ্যক।

হার্ৎজ্ সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করেন। প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য দুইটা যন্ত্রের প্রয়োজন; একটাতে তরঙ্গ উৎপাদন করিবে, আর একটাতে উহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিবে। প্রথম যন্ত্রে আকাশে একবার টান দিয়া ছাড়িয়া দিলেই আন্দোলন জন্মিবে; দ্বিতীয় যন্ত্রে সেই আন্দোলনের ধাক্কা আসিয়া পৌছিলে সে কোন রকমে সাড়া দিবে। আলোকের সঙ্গে তুলনা কর। প্রথমটা যেন দীপশিখা, সেই স্থলে আকাশে ধাক্কা লাগিয়া

আলোক তরঙ্গ উৎপন্ন হইতেছে। দ্বিতীয়টা যেন আমাদের চোখ, সেখানে সেই তরঙ্গ প্রতিহত হইয়া আলোকের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে।

টান দিয়া আকাশে ধাক্কা দিবার উপায় পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল। মেঘের কোলে যখন বিদ্যুল্লতা চমক দেয়, তখন আকাশে সহসা ধাক্কা পড়ে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রে যখন ছোট স্ফুলিঙ্গ উৎপন্ন হয়, তখনও আকাশে সহসা ধাক্কা লাগে। বিড়ালের গায়ে একটা চাপড় দিলেও যে আকাশে ধাক্কা না লাগে, এমন নহে।

হার্ৎজের বাহাদুরী এই দ্বিতীয় যন্ত্রটির আবিষ্কারে—যে যন্ত্রটি তাড়িত তরঙ্গের পক্ষে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের মত কাজ করে। দূরোৎপন্ন সুদীর্ঘ তাড়িত তরঙ্গ আকাশ বাহিয়া এই যন্ত্রে ধাক্কা দিলে সেই যন্ত্রমধ্যেও তাড়িতের খেলা আরম্ভ হয়, এবং সেই তাড়িতের খেলার বিবিধ প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়। তাড়িতের খেলার প্রত্যক্ষ ফল নানাবিধ। আলো জ্বালা হইতে গাড়ী টানা পর্য্যন্ত তাহার উদাহরণ।

হার্ৎজ্ এই যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়া দেখান, বাস্তবিকই আকাশের মধ্য দিয়া তাড়িতের ঢেউ চলিয়া থাকে। দূরে একটা ধাতুপৃষ্ঠে তাড়িত প্রবাহ নাচাইয়া দিলে, সেই তাড়িত নৃত্য বায়ুর ব্যবধান অর্থাৎ বায়ুমধ্যস্থ অদৃশ্য আকাশের ব্যবধান ভেদ করিয়া, সেই আকাশপথে সঞ্চালিত হইয়া, দূরস্থিত আর একখানা ধাতুপৃষ্ঠে তাড়িত প্রবাহ নাচাইয়া দেয় ও সেই নর্ত্তনের প্রত্যক্ষ ফল চক্ষুর গোচর করিয়া দেয়। ম্যাক্সোয়েল যাহা জ্ঞানচক্ষুতে দেখিয়াছিলেন, হার্ৎজ তাহা চর্ম্মচক্ষুর বিষয়ীভূত করিয়া দিলেন।

তাড়িত প্রবাহ ও তাড়িত তরঙ্গ, এই দুটি শব্দ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছি ও আবার ব্যবহার করিতে হইবে। পাঠকগণকে সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত, প্রবাহ ও তরঙ্গ, উভয়ের অর্থে তফাত আছে। প্রবাহের বশে পদার্থ একমুখে চলে, যেমন নদীতে স্রোতের জল। আর তরঙ্গের বশে গতি ইতস্ততঃ ঘটে; নদীর তরঙ্গে তরণী উঠা-নামা করে ও

দোদুল্যমান হয়। সেইরূপ তাড়িতের প্রবাহে আকাশ একমুখে গড়াইয়া চলে—এই প্রবাহে টেলিগ্রাফের খবর চলে। আর তাড়িতের তরঙ্গে আকাশ ইতস্ততঃ দুলিতে থাকে; দোদুল্যমান হয়। ধাতুফলকের পিঠে তরঙ্গ সংক্রামিত হইলে আকাশ একবার এ-ধার যায়, একবার ও-ধার যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সর্ব্বত্র এই অর্থগত প্রভেদটি মনে রাখা আবশ্যক। তরঙ্গের সহিত প্রবাহের এই পার্থক্য বুঝাইবার জন্য উপরে 'দোলন', 'আন্দোলন', 'নৃত্য', 'নর্ত্তন', 'নাচ,' প্রভৃতি স্পন্দনবোধক শব্দের ব্যবহার করা গিয়াছে।

এখন দেখা গেল, আকাশমধ্যে ছোট বড় বিবিধ ঊর্ম্মি উৎপন্ন হইয়া সেকেণ্ডে লক্ষ ক্রোশ বেগে চলে। ছোট ছোট ঢেউগুলির নাম আলোক-তরঙ্গ, বড় বড় ঢেউগুলির নাম তাড়িত-তরঙ্গ; ছোট বড় সকল ঢেউ আকাশতরঙ্গ। উপযুক্ত ঊর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্র থাকিলেই আমরা সেই সকল ঊর্ম্মির অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারি। আমাদের চক্ষু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকাশ-তরঙ্গ, যাহার নাম আলোক, তাহার পক্ষে ঊর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্রের কাজ করে। উপযুক্ত ঊর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্রের অভাবেই হার্ৎজের পূর্ব্বে কেহ বড় বড় আকাশতরঙ্গের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

হার্ৎজের পরবর্ত্তী কালে এই ঊর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্রের প্রভূত উন্নতিসাধন হইয়াছে। একটা নলের ভিতর লোহার গুঁড়া পুরিলে সেই লৌহচূর্ণের স্তর ভেদ করিয়া তাড়িত প্রবাহ চলিতে পারে না। কিন্তু দূর হইতে আকাশ-তরঙ্গ আসিয়া এই লোহাচুরে পতিত হইলেই কি জানি কিরূপে উহার তাড়িত প্রবাহ-প্রতিরোধের ক্ষমতা কমিয়া যায়; তখন উহার ভিতর দিয়া অবাধে তাড়িত প্রবাহ চলিতে পারে। এই তাড়িত প্রবাহ দ্বারা তখন তুমি চুম্বকের কাঁটা নাড়াইয়া দিতে পার বা আলো জ্বালিতে পার বা পিস্তলের আওয়াজ করিতে পার বা গাড়ী টানিতে পার। এই লোহাচুরে ঊর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্রের কাজ চলিতে পারে। এইরূপ যন্ত্রকে ইংরাজীতে Coherer বলে।

ধাতুচূর্ণের কণিকাগুলির মাঝে কেবল ফাঁক, নিরেট ধাতুপদার্থে তাড়িত প্রবাহ স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে,—কিন্তু ধাতুচূর্ণে এই ফাঁক পার হইয়া যাইতে পারে না। অধ্যাপক লজ অনুমান করেন যে, আকাশতরঙ্গের প্রভাবে কোন মতে এই ফাঁকগুলি বুজিয়া যায়; কণিকাগুলি পরস্পর সংযুক্ত ও সংহত হয়; তখন তাড়িত প্রবাহ অবাধে চলে। এই cohesion বা সংযোগসাধন বা সংহতিসাধন দ্বারা কাজ করে বলিয়া যন্ত্রের নাম coherer।

ধাতুর গুঁড়া না হইলেই যে coherer প্রস্তুত হয় না, এমন নহে। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের coherer কতকগুলি তারে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাবে তারে স্পর্শ থাকে, স্পর্শস্থলে তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা পড়িলেই তারের প্রবাহ-পরিচালন-শক্তি জন্মে।

ফলে যেরূপেই হউক, তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা পাইলে অপরিচালক দ্রব্যে পরিচালকতা জন্মে, অথবা কুপরিচালক দ্রব্য সুপরিচালক হইয়া যায়। Coherer অর্থাৎ ঊর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্রগুলির মূল তথ্য এই।

মার্কণি যে ঊর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ত্রিশ চল্লিশ ক্রোশ বা ততোধিক দূর হইতে সমাগত তাড়িত তরঙ্গ অবলীলাক্রমে ধরা পড়িতেছে।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ও ইতালির মার্কণি বিনা তারে সংবাদ প্রেরণে সমর্থ হইয়াছেন, এই বার্ত্তা প্রায় সমকালে প্রচারিত হয়। মার্কণি এই কয় বৎসর মধ্যে বহু ক্রোশ দূর হইতে বিনা তারে সংবাদ প্রেরণে সমর্থ হইয়াছেন। জগদীশচন্দ্রের যন্ত্র বহু দূর হইতে সংবাদ প্রেরণ জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। তাঁহার বন্ধুবর্গ এই জন্য কতকটা হতাশ হইয়া পড়িতেছিলেন। জগদীশবাবু তাঁহার বন্ধুগণের নিকট অনুযোগভাগী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যে সংবাদ-প্রেরণের ব্যবসায়ে খ্যাতিলাভে মতি হয় নাই, এজন্য স্বদেশ কালে তাঁহার

মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবে। ব্যবসায়ে লিপ্ত হইলে তাঁহার অর্থাগমের সম্ভাবনা থাকিত বটে, কিন্তু আজ আমরা যে সকল নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সন্ধান পাইয়া চমকিত ও বিস্মিত হইতেছি, সে আশা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইত।

যাহা হউক, তৎকালে জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত উর্ম্মিনির্দ্দেশক যন্ত্র অতি অদ্ভুত উদ্ভাবনা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। সেই শ্রেণীর বা তদুদ্দেশ্যে নির্ম্মিত আর সকল যন্ত্রই উহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। স্বোদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে তিনি তাড়িত তরঙ্গের বিবিধ ধর্ম্মনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; প্রকৃতির বিবিধ গুপ্ত রহস্য আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এবং নিত্য নূতন রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া যশস্বী হইতেছিলেন। অচিরে প্রতিপন্ন হইল যে,—আকাশবাহিত তাড়িত তরঙ্গে ও আকাশবাহিত আলোকতরঙ্গে কোন মৌলিক প্রভেদ বর্ত্তমান নাই।

আলোকতরঙ্গের কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্ম আছে। ধাতুপদার্থের মধ্যে আলোকতরঙ্গ প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্য ধাতুপদার্থ অনচ্ছ হয়।

মসৃণ ধাতুনির্ম্মিত প্রাচীরের পিঠে ঠেকিলে আলোক তরঙ্গ প্রত্যাহত হইয়া ফিরিয়া আসে বা প্রতিফলিত বা পরাবর্ত্তিত হয়।

সান্দ্র পদার্থের মধ্য দিয়া যাইতে হইলে উহার গতির মুখ ঘুরিয়া যায়, অর্থাৎ আলোকরশ্মি তির্য্যগ্‌গামী হইয়া তিরোবর্ত্তিত হয়।

দেখা গেল যে, আকাশতরঙ্গেও ঠিক এই এই ধর্ম্ম বর্ত্তমান।

এই যন্ত্রের সাহায্যে তাড়িত তরঙ্গের যে সকল অজ্ঞাতপূর্ব্ব ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা এখন পুরাণ কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাড়িত তরঙ্গ একখানা বাঁধা কেতাবের পাতার ভিতর দিয়া অবাধে চলিয়া যায়, আর বহিখানা ঘুরাইয়া ধরিলে আর অবাধে যাইতে পারে না; চুলের গোছার ভিতর চলে, ঘুরাইয়া ধরিলে অবাধে চলে না; কাষ্ঠদণ্ডের ভিতরে আঁশগুলি কোন্ মুখে রহিয়াছে, তাহা ঠিক করিয়া বলিয়া দেয়;

প্রস্তরখণ্ডের কোন্ দিকে পরিচালকতা বেশী, কোন্ দিকে কম, তাহা ঠিক ধরিয়া দেয় ; ইত্যাদি তত্ত্ব চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে নূতন আবিষ্কৃত হইলেও এখন পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। সম্প্রতি তাড়িত তরঙ্গের যে অভিনব ধর্ম্ম বৈজ্ঞানিকগণের চমক লাগাইবার উপক্রম করিয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাউক।

ধাতুচূর্ণ তাড়িত প্রবাহের অপরিচালক, কিন্তু ধাতুচূর্ণের উপর তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা পড়িলে উহার পরিচালকতা সহসা বৃদ্ধি পায় ; তখন সেই ধাতুচূর্ণ বাহিয়া তাড়িত প্রবাহ চলিতে পারে। ইহা পুরাণ কথা, এবং ধাতুচূর্ণের এই শক্তি অবলম্বন করিয়া আধুনিক উর্ম্মিনির্দ্দেশক coherer যন্ত্র সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। ধাতুচূর্ণের কণিকাগুলির মধ্যে একটা কিছু বিকার উৎপন্ন হয়, যাহার ফলে এইরূপ ঘটে। কণিকাগুলিকে আবার স্বভাবে আনিতে হইলে একটা আঙ্গুলের ঠোকা দেওয়া প্রয়োজন হয় ; একবার নাড়িয়া দিলে তবে উহারা প্রকৃতিস্থ হইয়া আপনার স্বাভাবিক অপরিচালকত্বশক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হয়।

দুই বৎসর হইল জগদীশচন্দ্র দেখান, এইরূপ নাড়া দেওয়া নিতান্তই আবশ্যক নহে। এমন অনেক ধাতুদ্রব্য আছে, যাহাকে নাড়া না দিলেও আপনা আপনি স্বভাবে ঘুরিয়া আইসে। একটা তারে একটা মোচড় দিলে প্রথমে পাক লাগে, কিন্তু তারটার পাক আবার আপনা হইতেই খুলিয়া যায়, কতকটা সেইরূপ।

ফলে স্থিতিস্থাপক দ্রব্যমাত্রেরই স্থিতিস্থাপকতার একটা সীমা আছে। স্থিতিস্থাপক তারকে মোচড়ান দিলে পাক লাগে, আবার স্থিতিস্থাপকতাগুণে আপনা হইতেই সেই পাক খুলিবারও প্রবৃত্তি থাকে। কিন্তু এই সীমার ভিতরে মোচড় দিলেই পাক খুলে। সীমা ছাড়াইয়া গেলে, আর সে পাক আপনা হইতে খুলে না। তখন জোর করিয়া আবার পাক খুলিতে হয়।

ইস্পাতে ও সীসাতে এইখানে প্রভেদ; কুঞ্চিত করিয়া ছাড়িয়া দিলে আপনা হইতে ইস্পাত ঘুরিয়া আসে। সীসাকে বাঁকাইয়া ধরিলে উহার আকুঞ্চন স্থায়ী হইয়া যায়।

ধাতুপদার্থের অণুগুলাতেও যেন এইরূপ একটা স্থিতিস্থাপকতা-ধর্ম্ম আছে। তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা পাইয়া অণুগুলি স্বস্থানচ্যুত হইয়া পড়ে ও আপনার স্থিতিস্থাপকতাগুণে আবার স্বস্থানে ঘুরিয়া আসিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ধাক্কাটা যদি অতিমাত্রায় প্রবল হইয়া উহাদিগকে স্থিতিস্থাপকতার সীমা ছাড়াইয়া স্থানভ্রষ্ট করিয়া দেয়, তাহা হইলে আর আপনা হইতে ফিরিয়া আসিতে পারে না। তখন জোর করিয়া নাড়া দিয়া আঙ্গুলের ঠেলা দিয়া উহাদিগকে ঘুরাইয়া আনিতে হয়। এইজন্য coherer যন্ত্রে আঙ্গুলের ঠোকর দেওয়া আবশ্যক হয়।

দ্বিতীয় আবিষ্কার আরও বিচিত্র। এ পর্য্যন্ত জানা ছিল যে, তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা পাইলে ধাতুচূর্ণের তাড়িত প্রবাহ-পরিচালন-ক্ষমতা বাড়িয়া যায়। জগদীশচন্দ্র দেখান, কতিপয় ধাতুর পরিচালন-ক্ষমতা বাড়ে, কিন্তু অনেক ধাতুর পরিচালন-ক্ষমতা আবার কমিয়া যায়। এইরূপে "সোনা রূপা আদি করি যত ধাতু আছে," সকলেরই উপর পরীক্ষা করিয়া জগদীশচন্দ্র প্রতিপন্ন করিলেন যে, ধাতুগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে; কাহারও পরিচালনশক্তি তাড়িত তরঙ্গ-সংক্ষোভে বাড়িয়া যায়; কাহারও বা কমিয়া যায়। এই তথ্যটি সম্পূর্ণ নূতন তত্ত্ব; ইউরোপে এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। তাড়িত তরঙ্গের সহিত পরিচালনশক্তির এই সম্বন্ধ কেবল ধাতু বিশেষেই আবদ্ধ নহে, ধাতুপদার্থ মাত্রেই—কেবল ধাতুপদার্থ কেন—ধাতু, অপধাতু বা অধাতু সকল পদার্থেই অল্পবিস্তর পরিমাণে বর্ত্তমান আছে, তাহা প্রতিপন্ন হওয়ায় জড় পদার্থের একটা নূতন ধর্ম্মের আবিষ্কার হইল বলা যাইতে পারে। মাইকেল ফ্যারাডে বহু দিন পূর্ব্বে পদার্থমাত্রেরই চুম্বকত্ব

প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন। এই নূতন আবিষ্কারের সহিত সেই প্রাচীন আবিষ্কারের অনেকটা তুলনা হইতে পারে।

গোটা সত্তর মূল পদার্থ এখন রাসায়নিকগণের পরিচিত। ইহাদের সকলেরই পরিচালকতা তাড়িত তরঙ্গের প্রতিঘাতে পরিবর্ত্তিত হয়; ইহা প্রতিপন্ন হইল। আবার কোন দ্রব্যের পরিচালকতা বাড়ে, কাহারও কমে; এই হ্রাসবৃদ্ধি মাত্রায় আবার তারতম্য আছে। কোন দ্রব্যের বেশী বাড়ে, কাহারও কম বাড়ে; কাহারও বেশী কমে, কাহারও কম কমে; এই হ্রাসবৃদ্ধির মাত্রা অনুসারে মৌলিক পদার্থগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইয়া দেখিলে একটা বিস্ময়কর রহস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

রুশীয় রাসায়নিক মেন্দেলীয়েফ পরমাণুর গুরুত্ব অনুসারে মৌলিক পদার্থগুলিকে সাজাইতে গিয়া উহাদের মধ্যে এক বিচিত্র সম্বন্ধের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সত্তরটি মূল পদার্থের মধ্যে পরস্পর একটা অদ্ভুতগোছ জ্ঞাতিসম্পর্ক বর্ত্তমান আছে, মেন্দেলীয়েফের অনুসন্ধানে তাহা প্রকাশ পায়। ক্রুক্স প্রভৃতি বহু পণ্ডিত সেই জ্ঞাতিসম্পর্কের বিচার করিয়া এই সত্তর প্রকার দ্রব্য কিরূপে একই মূল দ্রব্যের বিকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা নিরূপণের জন্য কতই না প্রয়াস পাইয়াছেন। বিবিধ প্রাণিজাতির ও উদ্ভিজ্জাতির মধ্যে জ্ঞাতিসম্পর্কের সন্ধান পাইয়া ডারুইন যেমন এই বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি প্রণালীর আবিষ্কারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এই সত্তর জাতীয় মূল পদার্থের মধ্যেও সেইরূপ জ্ঞাতিসম্পর্কের স্পষ্ট চিহ্ন দেখিয়া উহাদেরও সৃষ্টি প্রণালী আবিষ্কারের জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টা অদ্যাপি সফল হইয়াছে, বলা যায় না। জড় পদার্থের বিবিধ জাতির সৃষ্টি-রহস্য ভবিষ্যতের যে ডারুইন আবিষ্কার করিবেন, তিনি এখনও জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, জানি না; কিন্তু জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত সম্পর্ক মেন্দেলীয়েফের আবিষ্কৃত সম্পর্কের সমর্থন দ্বারা তাঁহার পথ অনেকটা সুগম করিবে, সন্দেহ নাই।

তাড়িত তরঙ্গের প্রতিঘাতে কোন বস্তুর পরিচালকতা বাড়ে, কাহারও কমে। কিন্তু এখানেই কথা ফুরাইল না। এই আঘাতের প্রবলতানুসারে আবার একই ধাতুরই পরিচালকতা হয়ত কমে, অথবা বাড়ে। আঘাতের তারতম্যানুসারে কখনও বা বাড়িয়া যায়, কখনও বা কমিয়া যায়। আবার যে সকল ধাতুর পরিচালকতা সহজে বাড়ে কমে না, তাহাকে একটু গরম করিলে আবার বাড়িতে থাকে বা কমিতে থাকে। অণুগুলি যেন জমাট বাঁধিয়া ছিল; উত্তাপ পাইয়া তাহারা কতকটা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল, স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া হেলিবার দুলিবার অবকাশ পাইল। এখন তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কায় তাহারা হয় এ-দিকে, কিম্বা ও-দিকে হেলিয়া পড়িবার অবকাশ পাইল।

কেবল যে মৌলিক পদার্থেরই এরূপ তরঙ্গাঘাতে অবস্থাবিকার ঘটে, তাহা নহে। যৌগিক পদার্থেরও এইরূপ তরঙ্গের ঘা পাইয়া প্রতিক্রিয়া উৎপাদনের ক্ষমতা বর্ত্তমান রহিয়াছে। জগদীশচন্দ্র লোহাভস্ম (সাদা কথায়, লোহার মরীচা) লইয়া তদুপরি তাড়িত তরঙ্গের আঘাত দিয়া উহার অদৃশ্য অণুগুলিকে কিরূপে নাচাইয়া দিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত বর্ণনা নিতান্তই কৌতুকজনক।

তরঙ্গপ্রতিঘাতে ধাতুচূর্ণের পরিচালকতা বৃদ্ধি পায় দেখিয়া খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক লজ সাহেব একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করিয়াছিলেন। উপরে তাহার আভাস দিয়াছি। তরঙ্গের ধাক্কা পাইয়া কণিকাগুলির অণুগুলি কতকটা সংহত ও সন্নিকৃষ্ট হয় ও জমাট বাঁধে; যাহারা ছাড়াছাড়ি ছিল, তাহারা কাছাকাছি আসে; ফলে পরিচালকতা বাড়িয়া যায়। এই সংহতি বাড়ে বলিয়াই পরিচালকতা বাড়ে। সংহতির ইংরাজি নাম cohesion, এই জন্য ধাতুচূর্ণ-নির্ম্মিত ঊর্ম্মিনির্দেশক যন্ত্র coherer আখ্যা পাইয়াছে।

কিন্তু যদি কোন দ্রব্যের পরিচালকতা বাড়ে, কাহারও আবার কমে; এবং সেই একই দ্রব্যের পরিচালকতা কখনও বা বাড়ে, কখনও বা কমে;

ইহাই যদি স্থির হইল, তাহা হইলে আর সংহতির ব্যাখ্যা অমূলক হইয়া দাঁড়ায় ; অধ্যাপক লজের সিদ্ধান্তও ভিত্তিহীন হইয়া পড়ে।

মোটা কথায় তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা খাইলে জড় পদার্থ মাত্রেরই,—ধাতুই বল, আর অপধাতুই বল, জড় পদার্থমাত্রেরই পৃষ্ঠদেশের অণুগুলি বিচলিত ও স্থানভ্রষ্ট হইয়া এ-দিকে ও-দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। এ-দিকে বিক্ষিপ্ত হইলে পরিচালনশক্তি বৃদ্ধি পায় ; ও-দিকে বিক্ষিপ্ত হইলে পরিচালনশক্তি হ্রাস পায়। এই নূতন ব্যাখ্যাই এখন সঙ্গত বোধ হইতেছে।

আবার অণুগুলি স্থানভ্রষ্ট ও বিচলিত হইলেও স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপকতা বলে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে সচেষ্ট থাকে। কাজেই বিচলিত হইলেও কিছুক্ষণ পরে আপনা হইতেই স্বস্থানে ফিরিয়া আসে ও স্বাভাবিক পরিচালনশক্তি ফিরিয়া পায়। প্রবল ধাক্কা পাইলে স্থিতি-স্থাপকতার সীমা অতিক্রান্ত হইয়া যায়, তখন আর আপনা হইতে ফিরিতে পারে না ; তবে বাহির হইতে কেহ নাড়িয়া দিলে বা উত্তাপ প্রয়োগ করিলে, আবার স্বভাবে ফিরিয়া আসে। ফিরিয়া আসিবার সময় কখনও বা স্বস্থান ছাড়িয়া অন্যমুখে কিছুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। পেণ্ডুলমকে যেমন ডাহিনে তুলিয়া ছাড়িয়া দিলে স্বস্থানে আসিবার চেষ্টা করে, এবং চেষ্টা করিতে গিয়া আবার বামে উঠিয়া পড়ে, কতকটা সেইরূপ। এইরূপ, যাহা ক্ষণেকের জন্য অতিপরিচালক হইয়াছিল, তাহা আবার ক্ষণেকের জন্য অপরিচালক হইয়া পড়ে।

জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারস্রোত যদি এই পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়া যাইত, তাহা হইলেও তাঁহার কার্য্যের জন্য বিস্মিত হইয়া নিরস্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু সেই স্রোত এখন যে নূতন মুখ অবলম্বন করিয়া নূতন পথে চলিয়াছে, তাহাতে কোথায় যে আমাদিগকে লইয়া যাইবে, এবং কোন্ কূলহীন প্রকাণ্ড মহাসাগরে লীন হইয়া আমাদিগকেও ভাসাইয়া দিবে, তাহা বিস্ময় ও চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। তিনি যে গঙ্গাপ্রবাহ স্বর্গ হইতে ধরাতলে

নামাইয়া আনিবার প্রয়াস করিতেছেন, তাহার স্পর্শলাভে কোন্ সগর-সন্তানের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে, তাহা বলিতে পারি না; যিনি অগ্রণী হইয়া এই পুণ্যধারার পথ প্রদর্শন করিতেছেন, তিনিও হয়ত জানেন না, ইহার সমাপ্তি কোথায়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ভূমিকাস্বরূপ দুই একটা পুরাতন কথার আলোচনা আবশ্যক।

নির্জ্জীব জড়ের ও জীবন্ত জীবের মধ্যে বিবিধ সাদৃশ্য থাকিলেও, উভয়ের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। জীবদেহে সাধারণ জড়ধর্ম্ম সমুদায়ই বিদ্যমান আছে; তবে জড়ধর্ম্ম ব্যতীত কোন অসাধারণ ধর্ম্ম বা অতিজড় ধর্ম্ম—যাহা নির্জ্জীব জড়ে বিদ্যমান নাই, এরূপ কোন অসাধারণ ধর্ম্ম—বিদ্যমান আছে কি না, তাহা বিচার্য্য বিষয় হইয়া রহিয়াছে। জীবদেহে রক্তসঞ্চালন, শ্বাসগ্রহণ, খাদ্যপরিপাক প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলি সাধারণ জড়বিজ্ঞানের পরীক্ষিত তত্ত্বগুলির সাহায্যে বুঝা যাইতে পারে; তিন্তু তথাপি জীবশরীরের সমগ্র প্রক্রিয়া বর্ত্তমান জড়-বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝা যায় না। গতিবিজ্ঞান, আর তাপবিজ্ঞান, আর তাড়িতবিজ্ঞান, আর রসায়নবিজ্ঞান প্রভৃতির সাহায্যে শারীরিক প্রক্রিয়ার অর্থ কতক কতক বুঝা যায়, কিন্তু সমস্ত বুঝা যায় না।

পণ্ডিতগণের মধ্যে দুই শ্রেণী আছে, এক শ্রেণীর পণ্ডিতে বলেন,—জীবন-তত্ত্বের সমগ্র ভাগ জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে বুঝিবার কখনও সম্ভাবনা নাই। তাপ ও তাড়িত ও রাসায়নিক ক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোনরূপ অজ্ঞাত ক্রিয়ার প্রভাবে জীবনযন্ত্র প্রধানতঃ কাজ করে। সেই অজ্ঞাত অপরিচিত শক্তিকে vital force বা জীবনীশক্তি বা এইরূপ একটা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। উহা জড়বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে বা হইবে না। জড়-পদার্থে এই জীবনীশক্তি নাই; কাজেই উহা জড়। জীবদেহে উহারই প্রভুত্ব; এই জন্য জীবদেহে জীবন। জীবে ও জড়ে এই জন্য মূলগত বিরোধ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর পণ্ডিতের মত অন্যরূপ। তাঁহারা স্বতন্ত্র জীবনীশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, এখন আমরা জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে সমস্ত জীবনক্রিয়া বুঝাইতে পারি না বটে, কিন্তু জড়বিজ্ঞানের উন্নতিসহকারে এমন দিন আসিবে, যখন আমরা প্রাকৃতিক পরিচিত শক্তিসমূহের সাহায্যেই জীবনের কাজ সমস্ত বুঝাইতে পারিব। জীবের ও জড়ের মধ্যে এখন যে ব্যবধান দেখা যাইতেছে, তাহা তখন থাকিবে না। বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে কোন মূলগত প্রভেদ নাই। জীব-দেহে ও জড়দেহে কোন মৌলিক প্রভেদ নাই। জীববিজ্ঞান কালে জড়বিজ্ঞানেই পরিণত হইবে।

ফলে অনেক সময়ে দেখা যায়, উভয় পক্ষে মতের প্রকৃত অনৈক্য নাই ; কেবল অকারণে কথা কাটাকাটি হইয়া বিতণ্ডার সৃষ্টি হইতেছে। মূলে কেবল কথার অর্থ লইয়া ঝগড়া। এখানেও অনেকটা সেইরূপ।

বর্ত্তমান কালে আমরা জড় উপকরণ জীবশরীর নির্ম্মাণ করিতে পারি না, এ কথা গোপন করিবার প্রয়োজন নাই। অনেক জৈব পদার্থ, ইংরাজিতে যাহাকে অর্গানিক পদার্থ বলে, যথা—ঘি, তেল, চিনি, মদ প্রভৃতি পদার্থ, যাহা সচরাচর প্রাণিদেহে বা উদ্ভিদের দেহমধ্যে নির্ম্মিত হয়, তাহা আজকাল জড় উপাদানেও নির্ম্মিত হইতেছে। এমন দিন ছিল, এই সকল পদার্থ মানুষে জড় উপাদান লইয়া প্রস্তুত করিতে পারিত না। ঘির জন্য গরু ও তেলের জন্য সরিষাগাছ ও চিনির জন্য ইক্ষুদণ্ড ও মদের জন্য দ্রাক্ষালতা প্রভৃতির অনুগ্রহের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইত। কিন্তু আজকালকার রাসায়নিক পণ্ডিতেরা এই সকল জৈব অর্থাৎ জীবজ পদার্থ জড় উপাদান হইতে অবাধে নির্ম্মাণ করিতে পারেন। এই জন্য তাঁহাদের এক সময়ে অত্যন্ত দুরাশা হইয়া পড়িয়াছিল যে, রাসায়নিক পণ্ডিত খানিক কয়লা, আর জল, আর আমোনিয়া উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিয়া ডাল রুটী, এমন কি, মাছ মাংস পর্য্যন্ত তৈয়ার করিয়া ফেলিতে পারিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে

তাঁহাদের সে আশা অদ্যাপি ফলবতী হয় নাই। এখনও ডাল রুটী ও মাছ মাংসের জন্য রসায়নবিদের পরীক্ষাগারে না গিয়া প্রকৃতিদেবীর বৃহত্তর কর্ম্মশালায় উপস্থিত হইতে হয়, এবং শীঘ্র যে সে আশা সফল হইবে, তাহাও বোধ হয় না।

পক্ষান্তরে কিছুদিন পূর্ব্বে অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস ছিল, এবং অদ্যাপি অনেক পণ্ডিতের বিশ্বাস আছে যে, জড় পদার্থ হইতে কৃমি কীট, মাছি, মশা প্রভৃতি জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রাণিবর্গকে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই বিশ্বাস হইতে মুক্ত ছিলেন বলা যায় না। কিন্তু অধিক দিনের কথা নহে, এই বিশ্বাসের মূলভিত্তি পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়াছে। যতদূর দেখা গিয়াছে, তাহাতে জড় পদার্থ হইতে জীবের উৎপত্তির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। জীব হইতেই নূতন জীব জন্মে; বীজ হইতে গাছ হয় ও বীজ হইতেই জন্তু হয়। এখন জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের ইহাই ধ্রুব বিশ্বাস। স্বেদজ প্রাণীর অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। মানুষ হইতে কীট পর্য্যন্ত সকলেই অণ্ডজ।

জীবের উৎপাদন দূরে থাক, যে মশলায় জীবদেহ নির্ম্মিত, ইংরাজিতে যাহাকে প্রোটোপ্লাজম বলে, যাহার বাঙ্গলা পারিভাষিক প্রতিশব্দ খুঁজিয়া মিলিল না, তাহা এ পর্য্যন্ত জড় উপাদানে নির্ম্মাণ করিবার কোন উপায়ই দেখা যায় না। সেই প্রোটোপ্লাজম পদার্থ এখনও কোনও রসায়নবিৎ কয়লা, জল ও আমোনিয়ার সাহায্যে নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। যদি কখনও সমর্থ হয়েন, তখন জীবের ও জড়ের ব্যবধান দূর হইয়াছে বলিয়া নৃত্য করিবার কারণ মিলিবে; এখন নহে। কাজেই উভয়ের মধ্যে সম্প্রতি প্রকাণ্ড ব্যবধান বিদ্যমান। কিন্তু—

প্রোটোপ্লাজম এখনও নির্ম্মিত হয় নাই, সুতরাং জীবদেহ জড় উপাদানে ঠিত হইলেও সেই জড় উপাদানগুলি লইয়া আমরা জীবদেহ নির্ম্মাণ

করিতে পারি না। আমরা পারি না; কিন্তু প্রকৃতি পারেন। নৈসর্গিক কারণে জড় উপাদানেই জীবদেহ গঠিত হইতেছে। উদ্ভিদের শরীর বা জন্তুর শরীর বিশ্লেষণ করিয়া জড় উপাদান ব্যতীত অন্য উপাদান এক কণিকাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কিন্তু আমরা কিই বা পারি? আমরা জীবদেহনির্ম্মাণে অসমর্থ; জড়দেহনির্ম্মাণেই কি আমরা সমর্থ? যখন আমরা উদজান পোড়াইয়া জল তৈয়ার করি, আর গন্ধক পোড়াইয়া গন্ধকদ্রাবক প্রস্তুত করি, সে নির্ম্মাণ কি আমাদেরই কাজ? এক হিসাবে উহা আমাদের কাজ বটে, আর এক হিসাবে আমাদের কাজ নহে, উদজান আপনা আপনি প্রাকৃতিক ধর্ম্মবশে অম্লজান সংযুক্ত হইয়া পড়ে ও জলে পরিণত হয়; গন্ধকও আপনা আপনি প্রাকৃতিক ধর্ম্মবশে পুড়িয়া গন্ধকদ্রাবকে পরিণত হয়, আমাদের সেখানে প্রভুত্ব বা কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই। কাজেই উহা আমাদের কৃত কর্ম্ম নহে। আমরা জিনিসগুলাকে এমন ভাবে সাজাইয়া গোছাইয়া যোজনা করিয়া দিই, উদজানে হাওয়া মিশাইয়া আগুন ধরাইয়া দিই, আর গন্ধকে আগুন ধরাইয়া হাওয়া আর জল মিশাইয়া দিই, তখন উদজান আর গন্ধক আপনা হইতে প্রাকৃতিক ধর্ম্মে পুড়িতে থাকে ও জল তৈয়ার হয় ও গন্ধকদ্রাবক তৈয়ার হয়। এইটুকুই যা আমাদের কর্ত্তৃত্ব। অর্থাৎ, আমাদের যা কিছু কর্ত্তৃত্ব এই যোজনাকার্য্যে; পাঁচটা উপকরণকে আমরা এইরূপে জোটাইয়া দিয়া থাকি, যাহাতে উহারা আপন আপন ধর্ম্মবশে নূতন নূতন জিনিসের উৎপত্তি করে।

জীবদেহের নির্ম্মাণ সম্বন্ধেও সেই কথা। জল আর গন্ধকদ্রাবক আমরা জড় উপাদান লইয়া নির্ম্মাণ করি; কিন্তু জড় উপাদান লইয়া জীবদেহ নির্ম্মাণ করিতে পারি না। উভয়ে এই ব্যবধান। কিন্তু সেই ব্যবধানের অর্থ কি? এই নির্ম্মাণের অর্থ কি? নির্ম্মাণ আমরা করি না; নির্ম্মাণ প্রকৃতি করেন; প্রাকৃতিক ধর্ম্মে নির্ম্মাণকার্য্য চলে, উভয়ত্রই চলে।

আমাদের নির্ম্মাণের নাম যোজনা। একত্র আমরা এই যোজনায় সমর্থ; অন্যত্র এই যোজনাকার্য্যে অসমর্থ। জীবদেহেও জড় উপাদান ব্যতীত অজড় অপরিচিত অজ্ঞাত উপাদান কিছুই বিদ্যমান নাই। সেই কয়লা আর উদজান আর অম্লজান আর যবক্ষারজান, সমস্তই জড় পদার্থ—নিতান্ত পরিচিত জড় পদার্থ। কিন্তু এই সকল জড় উপাদানগুলিকে কিরূপে যোজনা করিলে প্রোটোপ্লাজম গঠিত হইবে, কিরূপে উপাদানগুলিকে সাজাইয়া গোছাইয়া সমাবেশ করিলে প্রোটোপ্লাজম ও জীবদেহ নির্ম্মিত হইবে—প্রাকৃতিক ধর্ম্মবশে নির্ম্মিত হইবে, তাহা আমরা অদ্যাপি জানি না। এই যোজনা-কার্য্যে আমরা একান্তই অজ্ঞ, কাজেই আমাদের জীবদেহনির্ম্মাণচেষ্টা অদ্যাপি সফল হয় নাই। প্রকৃতিতে এই নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছে; প্রকৃতির কারখানায় জড়দেহ ও জীবদেহ, উভয়ই আপনা আপনি সর্ব্বদাই নির্ম্মিত হইতেছে। জড় হইতেই জড় নির্ম্মিত হইতেছে ও জীবদেহ হইতে জীবদেহ ও জড়দেহ, উভয়ই নির্ম্মিত হইতেছে। প্রকৃতিতে সেই যোজনা-কার্য্য ঘটে বলিয়া জড়দেহ ও জীবদেহ, উভয়ই নিয়ত গঠিত হইতেছে। জড়দেহের নির্ম্মাণানুযায়ী যোজনাকার্য্যে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। কিন্তু জীবদেহ নির্ম্মাণের জন্য যে যোজনার প্রয়োজন, তাহা আমরা এখনও শিখিতে পারি নাই। কাজেই আমরা সেখানে অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ, অসমর্থ।

এমন দিন আসিতে পারে, যখন আমরা প্রকৃতির কর্ম্মশালায় কার্য্য-প্রণালীর অনুসন্ধান ও আলোচনা করিতে করিতে জানিতে পারিব যে, কিরূপে উপাদানগুলির সমাবেশ করিলে জীবদেহ নির্ম্মিত হইতে পারিবে। তখন অবশ্যই আমরা জীবদেহ "নির্ম্মাণ" করিতে সমর্থ হইব। আবার এমন দিন না আসিতেও পারে; যদি না আসে, তাহা হইলে আমরা জীবদেহগঠনে কখনই সমর্থ হইব না। তাহা হইলে আমাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে রুটি মাংস কোন কালেই প্রস্তুত হইবে না। অথবা হয় ত পৃথিবীর নৈসর্গিক অবস্থা এখন এমন পরিবর্ত্তিত হইয়া

গিয়াছে যে, আর এখন জড় উপাদানের সেইরূপ সংযোজন-ঘটনাই জীবনীশক্তির সাহায্য ব্যতীত অসাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। এখন কেবল জড়শক্তির সাহায্যে জড় উপাদান হইতে জীবদেহের নির্ম্মাণচেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

সে যাই হউক, আমাদের পক্ষে নির্ম্মাণের অর্থ যোজনা মাত্র, এবং জীবই বল, আর নির্জ্জীবই বল, সর্ব্বত্রই নৈসর্গিক নিয়মে গঠনকার্য্য চলে, তাহার উপর আমাদের প্রভুত্ব কিছুই নাই। আমরা এক জায়গায় যোজনা-কার্য্যে সমর্থ হইয়াছি, অন্যত্র এখনও হই নাই বা হইতে পারিব না; এই যুক্তির দোহাই দিয়া জীবের ও নির্জ্জীবের মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য রহস্যময় প্রাচীর নির্ম্মাণ করিবার আবশ্যকতা আদৌ দেখা যায় না।

আসল কথা, যাঁহারা জীবনী-ক্রিয়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মের অতীত বলিতে চাহেন, এবং জীবনীশক্তি নামে একটা অতিপ্রাকৃত শক্তির কল্পনা ছাড়িতে চাহেন না, তাঁহারা সকল সময়ে স্পষ্ট কথা না বলিলেও তাঁহাদের মনের মধ্যে একটা গোল আছে। মনুষ্যজাতির অধিকাংশ লোকে "সৃষ্টি-কর্ত্তা" নামক এক সৃষ্টিছাড়া "কি-জানি-কি-ময়" পদার্থ কল্পনা করিয়া মনের বোঝা লঘু করিবার চেষ্টায় রহিয়াছে। প্রকৃতির কর্ম্মশালায় যখন একটা অদ্ভুত গোছের রহস্যাবৃত যোজনা-ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে মানুষের চিন্তায় তাহার তথ্যভেদ ও রহস্যভেদ কুলায় না, অথচ মনের বোঝা ভারী হইয়া আসে, তখন মানুষ সেই বোঝাটা এই কল্পিত সৃষ্টিকর্ত্তার উপরে নিক্ষেপ করিয়া নিজে অব্যাহতি লাভ করে ও বিশ্রামভোগের অবসর পায়। জাগতিক ব্যাপারের সর্ব্বত্র এই সৃষ্টিকর্ত্তার প্রভুত্বের আরোপ করিয়া, স্বয়ং চিন্তার দায় হইতে মুক্তি পাইয়া অত্যন্ত আরাম পায়; এবং যখনই কোন ব্যক্তি যবনিকা উত্তোলন করিয়া প্রকৃতির কোন একটা অজ্ঞাত রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করেন, তখনই সেই মনঃকল্পিত প্রভুর শক্তি-সঙ্কোচের আশঙ্কা করিয়া চীৎকারে ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত করিতে থাকে। এই

শ্রেণীর লোকের জন্য এই কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, প্রকৃতির রহস্যাবরণ উন্মোচন করিয়া গুপ্ত তথ্যের আবিষ্কার করিবার, অথবা প্রকৃতির নাট-মন্দিরের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থ ব্যবধান ভেদ করিবার শক্তি ও অধিকার যখন মানুষের আছে; এবং সেই শক্তি জ্ঞানের ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত হওয়াতেও যদি সৃষ্টিকর্ত্তার প্রভুশক্তি সঙ্কুচিত না হইয়া থাকে, এখনও হইবার কোন আশঙ্কা নাই। মাধ্যাকর্ষণ ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের আবিষ্ক্রিয়ায় ও অন্যান্য বিবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ তথ্যের আবিষ্কারে পুনঃ পুনঃ এই ব্যবধান ভগ্ন হইয়াছে গিয়াছে; এখন জীব ও নির্জ্জীবের মধ্যে পর্দ্দাটা কেহ তুলিয়া ফেলিলেও বিশ্বব্যাপার বিপর্য্যস্ত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

জীবনীশক্তি নামক কোন অজ্ঞাত শক্তির অস্তিত্ব আছে কি না, তাহার বিচারের এখনও সময় হয় নাই। আধুনিক জড়বিজ্ঞান যে কয়টি শক্তির অস্তিত্ব অবগত আছে, তদ্ব্যতীত অন্য কোন শক্তি যে থাকিবে না, তাহার কোনই কারণ নাই। তাপ ও তাড়িত ও রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যেই যে সমস্ত জীবনীক্রিয়ার তথ্য বুঝান যাইবে, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। বিজ্ঞানের ইতিহাসেই নিত্য নূতন শক্তির সহিত, অথবা একই শক্তির অভিনব মূর্ত্তির সহিত আমাদের নূতন পরিচয় স্থাপিত হইতেছে। তখন জীবনীক্রিয়ার জন্য যদি একটা অভিনব, অচিন্তিতপূর্ব্ব বা অজ্ঞাতপূর্ব্ব শক্তি বা শক্তির অভিনব মূর্ত্তি, কালে আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে বিস্ময়ের কোনই কারণ নাই। এবং এই শক্তিকে জীবনীশক্তি বা Vital force বা যাহা ইচ্ছা নাম দাও, তাহাতেও কিছুই আসে যায় না। কিন্তু সেই শক্তির কার্য্যপ্রণালীর সহিত যখন আমাদের পরিচয় হইবে, তখন উহা প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত প্রাকৃতিক শক্তি ভিন্ন নিয়মবন্ধনহীন অতিপ্রাকৃত শক্তিরূপে গণ্য হইবে না।

জীবন্ত জড়দেহ আর নির্জ্জীব জড়দেহে প্রধান বিভেদ কতকটা এইরূপ, —

(১) জীবদেহে বাহির হইতে কোন শক্তি কাজ করিলে উহা সাড়া দেয়। এই সাড়া দিবার ক্ষমতা জীবদেহের প্রধান ও বিশিষ্ট লক্ষণ চিমটি কাটিলেই মাংসপেশীর সঙ্কোচন ঘটে; চোখের স্নায়ুতন্ত্রীতে আলোক-তরঙ্গের ধাক্কা লাগিলেই মস্তিষ্কযন্ত্র বিচলিত হইয়া হাত পায়ের মাংসপেশীকে নাড়িয়া দেয়। কখনও বা সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দেয়, তখনই তাহার ফল টের পাওয়া যায়। কখনও বা বহু বৎসর পরে তাহার ফল প্রকাশ পায়। আজ বাহিরের শক্তি সহসা স্নায়ুযন্ত্রে একটা ধাক্কা দিয়া গেল; সেই ধাক্কাটা সম্প্রতি স্নায়ুযন্ত্রে কোনরূপে আবদ্ধ হইয়া থাকিল। আবার পঞ্চাশ বৎসর পরে স্বপ্নে বা জাগ্রদবস্থায় সেই ধাক্কার ফল সহসা প্রকাশ পাইল। পেশীযন্ত্র ও স্নায়ুযন্ত্রঘটিত যাবতীয় ব্যাপারের মূলে এই সাড়া দিবার ক্ষমতা। এবং এই সাড়া দিবার শক্তি আছে বলিয়াই জীবদেহ জড়জগতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষণে সমর্থ। জীবদেহ এমন ভাবে, এমন সময়ে সাড়া দিবার চেষ্টা করে, যাহাতে তাহার মঙ্গল ঘটে, যাহাতে তাহার আত্মরক্ষণ ঘটে। এইরূপ সাড়া দিবার ক্ষমতা, এই responsiveness জড়দেহে বর্ত্তমান দেখা যায় না। জড়দেহেও বাহ্য শক্তির সংঘাতে সঙ্গে সঙ্গে বিকার জন্মে বটে, কিন্তু তাহা ঠিক এরূপ নহে। উভয়ের মধ্যে অনেকটা তফাত। কিরূপ তফাত, তাহা সহজে অল্প অল্প কথায় বুঝান যায় না। তবে জড়-দেহের ও জীবদেহের এ বিষয়ে পার্থক্য এত স্পষ্ট যে, এ স্থলে তজ্জন্য বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন দেখি না। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার জীবনের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাও প্রধানতঃ এই সাড়া দিবার ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের মতে বাহ্য ব্যাপারের সহিত আভ্যন্তর ব্যাপারের সামঞ্জস্য ও সঙ্গতিরক্ষার অবিরাম নিরন্তর প্রয়াসের নামই জীবন। বাহ্য জগত হইতে বিবিধ শক্তি জীবদেহকে নিরন্তর আক্রমণ করিতেছে, জীবদেহ আবশ্যকমত তাহার সাড়া দিয়া, অর্থাৎ আবশ্যকমত বিলম্বে বা অবিলম্বে আত্মপ্রসার বা আত্মসঙ্কোচ বা আত্মবিকার সাধিত করিয়া, সেই আক্রমণ

নিবারণের বা আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। এই প্রতিক্রিয়ার নিরন্তর চেষ্টার নামই জীবন।

(২) জীবদেহের আত্মপোষণের বা বৃদ্ধির ক্ষমতাও জড়দেহ হইতে স্বতন্ত্র। নির্জ্জীব জড় পদার্থ তৈয়ারি মশলা আপন অঙ্গে বাহিরে বাহিরে সংলগ্ন করিয়া বৃদ্ধি পায়। যেমন, একটা মিছরীর দানা বা ফটকিরির দানা অথবা একখানা মেঘ বা কুয়াসা, আর জীবদেহ অপূর্ণগঠিত উপাদান অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া সেই উপাদান হইতে আপনার শরীরোপযোগী মশলা তৈয়ার করিয়া বৃদ্ধি পায়। গাছের পাতা হাওয়া আর জল আর ভস্ম বাহির হইতে অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া গাছের দেহ নির্ম্মাণ করে। মনুষ্যদেহ শাকান্ন অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া মাংস মজ্জা স্নায়ু নির্ম্মাণ করিয়া লয় ও বৃদ্ধি পায়।

(৩) জীবদেহ আপনাকে খণ্ডিত ও বিভক্ত করিয়া বংশ রক্ষা করে ও সন্তান উৎপাদন করে। এক খণ্ড জীবদেহ হইতে বহু খণ্ড জীবদেহ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে ও পিতৃপুরুষের সমুদয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র জীবনযাত্রা আরম্ভ করে।

প্রধানতঃ জীবদেহের প্রধান লক্ষণ, যে লক্ষণ আশ্রয়ে জীবদেহে ও জড়-দেহে প্রভেদ, উল্লিখিত তিনটি। প্রথম—জীবদেহ বাহ্য শক্তির আহ্বানে সাড়া দেয়। দ্বিতীয়—জীবদেহ বাহিরের অপূর্ণগঠিত উপাদান অভ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া তাহার পূর্ণতা সাধিত করিয়া বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়—জীবদেহ কালে কালে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বংশবিস্তার করে ও সন্তান সর্ব্বাংশেই পিতৃধর্ম্ম পাইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত জন্ম, মৃত্যু ও ব্যাধি, স্বতন্ত্র জীবধর্ম্মস্বরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না, একটু তর্কের স্থল। জন্মের অর্থ, পিতৃপুরুষ হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জীবনের আরম্ভ। উহা তৃতীয় লক্ষণের অন্তর্গত। মৃত্যু অর্থে সেই স্বাধীন জীবনের সমাপ্তি। স্পেন্সারের সংজ্ঞানুসারে বাহ্য

প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেওয়া যদি জীবনের প্রধান লক্ষণস্বরূপে ধরা যায়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, যখন জীব সেই আহ্বানে আর সাড়া দিতে পারে না, তখনই তাহার মৃত্যু। উন্নত জীবমাত্রেরই জীবনের একদিন সমাপ্তি ঘটে, সে দিন বাহির হইতে বিবিধ শক্তি আক্রমণ করিলেও সেই জীব সেই আক্রমণ নিবারণের চেষ্টা করে না; সেই দিন তাহার মৃত্যু। জীবমাত্রের না বলিয়া উন্নত জীবমাত্রের বলিলাম; কেন না, জীবমাত্রেরই মৃত্যু অনিবার্য্য, তাহা আজিকার দিনে বোধ করি আর বলা চলে না। ওয়াইজমান (Weismann) স্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন, নিকৃষ্টতম জীবের মৃত্যু অনিবার্য্য নহে; তাহারা প্রকৃতই অমরত্বের অধিকারী। জন্ম ও মৃত্যু গেল, থাকে ব্যাধি। জীব বাহ্য প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেয়, এরূপে সাড়া দেয়, যাহাতে তাহার আত্মরক্ষা চলে, যাহাতে তাহার মঙ্গল হয়। ফলে জীব এই ক্ষমতার বলে বাহ্য শক্তিকে আপনার জীবনের অনুকূল করিয়া লয়; এই অবস্থার নাম স্বাস্থ্য। আর যখন বাহ্য শক্তি জীবনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়, যখন বাহ্য শক্তির আক্রমণ নিবারণে জীব অংশতঃ অশক্ত হইয়া পড়ে, সেই অবস্থার নাম ব্যাধি। সুস্থ অবস্থায় যাহা জীবনের অনুকূল, ব্যাধির অবস্থায় তাহা প্রতিকূল। সুস্থ অবস্থায় জীব যেমন সাড়া দিতে পারে, ব্যাধির অবস্থায় তেমনটি পারে না। মৃত্যু ও ব্যাধিকে এই ভাবে দেখিলে জীবদেহের উল্লিখিত প্রথম লক্ষণের অন্তর্গত করা যাইতে পারে।

আর একটা কথা আছে। দেহপুষ্টিকে আমরা দ্বিতীয় লক্ষণ ও বংশবৃদ্ধিকে তৃতীয় লক্ষণ বলিয়া বলিয়াছি। কিন্তু আধুনিক জীবতাত্ত্বিক-গণের বিবেচনায় এই দুইটি লক্ষণের মধ্যে কোন মূলগত বিভেদ নাই। বংশবৃদ্ধি দেহপুষ্টিরই একটা অবান্তর ভেদ মাত্র, আধুনিক জীববিদ্যা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। নিম্নতম পর্য্যায়ের জীবে আত্মপুষ্টি ও বংশ-বৃদ্ধি, এই উভয় ব্যাপারের মধ্যে সীমানির্দ্দেশ প্রায় অসাধ্য। এই সকল জীবের শরীর কেবল একটি মাত্র কোষে নির্ম্মিত। খাদ্য গ্রহণ সহকারে

এই কোষটি অর্থাৎ জীবের দেহটি ক্রমে পুষ্টি পায় ও বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধি-সহকারে একটা সীমায় উপস্থিত হইবামাত্র তাহার সমগ্র শরীরটি ভাঙ্গিয়া দ্বিধাবিভক্ত হয়; একটি কোষ হইতে দুইটি কোষ নির্ম্মিত হইয়া দুইটি স্বাধীন জীবের উৎপত্তি করে। এক পিতৃপুরুষ আপনাকে দ্বিধাবিভক্ত করিয়া দুইটি সন্তানের উৎপাদন করে। পিতা বৃদ্ধ হইয়া সন্তানে পরিণত হয় মাত্র। কেবল নিকৃষ্ট জীবে কেন, উন্নত জীবের মধ্যেও এই প্রণালী বর্ত্তমান। গাছ বৃদ্ধি পাইয়া শাখা বিস্তার করে। সেই শাখাকে ছেদন করিয়া পৃথক্ ভাবে রোপণ করিলে শাখাই আবার স্বতন্ত্র বৃক্ষে পরিণত হয়। ফলে বংশপুষ্টি ও আত্মপুষ্টির মধ্যে মূলগত ভেদ বাহির করা যায় না। সুতরাং উল্লিখিত তিনটি লক্ষণকে দুইটি মাত্র লক্ষণে আনা যাইতে পারে। এবং এই দুই লক্ষণ থাকায় জড়দেহে ও জীবদেহে ব্যবধান।

জড়ে ও জীবে এখন এই দুই বিষম ব্যবধান বর্ত্তমান। জগদীশচন্দ্রের নূতনতম আবিষ্ক্রিয়ায় ইহার মধ্যে একটা ব্যবধান, অর্থাৎ প্রথম ব্যবধান দূর হইবার উপক্রম হইয়াছে।

জীবদেহের এই বাহ্য শক্তির প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা, এই সাড়া দিবার ক্ষমতা, এই responsiveness, জীবদেহের প্রত্যেক অঙ্গেই বর্ত্তমান। এক খণ্ড মাংসপেশী লইয়া বা একটা স্নায়ুতন্ত্রী লইয়া তাহাতে চিমটি কাটিলেই ইহা বুঝা যায়। শরীরবিদ্যার যে কোন পুস্তক উদ্ঘাটন করিলেই মাংসপেশীর ও স্নায়ুতন্ত্রীর এই সাড়া দিবার শক্তি সম্বন্ধে বিবিধ তত্ত্ব পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। দুই চারিটার এখানে উল্লেখ করিব।

১। একখানা মাংসপেশীতে একটা ধাক্কা দিলেই উহা একটু পরে খানিকটা সঙ্কুচিত হয়। ধাক্কার পরেই সঙ্কোচ, তারপর ক্রমশঃ স্বভাবে ফিরিয়া আসে।

২। এই সঙ্কোচের একটা সীমা আছে। প্রবল ধাক্কায় সঙ্কোচমাত্রা এই সীমায় পৌঁছে; তার পর ধাক্কা দিলে আর সীমা ছাড়ায় না।

৩। একবারে প্রবল ধাক্কা না দিয়া সামান্ত আঘাত দিলে খানিকটা সঙ্কোচ হয়। আবার আঘাতে আর একটু সঙ্কোচ, আবার আঘাতে আর একটু। পর পর আঘাতে সঙ্কোচ একটু একটু করিয়া বাড়ে। কিন্তু প্রথম আঘাতে যতটা বাড়ে, দ্বিতীয় আঘাতে তত নহে; তৃতীয়ে আরও কম; চতুর্থে আরও কম। এইরূপে সেই সীমায় পৌছিলে সঙ্কোচ আর বাড়ে না।

প্রথম আঘাতে যতখানি সঙ্কোচ ঘটে, দ্বিতীয় আঘাতে ততখানি ঘটে না, জীবাঙ্গের এই গুণের ফল বিবিধ। এক সের বোঝার উপরে আর এক সের বোঝা স্পষ্ট ভার বাড়ায়। কিন্তু এক মণ বোঝার উপর এক সের বোঝা চাপাইলে আর তেমন ভার বোধ হয় না। শাকের আঁটি স্বতন্ত্র ভাবে ভারী, কিন্তু বোঝার উপর শাকের আঁটি নগণ্য। আবার আঁধার ঘরে প্রদীপের আলো কত উজ্জ্বল, কিন্তু সূর্য্যালোকে প্রদীপের সেই উজ্জ্বলতা কোথায়? শরীরবিদ্যা শাস্ত্রে Fechner's Law* ও Weber's Law ✠ নামে যে আঘাত ও প্রতিক্রিয়ার সম্পর্কসূচক নিয়ম আছে, তাহার মূল এই।

৪। আঘাতের পর আঘাত, সঙ্কোচের পর আর একটু সঙ্কোচ। কিন্তু এই আঘাতের পর আঘাত খুব তাড়াতাড়ি দিলে, সঙ্কোচন ব্যাপার আর বিরামের অবসর পায় না। এক টানে সঙ্কোচ ঘটে। মাংসপেশী একেবারে ধনুষ্টঙ্কারে আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

৫। আঘাত যখন খুব প্রবল হয়, তখন সঙ্কোচনের মাত্রা পরম বা চরম সীমায় পৌছে; এবং প্রবল আঘাতে এই পরম সঙ্কোচলাভের পর মাংসপেশী আর সহজে স্বভাবে ফিরিয়া আসিতে পারে না। তখন ধাক্কা দিলেও আর প্রতিক্রিয়া ঘটে না। মাংসপেশীটা যেন প্রবল আঘাতে শ্রান্ত হইয়া পড়ে, এই অবস্থার নাম ক্লান্তির অবস্থা বা শ্রান্তির অবস্থা। কালক্রমে এই শ্রান্তির অপনোদন ঘটে; সঙ্কুচিত মাংসপেশী তখন ধীরে

---

* Gustav Theodor Fechner, 1801-1887—সম্পাদক

✠ Earnst Heinrich Weber, 1795—1878—সম্পাদক

ধীরে স্বভাবে প্রত্যাবৃত্ত হয়। মাংসপেশী বা স্নায়ুযন্ত্র বা মস্তিক, জ্ঞানেন্দ্রিয়ই বল, আর কর্ম্মেন্দ্রিয়ই বল, শ্রমাতিশয্যে এই ক্লান্তিলাভ জীব-দেহের প্রত্যেক অঙ্গেরই সাধারণ ধর্ম্ম, এবং বিশ্রাম দ্বারা ক্লান্তি অপনোদনও নিত্য ঘটনা। উত্তাপপ্রয়োগে বা মর্দ্দনে ক্লান্ত মাংসপেশীর স্বাস্থ্যলাভ ঘটে।

৬। শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, মাংসপেশী আবার স্বভাবে প্রত্যাবৃত্ত হয়। মৃদু আঘাতের পর তখনই ফিরিয়া আসে, প্রবল আঘাতের পর বিলম্বে সুস্থ হয়। কিন্তু বিষময় পদার্থের সান্নিধ্য এই স্বভাবপ্রাপ্তিতে ও স্বাস্থ্যলাভে বিলম্ব ঘটায়। অথবা যে পদার্থের অস্তিত্ব এই স্বাস্থ্যলাভের অন্তরায় হয়, উহারই নাম বিষ। আর যে পদার্থ স্বাস্থ্যলাভের অনুকূল, তাহারই নাম ঔষধ।

ফলে জীবদেহমধ্যে বাহ্য পদার্থ বিদ্যমান থাকিয়া কখনও বিষের, কখনও বা ঔষধের কাজ করে। যাহা স্বাস্থ্যলাভের প্রতিকূল, তাহা বিষ; যাহা স্বাস্থ্যলাভের অনুকূল, তাহা ঔষধ। কোন দ্রব্য অবসাদক, কোন দ্রব্য উত্তেজক। আবার একই দ্রব্য মাত্রাভেদে কখনও বা উত্তেজক, কখনও অবসাদকের কাজ করে; মাত্রাভেদে বিষ বা ঔষধের ফল জন্মায়। হোমিওপাথির আচার্য্যেরা বলিবেন, যাহা মাত্রাধিক্যে বিষবৎ, তাহাই ন্যূন মাত্রায় পরম ভেষজ।

আঘাতে ও উত্তেজনায় মাংসপেশীর উল্লিখিতরূপ বিবিধ প্রতিক্রিয়া ঘটে। বিবিধ বাহ্য শক্তির প্রয়োগে মাংসপেশী ভিতর হইতে নানারূপে সাড়া দেয়। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র গত সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাডফোর্ড নগরে সমবেত ব্রিটিশ আসোশিয়েশনের এবং গত মে মাসে লণ্ডন রয়াল ইন্‌ষ্টিটুশনে বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর সমীপে যে নূতন আবিষ্কারবার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, এইরূপ প্রতিক্রিয়াশক্তি কেবল জীবদেহেই আবদ্ধ নহে। জড়দেহেরও ঠিক এইরূপ প্রতিক্রিয়াশক্তি বর্ত্তমান আছে। আঘাতে ও উত্তেজনায় মাংসপেশী বা স্নায়ুতন্ত্রী যেমন

সাড়া দেয়, তাড়িত তরঙ্গের আঘাতে নির্জ্জীব জড় পদার্থ ঠিক সেই একই রকমে সাড়া দিতে পারে।

জীবদেহে ও নির্জ্জীব জড়দেহে প্রভেদ কিসে, জিজ্ঞাসা করিলে মোটামুটি এই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে—১। জড়দেহ পরিণত উপাদানযোগে বাহির হইতে বৃদ্ধি পায়। জীবদেহ অপরিণত অপূর্ণগঠিত উপাদান বাহির হইতে সংগ্রহ করিয়া অভ্যন্তরে গ্রহণ করে ও তাহাকে পূর্ণগঠিত করিয়া স্বয়ং বৃদ্ধি পায়; এবং বৃদ্ধি পাইতে পাইতে আপনি বিভক্ত হইয়া বা আপনার কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া নূতন জীবের উৎপাদন করে। এই দুই ব্যাপারের নাম আত্মপুষ্টি ও বংশপুষ্টি। বিসদৃশ বস্তু দেহমধ্যে গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধির নাম আত্মপুষ্টি; ও আপনাকে ছিন্ন করিয়া সদৃশ বস্তুর উৎপাদনের নাম বংশপুষ্টি; উভয় ব্যাপারই মূলতঃ অভিন্ন; জীবদেহে উভয়ই বর্ত্তমান; জড়দেহে একেরও অস্তিত্ব নাই।

২। জড়দেহ বাহ্যশক্তির উত্তেজনায় বিকৃত হয় ও প্রতিক্রিয়াও উৎপাদন করে বটে, কিন্তু তাহাতে উহার শুভাশুভ কিছুই নাই। জীবদেহ বাহ্য শক্তির আক্রমণে বিকৃত হইয়া সাড়া দেয়; এবং সেই বাহ্য শক্তিকে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অনুকূল করিয়া লইতে চায়। এই সাড়া দেওয়ার অবিরাম চেষ্টা, এই আক্রমণ নিবারণের নিরন্তর প্রয়াসের নামই জীবন। যখন উচিতমত সাড়া দিতে পারে না, আক্রমণনিবারণপ্রয়াস যখন সম্পূর্ণ সফল হয় না, তখন বাহ্য শক্তি জীবনের অনুকূল না হইয়া প্রতিকূল হয়, তখনকার অবস্থা ব্যাধি; এবং যখন সাড়া দিবার ক্ষমতা চিরতরে লোপ পায়, যখন বাহ্য শক্তির আক্রমণ আর নিরস্ত হয় না, তখন মৃত্যু।

সংক্ষেপে এই দুইটা বিষয়ে জড়দেহে ও জীবদেহে পার্থক্য আছে। সে পার্থক্য কিরূপ? বৃদ্ধি পাইবার ক্ষমতা যে জড়ের একেবারে নাই, এমন নহে। বায়ুমধ্যে মেঘের শরীর ক্রমে বৃদ্ধি পায়। পর্ব্বতশীর্ষে তুষারশৈল ক্রমে বৃদ্ধি পায়, চিনির সরবতে মিছরীর দানা ক্রমে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই

জড়দেহের বৃদ্ধি ও জীবদেহের বৃদ্ধি (আত্মপুষ্টি ও বংশপুষ্টি), উভয়ের মধ্যে এতটা প্রভেদ যে, উভয় বৃদ্ধিকে এক পর্য্যায়ে ফেলিতে সাহস হয় না। সেইরূপ আবার বাহ্য শক্তির আহ্বানে নির্জ্জীব জড়ও যে সাড়া না দেয়, এমন নহে। বাত্যাবলে শৈলশিখর ভূমিসাৎ হয়, ভূকম্পে ধরাপৃষ্ঠ কম্পিত ও বিদীর্ণ হয়। পর্ব্বতবক্ষে যুগব্যাপী নৈসর্গিক উৎপাতের চিহ্নসকল অঙ্কিত রহিয়া যায়। ঐ সমস্তই বিকার বা বিক্রিয়া; কিন্তু জীবদেহে বিকার বা বিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুকূল প্রতিকার বা প্রতিক্রিয়া আছে; তাহার অনুরূপ প্রতিক্রিয়া নির্জ্জীব জড়ে খুঁজিয়া মেলে না। এই প্রতিক্রিয়াই জীবন, এই প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতাই স্বাস্থ্য, এই প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতার আংশিক বিলোপে ব্যাধি ও পূর্ণ বিলোপে মৃত্যু। জড়ের স্বাস্থ্য বা ব্যাধি বা মৃত্যু কাব্যের ভাষাতে স্থান পাইয়াছে কি না জানি না, কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষাতে উহার এতদিন স্থান ছিল না। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারে বোধ করি, উহা বিজ্ঞানের ভাষাতেও স্থান পাইতে চলিল।

লোহাভস্মের মত নিতান্ত নির্জ্জীব জড় পদার্থের উপর তাড়িত তরঙ্গের ধাক্কা দিয়া জগদীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন,—

১। তরঙ্গের উত্তেজনায় উহার পরিচালনক্ষমতা সহসা বাড়িয়া যায়। এক ধাক্কায় বাড়ে; আবার ক্রমশঃ স্বাভাবিক পরিচালকতা ফিরিয়া আসে।

২। পরিচালনশক্তির বৃদ্ধির একটা সীমা আছে, প্রবল ধাক্কায় পরিচালনমাত্রা সেই সীমায় পৌছে; তখন আর ধাক্কা দিলে বাড়ে না।

৩। ধাক্কার পর ধাক্কা দিলে প্রতি আঘাতে পরিচালনক্ষমতা একটু একটু করিয়া বাড়িয়া যায়। কিন্তু প্রথম ধাক্কায় যতটা বাড়ে, দ্বিতীয় আঘাতে ততটা নহে, তৃতীয় আঘাতে আরও কম ইত্যাদি।

৪। পুনঃ পুনঃ দ্রুতগতিতে আঘাতের পর আঘাত দিয়া বিরামের অবকাশ না দিলে পরিচালনশক্তি একটানে আপনার নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত বাড়িয়া যায়। ইহাই জড় পদার্থের ধনুষ্টঙ্কার।

৫। প্রবল আঘাতে পরিচালনশক্তি একেবারে চরম সীমায় উপস্থিত হয়। তখন আর আঘাত দিলেও কোনরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। ইহাই জড় পদার্থের ক্লান্তিলাভ। ইহাই উহার সাময়িক ব্যাধি, এবং এই ব্যাধির ফল স্থায়ী হইলেই মৃত্যু। আবার একটা নাড়া দিলে অথবা একটু গরম করিলে স্বভাবে প্রতিনিবৃত্ত হয়। প্রচলিত coherer যন্ত্রে তাড়িত তরঙ্গের আঘাতে এই ক্লান্তির অবস্থা ঘটে, নাড়া না দিলে সেই ক্লান্তির অপনোদন হয় না।

৬। নির্জ্জীব জড়দেহেও বিভিন্ন দ্রব্য প্রবেশ লাভ করিয়া কখনও অবসাদকের, কখনও বা উত্তেজকের মত কাজ করে। কোন দ্রব্যে সেই জড়দেহের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াক্ষমতা বাড়াইয়া দেয়, কোন দ্রব্যে কমাইয়া দেয়। কোনটা বিষের মত কাজ করিয়া স্বভাবপ্রাপ্তির অন্তরায় হয়; কোন দ্রব্য ঔষধের কাজ করিয়া স্বভাবপ্রাপ্তির অনুকূল হইয়া থাকে। একই দ্রব্য মাত্রাভেদে কখনও অবসাদক, কখনও বা উত্তেজক হইয়া থাকে।

তাড়িতোর্ম্মির উত্তেজনায় জড় দ্রব্য বিকৃত হয়, ইহা পূর্ব্বেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কিন্তু সেই বিকৃত অবস্থা হইতে স্বভাবপ্রাপ্তিঘটনায় জড়দেহে ও জীবদেহে এমন সাদৃশ্য রহিয়াছে, তাহা অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত সত্য। জড়দেহে বিকারপ্রাপ্তির ও স্বভাবপ্রাপ্তির নিয়ম যে জীবদেহের বিকারপ্রাপ্তির ও স্বভাবপ্রাপ্তির অনুরূপ, তাহা ইতিপূর্ব্বে কেহ জানিত না। জগদীশচন্দ্র গত বৎসর শ্রাবণ মাসে বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই জড়ের ও জীবের মধ্যে এই অচিন্তিতপূর্ব্ব সাদৃশ্যের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ আসোশিয়েশনের সম্মুখে তিনি যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতেই এই সমস্ত আবিষ্কারপরম্পরা সমবেত বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর সম্মুখে প্রথমে উপস্থিত হয়। তৎপরে তিনি লণ্ডন রয়াল সোসাইটিতে আরও কতিপয় প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন ও রয়াল ইন্‌ষ্টিটুশনে নিমন্ত্রিত হইয়া আপনার আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাধারণের সম্মুখে

উপস্থিত করিয়াছেন। ঐ সকল প্রবন্ধের যতটুকু বিবরণ এ দেশে উপনীত হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি বিজ্ঞানের গহন বনে যে নূতন মার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পুরোমুখ যাত্রা অদ্যাপি অব্যাহত রহিয়াছে। দিগ্বিজয়ী বীরের মত তিনি যাত্রাকালে মরুপৃষ্ঠে অম্ভোধারার উৎস খুলিয়া দিতেছেন, "নাব্যা নদী"কে "সুপ্রতরা" করিয়া ও কুঠারাঘাতে "বিপিন" সকলকে "প্রকাশ" করিয়া পুরোমুখে অগ্রগামী হইতেছেন।

আঘাত পাইলে মাংসপেশী সঙ্কুচিত হয়; স্নায়ুতন্ত্রীতে সঙ্কোচন-পরিবর্ত্তে তাড়িত প্রবাহের উৎপত্তি ঘটে। মাংসপেশীর সঙ্কোচন লাভের প্রণালী ও স্নায়ুতন্ত্রীর তাড়িত বিকার লাভের প্রণালী ঠিক একই নিয়মের অনুসরণ করে। শরীরবিদ্যাশাস্ত্রে এই সাদৃশ্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু স্নায়ুতন্ত্রীর সহিত একটা তামার তারের যে সাদৃশ্য আছে, তাহার উল্লেখ কোন শাস্ত্রেই নাই। একটা স্নায়ুব সূতার এক প্রান্তে আঘাত দিলে উহাতে তাড়িত প্রবাহ জন্মে, তাহা শরীরতত্ত্বজ্ঞ মাত্রেই জানেন; কিন্তু একটা তামার তারের এক প্রান্তে আঘাত দিলে, একটা মোচড় দিলে, যে তাড়িত প্রবাহের উৎপত্তি ঘটে, তাহা কেহ জানিত না।

আবার আঘাতপরম্পরায় স্নায়ুসূত্রে তাড়িত প্রবাহ একটা চরম সীমায় উপস্থিত হয; সেই সীমা আর ছাড়ায় না। সেইরূপ আঘাতপরম্পরায় তারমধ্যে তাড়িত প্রবাহ একটা চরম পরিণামের প্রতি অগ্রসর হয়, সেই চরম পরিণাম ছাড়ায় না, ইহা ইতিপূর্ব্বে কেহ জানিত না। অতিশয় উত্তাপের বা অতিশয় শৈত্যের প্রয়োগে স্নায়ুতন্ত্রী মৃতকল্প হইয়া পড়ে, তখন আর উত্তেজনা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়া ঘটে না, উহা সকলেই জানিত। কিন্তু একটা নির্জ্জীব ধাতুময় তারের তাড়িত প্রতিক্রিয়াশক্তি যে উত্তাপযোগে বা শৈত্যযোগে লোপ পায়, তাহা কেহ জানিত না। দ্রব্যগুণে স্নায়ুতন্ত্রীর উত্তেজনা বাড়ে; আবার দ্রব্যগুণে স্নায়ুতন্ত্রী অবসন্ন হয়; তাহাও সকলে জানিত। কিন্তু নির্জ্জীব ধাতুপদার্থনির্ম্মিত একটা তার যে দ্রব্যগুণে

উত্তেজিত বা অবসন্ন হয়, উহার প্রতিক্রিয়াশক্তি বাড়িয়া যায় বা কমিয়া যায়, তাহা কে জানিত? ঔষধের উপকারিতা ও বিষের অপকারিতা, মদের মাদকতা ও আফিমের অবসাদকতা, এত দিন জীবন্ত পদার্থের জীবনীশক্তির বিশেষণস্বরূপে প্রযুক্ত হইত। জড়দেহের প্রতি ঐ সকল বিশেষণপ্রয়োগ শশবিষাণ বা বন্ধ্যাপুত্রের মত নিরর্থক হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন হইতে জড়দেহের প্রতি ঐ সকল বিশেষণপ্রয়োগ অর্থশূন্য হইবে না।

প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িল; আলোকসম্পাতে চক্ষুরিন্দ্রিয় কিরূপে আহত হয়; তৎসম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র অনেকগুলি নূতন সংবাদ বৈজ্ঞানিকগণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। আলোকতরঙ্গের আঘাতে আবার চক্ষুর ভিতরে স্নায়ুযন্ত্র যেরূপ বিকার লাভ করে, আলোকতরঙ্গ ও তাড়িত তরঙ্গ উভয়েরই আঘাত পাইয়া জগদীশচন্দ্রের নির্ম্মিত কৃত্রিম চক্ষু তদনুরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়। চক্ষু দর্শনক্রিয়া সম্পাদনের জন্য যন্ত্র মাত্র; কিন্তু সেই যন্ত্রের আভ্যন্তরিক ক্রিয়াপ্রণালী কিরূপ তাহা শরীরবিদ্যাশাস্ত্র ঠিক জানে না, এখন সেই কাজকর্ম্মের প্রণালী বুঝিবার পথ বোধ হয় বাহির হইতে হইতে পারে। কিন্তু এই বৃহৎ কথার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া পাঠকগণের আর সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিব না।

জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষিত ও আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি বৈজ্ঞানিকসমাজে শেষ পর্য্যন্ত কিরূপে গৃহীত হইবে, বলা যায় না। বৈজ্ঞানিকসমাজে একটা বাহির হইতে উত্তেজনার আঘাত পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক-সমাজ-শরীর সেই উত্তেজনায় কিরূপ সাড়া দিবে, জানি না। উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান অতি দ্রুতবেগে উন্নতি লাভ করিয়াছে; কিন্তু স্থিতি-শীলতায় বৈজ্ঞানিকসমাজের কোথাও প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কেহ কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিলে বৈজ্ঞানিকসমাজ সেই ব্যক্তিকে কতকটা সন্দেহের, কতকটা আশঙ্কার সহিত দেখিতে থাকেন। নূতন সত্যকে সহসা অঙ্গীকার

করিতে চাহেন না। অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত সত্য যতই মনোরম বেশে আসুক, বৈজ্ঞানিকসমাজ তাহাকে বাস দান করিতে স্বভাবতঃ কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। জলন্ত আগুনে উহার "বিশুদ্ধি" বা "শ্যামিকা" পরীক্ষা না করিয়া উহাকে গ্রহণ করেন না। এইরূপ অগ্নিপরীক্ষার পর যাহা সত্য, তাহা উজ্জ্বলতর হইয়া বাহির হয়; আর যাহা অসত্য, তাহা অগ্নিপরীক্ষায় ভস্ম মাত্র রাখিয়া যায়। জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষিত তত্ত্বগুলিও এইরূপ অগ্নিপরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। সেই অগ্নিপরীক্ষার পর উহার আকার কিরূপ হইবে, সে বিষয়ে আমাদের বাক্যব্যয় ধৃষ্টতা মাত্র।

এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে জড়ের ও জীবের মধ্যে অন্যতর প্রধান ব্যবধান দূর হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জড়ের ও জীবের মধ্যে দুইটি প্রধান ব্যবধান রহিয়াছে, পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। বাহ্য প্রকৃতির উত্তেজনায় জীবদেহ প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করে। জীবদেহ অনুক্ষণ অবিরাম বাহ্য জগতের প্রতি এই প্রতিক্রিয়া প্রয়োগ করিতেছে; এই প্রয়োগকার্য্যে অবিরাম চেষ্টাই জীবন। জড়দেহেরও যদি সেই প্রতিক্রিয়ার ক্ষমতা বর্ত্তমান থাকে, জড়দেহ যদি বাহ্য শক্তির উত্তেজনায় বিকার লাভ করিয়া সাড়া দেয়, জড়দেহ যদি বাহ্য শক্তির আঘাতে উত্তেজিত বা অবসন্ন, ব্যাধিগ্রস্ত বা রোগমুক্ত হয়, তাহা হইলে জড়ের ও জীবের মধ্যে অন্ততঃ একটা ব্যবধান তিরোহিত হইবে। আর একটা ব্যবধান তখনও অভগ্ন রহিবে, তাহা বলা আবশ্যক। জীব, বাহ্য জগৎ হইতে খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করিয়া আত্মপোষণ করে ও আত্মপুষ্টিসহকারে বংশবৃদ্ধি সাধন করিয়া স্বয়ং সংসার হইতে অবসর লয়, আপনার বংশধরে আপন ধর্ম্মের সংক্রমণ করিয়া তাহার প্রতি জীবনের খেলা খেলিবার ভার দিয়া যায়; জীবের এই অপর লক্ষণ, এই বিশিষ্ট জীবধর্ম্ম, তখনও জড়ের ও জীবের মধ্যে ব্যবধানস্বরূপে প্রজ্ঞার চক্ষু আবৃত রাখিয়া সম্প্রদায়বিশেষকে আরও কিছু দিন সান্ত্বনা প্রদান করিবে।

জগদীশচন্দ্র বসু

॥ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ॥

জগদীশচন্দ্র বসুর মহাপ্রয়াণ

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর মহাপ্রয়াণে সমগ্র পৃথিবী, ভারতবর্ষ, বঙ্গদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। তিনি গত কয়েক বৎসর আগেকার মত বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিতেছিলেন না বটে—ব্যাধিতে তাঁহার দেহ অপটু হইয়াছিল; কিন্তু তিনি পরামর্শ, উপদেশ ও পরিচালনা দ্বারা অনেককে গবেষণার পথে অগ্রসর করিতেছিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত হইতে বহু বৈজ্ঞানিক প্রেরণা লাভ করিতেছিলেন।

আমাদের বিশ্বাস, বিজ্ঞান-জগতে নিউটন, ডারুইন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের স্থান যে-শ্রেণীতে, জগদীশচন্দ্রের স্থানও সেই শ্রেণীতে। ইহা শুধু অবৈজ্ঞানিক আমাদের মত নহে। বৈজ্ঞানিক কেহ কেহও এইরূপ মনে করেন, এবং আমরা মনে করি যে, যত সময় যাইবে ততই অধিক-সংখ্যক বৈজ্ঞানিক তাঁহার কার্য্যের প্রকৃত মর্যাদা বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

ভাস্করাচার্য্যের পর বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষ বিজ্ঞান-জগতে নূতন কিছু করে নাই। জগদীশচন্দ্রের নানা আবিষ্ক্রিয়া বিজ্ঞানে ভারতের নব জাগরণের সূচনা করে। কেবল সূচনাই যে করে, তাহা নহে, তিনি ভারতীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের দ্বারা এরূপ কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও

তথ্য আবিষ্কার করেন, যাহা পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের অপরিজ্ঞাত—হয়ত অচিন্ত্য— ছিল। তাঁহার পূর্ব্বে ভারতীয়দিগকে পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের লোকেরা স্বপ্নবিলাসী এবং কেবল কাব্যে ও দর্শনে কিছু কৃতী মনে করিত। এরূপ জাতির মধ্যে জন্মিয়া, "বৈজ্ঞানিক গবেষণা আমরাও করিতে পারি", এই বিশ্বাস পোষণ করিবার সাহস ও পৌরুষ তাঁহার ছিল, এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করিবার মত দৃঢ়তা, অধ্যবসায় ও প্রতিভা তাঁহার ছিল। তাঁহার আবিষ্কৃত কোন কোন তত্ত্ব বিনা দ্বন্দ্বে সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকিলেও উদ্ভিদ্ ও জীব-বিদ্যা বিষয়ে তাঁহার মহৎ আবিষ্ক্রিয়া-গুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহাকে বহু বৎসর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। বিজ্ঞান-জগতে তিনি একজন বড় যোদ্ধা। যদি তাঁহার কোন কোন মত এখনও সকল বিজ্ঞানবিৎ স্বীকার না-করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পরে করিতে পারেন। কারণ, মানুষের অন্য কোন কোন কার্য্যক্ষেত্রে যেমন কেহ কেহ তাঁহাদের সমসাময়িকদিগের আগেই এমন অনেক মতের, পথের ও সত্যের সূচনা করেন যাহা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা সমসাময়িকেরা তখনও অর্জন করে নাই, অতীত কালে বিজ্ঞান-জগতেও সেইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে ; বসু মহাশয়ের কোন কোন গবেষণা সম্বন্ধেও তাহা সত্য হইতে পারে, এবং ভবিষ্যতেও এমন মানুষ জন্মিবেন যাঁহারা অগ্রদূত।

এখন কলেজের ছাত্রেরাও গবেষণা করে এবং কিছু কিছু নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করে। জগদীশচন্দ্র যখন গবেষণা করিতে আরম্ভ করেন, তখন ছাত্রদের কথা দূরে থাক, ভারতবর্ষে তখন বিজ্ঞানাধ্যাপকের প্রধান পদগুলির দখলিকার ইংরেজ অধ্যাপকেরাও গবেষণা করিতে পারিতেন না ও করিতেন না—কেবল মোটা বেতনটা লইতেন। জগদীশচন্দ্রের কৃতিত্বে এইজন্য ভারতবর্ষীয় তরুণ বিজ্ঞানাধ্যায়ীদিগের মনে অপূর্ব্ব উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার অতি মূল্যবান "আত্মচরিত" গ্রন্থের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন :—

"বসু পরে উদ্ভিদের শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন, অথবা জড়জগৎ সম্বন্ধে যে **যুগান্তরকারী** সত্য আবিষ্কার করেন, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলিবার স্থান এ নয়। সে বিষয়ে কিছু বলিবার যোগ্যতাও আমার নাই। এখানে কেবল একটি বিষয়ে বলাই আমার উদ্দেশ্য— ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের **অপূর্ব্ব** আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক জগৎ কর্তৃক কি ভাবে স্বীকৃত হইয়াছিল এবং নব্য বাংলার মনের উপর তাহা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।" —১৫৮ পৃষ্ঠা।

"একজন বিখ্যাত আইনব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক নেতা বাংলা কাউন্সিলে একবার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, আইন এদেশের বহু প্রতিভার সমাধিক্ষেত্রস্বরূপ হইয়াছে।—১৫৯ পৃষ্ঠা।

"বাঙ্গালী প্রতিভার ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে বসুর আবিক্রিয়া সমূহ বৈজ্ঞানিক জগতে সমাদর লাভ করিল। বাঙ্গালী যুবকদের মনের উপর ইহার প্রভাব, ধীরে ধীরে হইলেও, নিশ্চিতরূপে রেখাপাত করিল।" —১৫৯ পৃষ্ঠা।

পাছে কেহ ভুল বুঝেন, এইজন্য এখানে একটি কথা স্পষ্টভাবে বলা আবশ্যক। জগদীশচন্দ্রের গবেষণা ও আবিষ্কার ভারতবর্ষের পক্ষে আধুনিক যুগে অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার, ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করায় কেহ যেন মনে না-করেন, গবেষকবহুল ও বৈজ্ঞানিকবহুল পাশ্চাত্য কোন দেশের পক্ষে তাঁহার গবেষণা ও আবিষ্কার বিস্ময়কর হইত না। সেখানেও বিস্ময়কর নিশ্চয়ই হইত। সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন আচার্য্য বসুর একটি গবেষণা সম্বন্ধে ত বলিয়াছিলেন, "ইহা আমার মনকে বিস্ময়ে পূর্ণ করিয়াছে।" আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, যাহা বিজ্ঞানোজ্জ্বল কোন দেশেও প্রশংসনীয় হইত, তাহা বিজ্ঞানালোক হইতে বঞ্চিত তাৎকালিক ভারতবর্ষে অধিকতর শ্লাঘনীয় হইয়াছিল।

জগদীশচন্দ্র জীবিতকালে প্রশংসায় উৎফুল্ল হইয়া নিদ্রালস বা লক্ষ্যভ্রষ্ট

হন নাই, নিন্দায় কখনও দমিয়া যান নাই। এখন তিনি নিন্দা-প্রশংসার অতীত লোকে গিয়াছেন।

আচার্য্য বসুর গবেষণার বিষয়

আচার্য্য বসুর গবেষণার বিষয় ছিল প্রথমতঃ পদার্থ-বিদ্যার তড়িৎ-শাখার কোন কোন বিষয়। সেগুলির কিঞ্চিৎ আভাসও এখানে দেওয়া চলিবে না। কেবল একটি বিষয়ের উল্লেখ করিব। তিনি বৈদ্যুতিক তরঙ্গের গুণাবলী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভার্থ যে যন্ত্র উদ্ভাবন ও নির্ম্মাণ করেন, পরে বে-তার বার্ত্তা প্রেরণে ব্যবহৃত কোহিয়্যারার (coherer) যন্ত্রের সহিত তাহা প্রায় অভিন্ন, অর্থাৎ তিনিই এইরূপ যন্ত্র প্রথম উদ্ভাবন ও নির্ম্মাণ করেন। এই কথাটিই "এন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা" নামক ইংরাজী মহাকোষের নূতন, চতুর্দ্দশ, সংস্করণের তৃতীয় খণ্ডের ৯২৬ পৃষ্ঠায় একটুকু পেঁচাইয়া স্বীকার করা হইয়াছে। যথা :—

"His first appearance before the British Association at Liverpool in 1896 was to demonstrate an apparatus for studying the properties of electric waves almost identical with the coherers subsequently used in all systems of wireless."

তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ও টাউন হলে বিনা তারে বৈদ্যুতিক শক্তি চালাইয়া প্রাচীরের অন্তরালে স্থিত পিস্তল আওয়াজ ও ঘণ্টাধ্বনি করিয়া তাঁহার যন্ত্রের কার্য্যকারিতা প্রমাণ করিয়াছিলেন। ইহা মার্কোনির বেতার-বার্ত্তা প্রেরণ যন্ত্র প্রচারিত হইবার আগেকার কথা।

তাঁহার কোহিয়্যারার সদৃশ যন্ত্রটি ব্যবহার করিতে গিয়া তিনি দেখেন, তাহার মধ্যস্থিত ধাতুখণ্ডগুলি জীবের পেশীর মত কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রান্ত হইয়া পড়ে, আবার বিশ্রামের পর বা উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে কার্য্যক্ষম হয়। ইহা দেখিয়া তিনি নিজ অনুসন্ধিৎসাকে জড়, উদ্ভিদ ও জীবের সাদৃশ্য ও

ঐক্য নির্দ্ধারণের দিকে চালিত করেন, এবং তাহা প্রমাণ করিতে সমর্থ হন। উক্ত এন্সাইক্লোপীডিয়াতে সংক্ষেপে এই কথা স্বীকৃত হইয়াছে। যথা :—

"His discovery of a parallelism in the behaviour of the receiver to the living muscle led him to a systematic study of the response of inorganic matter as well as animal tissues and plants to various kinds of stimulus. After laborious researches he proved to the satisfaction of various scientific bodies that the life mechanism of the plant is identical with that of the animal."

বসু মহাশয়ের সমুদয় আবিষ্ক্রিয়ার বৃত্তান্ত বাংলা ভাষায় এখনও বাহির হয় নাই। তাহার কিছু পরিচয় পরলোকগত অধ্যাপক জগদানন্দ রায়ের জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধীয় পুস্তকে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় বিস্তৃততর ও সংক্ষেপে সম্পূর্ণ পুস্তক রচনা ও প্রকাশের দুটি প্রধান বাধা আছে। বাংলায় অনেক পারিভাষিক শব্দ নাই, কিন্তু সংস্কৃতের সাহায্যে তাহা রচিত হইতে পারে। তাহা করিবার ও বহি লিখিবার লোক পাওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয় বাধা, এরূপ বহি প্রকাশিত হইলে কিনিবে কে ও পড়িবে কে? কিনিবার ও পড়িবার কিছু লোক পাওয়া যাইবে বটে। কিন্তু পুস্তক রচনা ও প্রকাশের ব্যয়ের সংকুলান তাহাতে না-হইবারই কথা। অতএব, এই অত্যাবশ্যক কাজটির জন্য যদি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ টাকা তুলিতে ইচ্ছা করেন এবং তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালীদের একটি কর্ত্তব্য করা হয় এবং বঙ্গসাহিত্যেরও সমৃদ্ধি বাড়ে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা নানা বিষয়ে নানা রকমের হইয়া থাকে। বসু মহাশয় মানবজ্ঞানের যাহা গোড়াকার কথা, এ রকম নানা বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন, এবং বহু দূর পর্য্যন্ত তাহাতে সিদ্ধিলাভ করেন। প্রাণের,

জীবনের ও জৈব মূল পদার্থের (protoplasmএর) প্রকৃতি, অজৈব জড়ের ও জৈব পদার্থের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য, জীব ও উদ্ভিদের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য প্রভৃতি নানা কঠিন প্রশ্ন তাঁহার গবেষণার বিষয় ছিল। তিনি প্রকৃতিদেবীর গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তঃপুরে বিচরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। বিশ্বকর্ম্মার কারখানার গোপন কথা জানিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাধনায় যতদূর সিদ্ধি তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বিস্ময়কর।

বসু মহাশয়ের গবেষণা ও দর্শন

বসু মহাশয়ের কোন কোন গবেষণা দার্শনিকদিগের, মনোবিজ্ঞানবিদ্‌দিগের জ্ঞানের পরিধিবৃদ্ধির সাহায্য করিয়াছে। ইহা তাঁহার ঐক্যসাধনা ও ঐক্যপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে সিদ্ধির পরিচায়ক। ইহা হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, তিনি বৈজ্ঞানিক না হইয়া দার্শনিক হইবার ইচ্ছা করিলে দার্শনিকদিগের মধ্যেও অগ্রগণ্য হইতে পারিতেন। তাঁহার ঐক্যসাধনার তিনটি দিকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। জনসমাজে প্রচলিত ভাষায় যাহাদিগকে অচেতন-জড়, উদ্ভিদ ও জীব বলা হয়, তাহাদের মধ্যে তিনি সাদৃশ্য ও সমধর্ম্মিতা আবিষ্কার করেন; বিজ্ঞানের নানা শাখার মধ্যে তিনি একাত্মতা উপলব্ধি করিয়া বিজ্ঞানের অখণ্ডত্বের আভাস দেন, এবং বিজ্ঞানের ও দর্শনের জগৎ দুটি যে সম্পূর্ণ পৃথক নহে, তাহাও তাঁহার গবেষণার দ্বারা উপলব্ধ হয়। নানাদিকে এইরূপ ঐক্যের অনুসন্ধান করা এবং তাহার সন্ধান পাওয়া ও দেওয়া বসু মহাশয়ের প্রতিভার ভারতীয়ত্বের পরিচায়ক। এই কারণেই হয়ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগকে তাঁহার কোন কোন গবেষণার সত্যতা বুঝাইতে তাঁহাকে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

আর একটা কারণ, তিনি কোন কোন বিষয়ে ছিলেন অগ্রদূত, অগ্রনায়ক, পথনির্ম্মাতা (pioneer)। ইহার আভাস অধ্যাপক বীরবল

সাহনীর জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধীয় লেখাটিতে পাওয়া যায়। ডক্টর সাহনী বর্ত্তমানে জীবিত রয়্যাল সোসাইটীর ভারতীয় তিন জন ফেলোর এক জন। তিনি বলেন, "......it is possible that he was well ahead of the times...", "সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার সমসাময়িকদিগের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন।"

যন্ত্রোদ্ভাবক জগদীশচন্দ্র

অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক অন্যের উদ্ভাবিত ও নির্ম্মিত যন্ত্রের দ্বারা গবেষণা করিয়াছেন। বসু মহাশয়কে অনেক বিস্ময়কর এবং অতিসূক্ষ্ম-পরিবর্ত্তনপ্রদর্শক (delicate) যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে ও নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। এখানে কেবল একটি উল্লেখ করিব। তাহার নাম ক্রেস্কোগ্রাফ—বাংলায় বৃদ্ধিমান যন্ত্র বলা যাইতে পারে। এন্সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার মতে এই যন্ত্র অতি সামান্য বৃদ্ধিকে এক কোটি গুণ বড় করিয়া দেখাইতে পারে—ইহার বৃহদীকরণ শক্তি (magnifying power) এক কোটি গুণ (ten million times)। ভাল অনুবীক্ষণগুলির বৃহদীকরণ শক্তি এখন যন্ত্রনির্ম্মাতারা কত বেশী করিতে পারিয়াছেন জানি না, বোধ হয় দু-তিন হাজার গুণের বেশী হইবে না। কিন্তু বসুর বৃদ্ধিমান যন্ত্রের বৃহদীকরণ শক্তি এক কোটি গুণ। অর্থাৎ কোন উদ্ভিদ যদি রস আকর্ষণ করিয়া এক ইঞ্চির এক-কোটিতম অংশ ($\frac{১}{১০০০০০০০}$) বাড়ে, তাহা হইলে এই যন্ত্র দেখাইবে যে, উহা এক ইঞ্চি বাড়িয়াছে।

অতিসূক্ষ্মপরিবর্ত্তনপ্রদর্শক এইরূপ সব যন্ত্রের সাহায্যে আচার্য্য বসু এমন সব ব্যাপার মানুষের ইন্দ্রিয়গোচর করিয়াছেন, যাহা পূর্ব্বে কখনও কাহারও ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই, যাহা অভাবনীয় ছিল। তিনি তাঁহার বিজ্ঞানমন্দিরে দেখাইয়াছিলেন, মানুষের দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন, যে, এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের মধ্যে গাছ কেমন বাড়িয়া চলিতেছে। তাহা দেখিবার সৌভাগ্য আমাদেরও হইয়াছিল।

এই রকম যন্ত্র তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে নির্ম্মাণ করিতে পারে, তিনি এইরূপ সুনিপুণ একজন বাঙ্গালী কারিকর পাইয়াছিলেন। অবশ্য তিনি তাহাকে শিখাইয়া লইয়াছিলেন। কোন এক ব্যক্তি (বৈজ্ঞানিক) অধিক বেতনের লোভ দেখাইয়া এই কারিকরটিকে ভাঙ্গাইয়া লইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে বসু মহাশয়ের কাজ বন্ধ হয় নাই। তিনি অন্যান্য কারিকরকে শিখাইয়া লইয়াছিলেন। অসূয়াপরবশ ঐ বৈজ্ঞানিকের নাম করিব না। তাহা সহজে অনুমেয়।

আচার্য্য বসুর আত্মসম্মানবোধ

আচার্য্য বসু যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তখন তাঁহাকে গভর্ন্মেণ্ট ইংরেজ অধ্যাপকদের চেয়ে কম বেতন দিতে চান; তাহার কারণ, তিনি ভারতবর্ষীয় লোক। তিনি কম বেতন লইতে রাজী হন নাই, তিন বৎসর কোন বেতনই গ্রহণ করেন নাই। শেষে তাঁহার আত্মসম্মানবোধের জয় হয়—তিনি তিন বৎসরের পুরা বেতন একসঙ্গে পান। তিনি যখন কম বেতন লইতে রাজী না হইয়া বিনা বেতনে তিন বৎসর কাজ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার খুবই অর্থকৃচ্ছ্রতা ছিল ও তজ্জনিত সংগ্রাম চলিতেছিল।

আচার্য্য বসুর বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞানানুসরণ

ফাদার লাফোঁ কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানাধ্যাপক ছিলেন। তিনি একবার এক সভায় বলেন যে, জগদীশচন্দ্র যদি তাঁহার বেতার যন্ত্রের পেটেন্ট লইয়া ঐ বিষয়েই ব্যাপৃত থাকিতেন, তাহা হইলে মার্কোনির পরিবর্ত্তে তিনিই বেতার-বার্ত্তা প্রেরণের উদ্ভাবক ও পরিচালক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইতেন, এবং শুধু প্রসিদ্ধ নহে, প্রভূত ধনশালীও হইতেন। কিন্তু বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা ধনী হইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল

না। তাঁহার অন্য বহু যন্ত্রের পেটেন্ট লইলেও তিনি ধনী হইতে পারিতেন। কোন কোন পাশ্চাত্য যন্ত্রনির্ম্মাতা কোম্পানী প্রভূত অর্থের বিনিময়ে তাঁহার কোন কোন যন্ত্রনির্ম্মাণ ও বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার চাহিয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাতে রাজী হন নাই। তাঁহার কোন কোন পাশ্চাত্য বন্ধু তাঁহার আবিষ্ক্রিয়ার প্রাথম্যের প্রমাণ রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার জন্য কোন কোন যন্ত্রের পেটেন্ট লইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল যে, তাঁহার আবিষ্ক্রিয়া ও যন্ত্রগুলি যাঁহার যোগ্যতা ও ইচ্ছা আছে তিনিই মানবের জ্ঞানবৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য ব্যবহার করুন।

তিনি মিতব্যয়িতার দ্বারা যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা বসু-বিজ্ঞানমন্দিরের জন্য ব্যয় করিয়াছেন ও রাখিয়া গিয়াছেন এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সৎ কার্য্যের জন্য দিয়া গিয়াছেন। এই সঞ্চিত ধনের পরিমাণ সতর লক্ষ টাকা।

আচার্য্য বসুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার একটি যন্ত্রের নাম রাখিয়াছিলেন "শোষণ-গ্রাফ"। তিনি বাংলা লিখিয়াছিলেন কম, কিন্তু যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা কবিত্বপূর্ণ, তাহার সাহিত্যিক উৎকর্ষ সুস্পষ্ট। ইংরেজী যাহা লিখিতেন এবং ইংরেজী পুস্তক, প্রবন্ধ ও বক্তৃতা বিস্তর লিখিয়াছিলেন, তাহাও সাহিত্যিক উৎকর্ষের জন্য সুবিদিত। বস্তুতঃ তিনি যদি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ না করিয়া সাহিত্যের সেবায় জীবনযাপন করিতেন, তাহা হইলে বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই মনোজ্ঞ, তেজোগর্ভ, উদ্দীপনাপূর্ণ ও শক্তি-সঞ্চারিণী রচনার দ্বারা সাহিত্যকে সম্পৎশালী করিতে ও যশস্বী হইতে পারিতেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহাকে সম্মানিত সদস্য মনোনীত করেন। পরে তিনি উহার সভাপতিও নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং এই পদের কাজ যোগ্যতার সহিত নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। গবেষণার ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি এই পদ ত্যাগ করেন। তিনি একবার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি মনোনীত হন। তাঁহার অভিভাষণ ঐ সম্মেলনের অভিভাষণগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

আমরা যত দূর জানি, প্রবাসীর সম্পাদক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত "দাসী" নামক মাসিক পত্রিকার ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যায় জগদীশচন্দ্রের "ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয়, তাহাই মাসিকপত্রে তাঁহার প্রথম রচনা। এই প্রবন্ধের কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"সেই দুই দিন বহু বন ও গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া, অবশেষে তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। নদীর ধবল-সূত্রটি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া এ পর্য্যন্ত আসিতেছিল, কল্লোলিনীর মৃদু গীতি এতদিন কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল। সহসা যেন কোন ঐন্দ্রজালিকের মন্ত্রপ্রভাবে সে গীত নীরব হইল, নদীর তরল নীর অকস্মাৎ কঠিন নিস্তব্ধ তুষারে পরিণত হইল। ক্রমে দেখিলাম, স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড উর্ম্মিমালা প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে। যেন ক্রীড়াশীল চঞ্চল তরঙ্গগুলিকে কে "তিষ্ঠ" বলিয়া অচল করিয়া রাখিয়াছে। কোন মহাশিল্পী যেন সমগ্র বিশ্বের স্ফটিক-খনি নিঃশেষ করিয়া এই বিশাল ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মূর্ত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন।

"দুই দিকে উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী; বহুদূর-প্রসারিত সেই পর্ব্বতের পাদমূল হইতে উত্তুঙ্গ ভৃগুদেশ পর্য্যন্ত অগণ্য উন্নত বৃক্ষ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতেছে। শিখর-তুষার-নিঃসৃত জলধারা বঙ্কিম গতিতে নিম্নস্থ উপত্যকায় পতিত হইতেছে। সম্মুখে নন্দাদেবী ও ত্রিশূল * এখন আর স্পষ্ট দেখা যাইতেছে

* কুমায়ুনের উত্তরে দুইটি তুষারশিখর দেখা যায়। একটির নাম নন্দাদেবী, অপরটি ত্রিশূল নামে খ্যাত।

না। মধ্যে ঘন কুজ্‌ঝটিকা; এই যবনিকা অতিক্রম করিলেই দৃষ্টি অবারিত হইবে।

"তুষার-নদীর উপর দিয়া ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে লাগিলাম। এই নদী ধবলগিরির উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে আসিতেছে। আসিবার সময় পর্ব্বত-দেহ ভগ্ন করিয়া প্রস্তরস্তূপ বহন করিয়া আনিতেছে। সেই প্রস্তরস্তূপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। অতি দুরারোহ স্তূপ হইতে স্তূপান্তরে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যত ঊর্দ্ধে উঠিতেছি, বায়ুস্তর ততই ক্ষীণতর হইতেছে; সেই ক্ষীণ বায়ু দেবধূপের * সৌরভে পরিপূর্ণ। ক্রমে শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল, শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল; অবশেষে হতচেতনপ্রায় হইয়া নন্দাদেবীর পদতলে পতিত হইলাম।

"সহসা শত শত শঙ্খনাদ একত্রে কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে দেখিলাম, সমস্ত পর্ব্বত ও বনস্থলীতে পূজার আয়োজন হইয়াছে। জলপ্রপাতগুলি যেন সুবৃহৎ কমণ্ডলুমুখ হইতে পতিত হইতেছে; সেই শব্দে পারিজাত বৃক্ষসকল স্বতঃ পুষ্প বর্ষণ করিতেছে। দূরে দিক আলোড়ন করিয়া শঙ্খধ্বনির ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহা শঙ্খধ্বনি, কি পতনশীল তুষারপর্ব্বতের বজ্রনিনাদ, স্থির করিতে পারিলাম না।

"কতক্ষণ পরে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে হৃদয় উচ্ছ্বসিত ও দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণ যে কুজ্‌ঝটিকা নন্দাদেবী ও ত্রিশূল আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শূন্যমার্গ আশ্রয় করিয়াছে। নন্দাদেবীর শিরোপরি এক অতি বৃহৎ ভাস্বর জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে, তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ্য। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূম-রাশি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে এই কি মহাদেবের জটা? এই জটা পৃথিবীরূপিনী নন্দাদেবীকে চন্দ্রাতপের ন্যায় আবরণ করিয়া রাখিয়াছে।' এই জটা হইতে হীরককণার তুল্য তুষারকণাগুলি নন্দাদেবীর মস্তকে উজ্জ্বল

* তুষারক্ষেত্রজাত এক প্রকার সুগন্ধ গুল্মবিশেষ।

মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই কঠিন হীরককণাই ত্রিশূলাগ্র শাণিত করিতেছে।

"শিব ও রুদ্র! রক্ষক ও সংহারক! এখন ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম।

"মানসচক্ষে উৎস হইতে বারিকণার সাগরোদ্দেশে যাত্রা ও পুনরায় উৎসে প্রত্যাবর্ত্তন স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এই মহাচক্র প্রবাহিত স্রোতে সৃষ্টি ও প্রলয়ের রূপ পরস্পরের পার্শ্বে স্থাপিত দেখিলাম।"

জগদীশচন্দ্র ও সুকুমারশিল্প

আগে বলিয়াছি, জগদীশচন্দ্র যদি বৈজ্ঞানিক না হইয়া সাহিত্য-সৃষ্টিতে মন দিতেন, তাহা হইলে বড় সাহিত্যিক হইতে পারিতেন। কবি-প্রতিভার অনুরূপ প্রতিভা তাঁহার ছিল। তিনি বৈজ্ঞানিক না হইয়া সুকুমারশিল্পের, ললিতকলার, অনুশীলন করিলে, তাহাতেও কৃতী হইতে পারিতেন। বসু-বিজ্ঞানমন্দির, তাহার উদ্যানে ও অন্যান্য অংশের পরিকল্পনায় তাঁহার শিল্পপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। বসু-বিজ্ঞানমন্দিরের প্রাচীরের গাত্রের চিত্র অন্যের অঙ্কিত, কিন্তু পরিকল্পনা তাঁহার। তাঁহার বাড়ীর বৈঠকখানায়, প্রাচীরগাত্রে এবং ছাদের ভিতর পিঠের উপর অঙ্কিত ছবিগুলি অন্যের আঁকা। কিন্তু কি আঁকিতে হইবে, তাহা তিনি বলিয়া দিয়াছিলেন। একটি প্রাচীরের গাত্রে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "মাতৃমূর্ত্তি" অঙ্কিত আছে।

কথিত আছে, ম্যাক্সিম-কামান ও নানাবিধ আকাশ-যানের উদ্ভাবক বিখ্যাত যন্ত্রনির্ম্মাতা সর্ হীর‍্যাম ম্যাক্সিম জগদীশচন্দ্রের নানা সূক্ষ্ম যন্ত্রের কথা শুনিয়া তাঁহার হাতখানি দেখিতে চান। তাহা দেখিয়া ও নাড়িয়া-চাড়িয়া বলেন, এরূপ সূক্ষ্ম অনুভবশক্তিসম্পন্ন হাত কেবল হিন্দুরই হইতে পারে। যে প্রতিভা ও সূক্ষ্ম স্পর্শশক্তি তাঁহাকে বিস্ময়কর নানা যন্ত্র-উদ্ভাবনে

সমর্থ করিয়াছিল, তাহা তাঁহাকে চারুশিল্পের সাধনাতেও সিদ্ধি দিতে পারিত, যদি তিনি সেই সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতেন। কবি ও শিল্পী হইতে হইলে যে সৌন্দর্য্যবোধ, যে সুষমার উপলব্ধি, যে রসানুভূতি আবশ্যক, তাহা তাঁহার ছিল।

রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব আকস্মিক নহে। উভয়ের প্রকৃতি ও প্রতিভার সাদৃশ্য এই বন্ধুত্বের কারণ। আমরা তাহা অনুভব করিতাম। কবি নিজেও তাহা বলিয়াছেন।

দেশী জিনিষের প্রতি জগদীশচন্দ্রের অনুরাগ

ভারতবর্ষীয় ও বঙ্গীয় পণ্যশিল্পজাত নানা সামগ্রী জগদীশচন্দ্রের প্রিয় ছিল, ইহা যাঁহারা না-জানেন, তাঁহার গৃহসজ্জা হইতে তাহা অনুমান করা তাঁহাদের পক্ষেও সহজ।

বঙ্গের পল্লীগ্রামের জীবন এবং পল্লীগ্রামবাসী লোকদের খাদ্য তাঁহার কিরূপ প্রিয় ছিল, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিব।

একবার তিনি বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতে গিয়াছি, তখন অপরাহ্নের জলযোগের সময়। উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন আসিল। তিনি বলিলেন, এ-সব রাখ; মুড়ি আর কাঁচা লঙ্কা আন। তাহা আনা হইলে কাঁচা লঙ্কা দিয়া মুড়ি খাইতে লাগিলেন। যাহাতে মুড়ি মিয়াইয়া না যায়, সেইজন্য তাঁহার মুড়ি কাচের ছিপিযুক্ত বড় কাচের পাত্রে রাখা থাকিত।

জগদীশচন্দ্রের ভারতভক্তি ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা

আচার্য্য বসুর সহিত যাঁহারা মিশিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন তিনি কিরূপ ভারতভক্ত ও স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ও তাঁহার সহিত যে ভগিনী নিবেদিতার হৃদয়ের গভীর যোগ ছিল, ইহা তাহার প্রধান কারণ।

পরমার্থ চিন্তায় জগদীশচন্দ্র

জগদীশচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন এবং স্বয়ং বৈদান্তিক মত যেরূপ বুঝিতেন তদনুসারে বৈদান্তিক ছিলেন। তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী প্রাত্যহিক প্রাতঃকালীন উপাসনায় ব্রাহ্মসমাজের মুদ্রিত আরাধনা পাঠ করিতেন। প্রার্থনা তিনি কিংবা তাঁহার সহধর্ম্মিণী, যেদিন মনের ভাব যেরূপ হইত, সেইরূপ করিতেন। কবি রজনীকান্ত সেনের নিম্নমুদ্রিত গানটি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল :—

কেন বঞ্চিত হব চরণে !
আমি কত আশা ক'রে ব'সে আছি, পাব জীবনে না হয় মরণে।
আহা ! তাই যদি নাহি হবে গো,—
পাতকী-তারণ-তরীতে তাপিত আতুরে তুলে না লবে গো,—
হ'য়ে পথের ধূলায় অন্ধ, এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ ?
তবে পারে ব'সে "পার কর" ব'লে পাপী কেন ডাকে দীন-শরণে ?
আমি শুনেছি, হে তৃষাহারী !
তুমি এনে দাও তারে প্রেম অমৃত, তৃষিত যে চাহে বারি,
তুমি আপনা হইতে হও আপনার, যার কেহ নাই, তুমি আছ তার,
একি সব মিছে কথা ? ভাবিতে যে ব্যথা বড় বাজে, প্রভু মরমে।

আচার্য্য বসু তাঁহার একটি বক্তৃতার শেষে বিশ্বের একত্ব সম্বন্ধে ইংরেজীতে ঋষিদের বাক্য বলিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কঠোপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের তাৎপর্য্য।

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি,
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ,
তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥"

"সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একেশ্বর যিনি আপনার এক রূপকে বহু করেন, তাঁহাকে যে ধীরেরা আত্মস্থ (আপনাদের মধ্যে স্থিত) দেখেন, তাঁহাদের সুখ শাশ্বত, অন্যদের নহে।"

বহুর মধ্যে এককে যিনি জানেন, তিনিই সত্য জানিয়াছেন, অন্যেরা নহে ; এই মর্ম্মের উপনিষদ্‌বাক্য তাঁহার প্রিয় ছিল, বহুর মধ্যে এই একের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন।

পরমাত্মার উপলব্ধির জন্য কর্ম্মের পথ, রসানুভূতির পথ ও জ্ঞানের পথ তাঁহার অধিগম্য ছিল, এবং তিনি তাহা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ডারুইনের ও জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ক্রিয়ার নূতনত্ব

ডারুইন ক্রমবিকাশবাদ, বিবর্ত্তনবাদ বা অভিব্যক্তিবাদের আবিষ্কারক বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু ইউরোপে প্রাচীন গ্রীক দর্শনে অভিব্যক্তিবাদের মত একটি মত ছিল। ভারতবর্ষেও কোন কোন দর্শনে এবং পুরাণাদিতে বর্ণিত সৃষ্টির বৃত্তান্তে বিবর্ত্তনবাদের মত একটি মত লক্ষিত হয়। তদ্ভিন্ন, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়েও কোন কোন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদের মত একটি মত প্রচার করিয়াছিলেন। সুতরাং ডারুইন যাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ নূতন ও অশ্রুতপূর্ব্ব ছিল না, তাহার সামান্য কিছু আভাস বিদ্বৎসমাজ অতীত কালেও পাইয়াছিলেন। তথাপি তাঁহাকে যুগান্তকারী আবিষ্কারক কেন বলা হয় ? বলা হয় এই জন্য, যে, আধুনিক সময়ে যাহাকে সায়েন্স নাম দেওয়া হইয়াছে এবং যাহার বাংলা করা হইয়াছে বিজ্ঞান, তাহা প্রমাণসাপেক্ষ। বিনাপ্রমাণে কোন বৈজ্ঞানিক মত গৃহীত হয় না। ডারুইন যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রমাণ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতের যে যে অংশের প্রমাণ তিনি দিতে পারেন নাই, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ পরে পাওয়া গিয়াছে, আবার তাঁহার মতের কোন কোন অংশের বিরুদ্ধেও

অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। পৃথিবীতে গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ান অনেক আছেন যাঁহারা ডারুইনের মতে বিশ্বাস করেন না। আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটসের কোন কোন স্থানে এই গোঁড়ামি এত বেশী, যে, তথাকার শিক্ষালয়সমূহে অভিব্যক্তিবাদ শিক্ষা দেওয়া নিষিদ্ধ; কোন শিক্ষক তাহা শিখাইলে তাঁহার চাকরি যায়, কোন শিক্ষালয়ে তাহা শিখান হইলে তাহার সরকারি সাহায্য বন্ধ হয়।

এইরূপ নানা বিরুদ্ধবাদিতা ও বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও ডারুইন খুব বড় বৈজ্ঞানিক বলিয়া জগতে সম্মানিত, এবং তাঁহার মত মোটামুটি সত্য বলিয়া স্বীকৃত। এই সম্মান ও এই স্বীকৃতির তিনি যোগ্য।

আধুনিক সময়ে বিজ্ঞান বলিতে কি বুঝায়, তাহা একটি দৃষ্টান্ত লইলে সহজে বুঝা যাইবে। আমাদের দেশে রামায়ণে ও অন্য কোন কোন কাব্যে ও নাটকে পুষ্পক রথের উল্লেখ ও তাহাতে আরোহণ করিয়া ভ্রমণের বৃত্তান্ত দেখা যায়। গ্রীক পুরাণে বর্ণিত আছে, যে, ডীডেলস ও তাঁহার পুত্র আইকেরস নিজ নিজ স্কন্ধদেশে পক্ষ জুড়িয়া উড়িতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আরব্য উপন্যাসে ঐন্দ্রজালিক গালিচায় বসিয়া বা ঐন্দ্রজালিক ঘোড়ায় চড়িয়া আকাশপথে গমনাগমনের বর্ণনা আছে। কিন্তু এ সমুদয় সত্ত্বেও বর্ত্তমান সময়ে যত প্রকার আকাশযান আছে, তাহা নির্ম্মাণ করিতে যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ও কারিগরীর প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা নূতন মনে করা হয় ও তাহার প্রশংসা করা হয়। এই যানগুলি আমরা চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি। যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকিলে এগুলি নির্ম্মাণ করা যায়, তাহা যোগ্য ব্যক্তি মাত্রেই শিখিতে পারে। কিন্তু আগেকার পুষ্পক রথ, ডীডেলস ও আইকেরসের পাখা, এবং ঐন্দ্রজালিক গালিচা ও ঘোড়া যে কিরূপ ছিল, কেমন করিয়া সেগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল বা হইতে পারে, কোথাও লেখা নাই, কেহ জানে না, জানিতে পারে না। সুতরাং আগেকার ঐ সব জিনিষের উল্লেখ বা বর্ণনার কোন বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই।

আমাদের দেশের পূর্ব্বতন ঋষিগণ আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির বলে সমুদয় বিশ্বের ঐক্য, সর্ব্বত্র এক আত্মার অস্তিত্ব, এবং বহুর মধ্যে একের সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং তাহা ঘোষণা করিয়াছিলেন। উদ্ভিদের প্রাণ আছে, একথাও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকিবেন। ইউরোপেও কেহ কেহ মোটামুটি এইরূপ কিছু বলিয়া থাকিবেন। কিন্তু নানাবিধ স্থক্ষ্ম যন্ত্রের উদ্ভাবন ও নির্ম্মাণ এবং তাহাদের সাহায্যে বহু সংখ্যক পরীক্ষা করিয়া জগদীশচন্দ্র জীবিত ও অজীবিতের, উদ্ভিদ ও প্রাণীর যত প্রকার সাদৃশ্য পুনঃপুনঃ দেখাইয়াছেন ও বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, প্রাচীন কালে সেরূপ কিছু কেহ করেন নাই ও বলেন নাই। প্রাচীনেরা সমুদয় বিশ্বে একের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই উপলব্ধি অন্যকে অকাট্য বাহ্য প্রমাণ দ্বারা দেওয়া যায় না। জগদীশচন্দ্র যে-সব বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সেগুলি অন্যকে দেখান, শুনান, বোঝান যায়। প্রয়োজনানুরূপ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা যাঁহার আছে, তিনিই তাঁহার পরীক্ষাগুলির পুনরাবৃত্তি করিতে পারেন, এবং সেগুলির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে নিজের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন।

এই সমস্ত কারণে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্ক্রিয়াগুলি আধুনিক অর্থে বিজ্ঞান, প্রাচীনদের পূর্ব্বোল্লিখিত উক্তিগুলি আধুনিক অর্থে বিজ্ঞান নহে।

প্রাচীন কালে আমাদের দেশে বহু দার্শনিককে মুনি বা ঋষি বলা হইত, বহু কবিকেও মুনি বা ঋষি বলা হইত, বৈজ্ঞানিক কাহাকেও কাহাকেও ঐ নামে অভিহিত করা হইত। তাহা হইতে এই সত্যের আভাস পাওয়া যায়, যে, মুনি ঋষি কবি দার্শনিক বৈজ্ঞানিক—ইঁহাদের পরস্পরের মনোবৃত্তি সম্পূর্ণ পৃথক নহে। তাঁহাদের মনের সাদৃশ্য আছে, সংযোগস্থল আছে। আধুনিক ইউরোপে ইহা হয়ত স্পষ্ট অনুভূত হয় না; প্রাচীন

ভারতে হইয়াছিল। বর্ত্তমানে জগদীশচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব এবং বৈজ্ঞানিক সাধনা ও সিদ্ধি ভারতবর্ষের পূর্ব্বানুভূতি স্মরণ করাইয়া দিয়াছে।

অনেক বৈজ্ঞানিক নাস্তিক ও জড়বাদী—যদিও সকলে নহেন। তাঁহারা জড়ের দ্বারা চেতনের ও চেতনার ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী। তাঁহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। হৃদয় মন প্রাণ আত্মা যে শব্দই ব্যবহার করা যাক্, তাঁহারা সমস্তই জড়ের কোন গুণ বা প্রক্রিয়ার ফল বলিয়া বুঝাইতে চান। তাঁহারা আত্মাকে অনাত্ম দ্বারা, শ্রেষ্ঠকে অশ্রেষ্ঠের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া জডকেই একমাত্র সত্তা বলিতে চান। জগদীশচন্দ্র ইহার বিপরীত মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মনে হয়, তিনি বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রাণের, আত্মার, শ্রেষ্ঠের লীলা দেখিতে ও দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাব ভারতীয় বৈশিষ্ট্য এইখানে।

মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের শ্রদ্ধাঞ্জলি

বর্ত্তমানে অধ্যাপক এলবার্ট আইনষ্টাইন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচিত। ইনি জার্ম্মাণজাতীয় ইহুদী ; জুরিকে অধ্যাপনা করেন। ইঁহার গবেষণার ফলে বিজ্ঞান-জগতে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। ইনি নিউটনের মাধ্যাকর্ষণবাদকে ভুল বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন। আপেক্ষিক-তত্ত্ববাদের জনয়িতা বলিয়া ইঁহার খ্যাতি। সম্প্রতি জেনেভার বিজ্ঞানবিদ্‌গণের যে বৈঠক বসিয়াছে, তাহাতে অধ্যাপক আইনষ্টাইন আমাদের আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে নমস্কার নিবেদন করিয়া বলিয়াছেন যে, জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য যতগুলি তথ্য দান করিয়াছেন, তাহার যে কোনটির জন্য স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।

[প্রবাসী—আশ্বিন, ১৩৩৩]

জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার প্রসঙ্গে দুইজন রুশ বিজ্ঞানী

॥ এম. রাদোভ্স্কি ॥

জগদীশচন্দ্র বসুর খ্যাতি তাঁহার নিজদেশের চতুঃসীমার বাহিরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। রাশিয়াতে তাঁহার নাম ছিল সুপরিচিত এবং রুশ বিজ্ঞানীগণ তাঁহাদের এই ভারতীয় সহকর্মীর বিজ্ঞানের বহু বিভিন্ন শাখায় বিরাট দান-অবদানকে অতি উচ্চ মর্যাদা দিয়াছিলেন।

জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের যে-দুইটি শাখায় কাজ করিতেছিলেন, রুশ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে দুইজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীও সেই একই শাখায় অনুশীলন-গবেষণা করিতেছিলেন : ইঁহাদের একজন হইলেন বেতারবার্তা প্রেরক-যন্ত্রের আবিষ্কর্তা এ. এস. পোপফ ; অন্যজন সুবিখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী কে. এ. তিমিরিয়াজেফ।

পোপফের রচনাবলী ও চিঠিপত্র হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি, ইউরোপের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের গবেষণার খবরা-খবর প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পোপফ তাঁহার সম্বন্ধে জানিতে পারেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ বিজ্ঞান-পরিষদ "ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অফ সায়েন্স্"-এর এক সম্মেলনে জগদীশচন্দ্র বসু যে নিবন্ধ পাঠ করেন, সেই নিবন্ধের কথা পোপফ তাঁহার একটি চিঠিতে উল্লেখ করেন। ওই বৎসরেই "ইলেক্ট্রিশিয়ান" নামক বৈজ্ঞানিক পত্রিকায়

প্রকাশিত জগদীশচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া পোপফ একটি চিঠিতে লেখেন :

"ইংরেজি পত্রিকা 'নেচার'-এর অক্টোবর (১৮৯৬) সংখ্যায় ব্রিটিশ বিজ্ঞান-পরিষদের সম্মেলনের এক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্মেলনের একটি অধিবেশনে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ অনুশীলনের জন্য বসু কর্তৃক আবিষ্কৃত যন্ত্রটির কার্যকারিতা প্রদর্শন করা হয়।......১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অলিভার লজ্ যে-যন্ত্রটির কার্যকারিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বসুর এই যন্ত্রটি হইল তাহারই এক পরিবর্তিত রূপ। লজ্ এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি স্বীকার করেন যে, অধ্যাপক বসুর এই যন্ত্রটি তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রটি হইতে অধিকতর সুষ্ঠু ও আরও বেশী নির্ভরযোগ্য।"

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখে রাশিয়ার রাসায়নিক-পদার্থবিজ্ঞান সমিতির (রাশিয়ান ফিজিকো-কেমিক্যাল সোসাইটি) সভায় পোপফ তাঁহার যে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, তাহার পরে—অর্থাৎ বেতার-বার্তা প্রেরণ আবিষ্কৃত হইবার পরে—জগদীশচন্দ্র বসুর পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলি প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও, এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের নাম বেতার-আবিষ্কারের পথপ্রদর্শক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইতিহাসের সহিত চিরকালের জন্য যুক্ত হইয়া আছে, এবং পোপফ জগদীশচন্দ্রকে সর্বদাই তাঁহার পূর্ব-সুরীদের অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

রাশিয়ার সংবাদপত্র পত্রিকাগুলি জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণার উপরে বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করে। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে ক্রোন্সতাদ্ হইতে প্রকাশিত "কোৎলিন" নামক সংবাদপত্রটি লেখে : "অধ্যাপক বসু তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রব্যবস্থার সাহায্যে আলোক-প্রতিরোধক অনচ্ছ জিনিসের ভিতর দিয়া ১,৫০০ মিটার দূরত্বে আলোক-সংকেত প্রেরণ করিতে সমর্থ হন।...বৈদ্যুতিক স্পন্দনকে আলোক-তরঙ্গে রূপান্তরিত করিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহী তার ব্যবহার না করিয়াই, কয়েক মাইল ব্যাসার্ধ

পর্যন্ত এলাকার মধ্যে সংকেত প্রেরণ করা যাইতে পারিবে। এইভাবে, কুয়াশার মধ্যে সমুদ্রের বুকে যেসব দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে সেই সব দুর্ঘটনা:কে বন্ধ করা যাইবে।

উদ্ভিদের শারীরবৃত্ত সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র বসুর অনুশীলন-গবেষণাও বিজ্ঞানের ইতিহাসে একই রকম অতীব গুরুত্বপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কে. এ. তিমিরিয়াজেফ তাঁহার বিভিন্ন রচনায় জগদীশচন্দ্র বসুর উদ্দেশে যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন, জগদীশচন্দ্রের জীবনচরিতকাররা তাহার উল্লেখ না করিয়া পারেন না। তিমিরিয়াজেফ তাঁহার একটি গ্রন্থে ("১৬২০— ১৯২০ : তিন শতাব্দীব্যাপী প্রকৃতি-বিজ্ঞানের উন্নয়ন সম্পর্কে একটি নিবন্ধ") বিজ্ঞানের প্রগতির পর্যালোচনা করেন। তাঁহার আর একটি প্রধান রচনা হইল "বিংশ শতকের প্রারম্ভে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের কয়েকটি প্রধান সাফল্য।"—এই দুইটি গ্রন্থেই এই মহাবিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার-গবেষণার বিস্তৃত পর্যালোচনা করিয়াছেন।

তিমিরিয়াজেফের মতে, জগদীশচন্দ্রের গবেষণাগুলির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় "উদ্ভিদের শারীরবৃত্তের অনুশীলনে নিখুঁত পদার্থবৈজ্ঞানিক প্রয়োগ-পদ্ধতিগুলির এক অতীব উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।" এই ভারতীয় বিজ্ঞানীর গবেষণা-কার্যের তাৎপর্যকে চিহ্নিত করিতে গিয়া তিমিরিয়াজেফ লেখেন: **"শুধু তাঁহার (জগদীশচন্দ্রের) নামটিই বিশ্ব-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নয়নে এক নূতন যুগকে চিহ্নিত করিতেছে।"**

জীবনের ঘটনাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা

১৮৫৭ :

—ভগবানচন্দ্র বসু ২৩শে সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ (পূর্ববঙ্গ) জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন।

১৮৫৮ :

—৩০শে নভেম্বর, জগদীশচন্দ্রের জন্ম—পিতা ভগবানচন্দ্র বসু, মাতা বামাসুন্দরী দেবী।

॥ শিক্ষা ॥

—ফরিদপুরের বাঙলা স্কুলে অধ্যয়ন।

১৮৭০ :

—কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হন।

১৮৭৫ :

—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম বিভাগে বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

—ঐ বৎসরই কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন।

১৮৭৭ :

—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৭৯ :

—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৮৮০ :

—ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন।

১৮৮০-৮১ :

—এক বৎসর লণ্ডনে ডাক্তারি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

১৮৮১ :

—কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্টস্ কলেজে ভর্তি হন।

১৮৮৪ :

—কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। (প্রকৃতি বিজ্ঞানে ট্রাইপোস)

—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এসসি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

॥ কর্ম-জীবন ॥

১৮৮৫ :

—কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার স্থানাপন্ন অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

১৮৮৭ :

—দুর্গামোহন দাশের কন্যা শ্রীমতী অবলা দাশের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

১৮৮৮-১৮৯৪ :

—১৮৮৮ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হন, এবং ১৮৮৫ সাল হইতেই তাঁহাকে স্থায়ী অধ্যাপক হিসাবে গণ্য করা হয়।

১৮৯৪-১৮৯৫ :

—কলিকাতা টাউন হলে বাংলার গভর্নরের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে সংকেত প্রেরণের সম্ভাবনা সম্পর্কীয় পরীক্ষা প্রদর্শন।

॥ বৈজ্ঞানিক রচনা ও বৈজ্ঞানিক অভিযান ॥

১৮৯৫ :

—'কেলাসের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক রশ্মির সমবর্তন' সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল-এর নিকট পেশ করেন এবং উহা উক্ত সোসাইটির মুখপত্র 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এ প্রকাশিত হয়।

—লর্ড র‍্যালির মারফতে "বৈদ্যুতিক তরঙ্গের পথ পরিবর্তন নির্ধারণ" সম্পর্কীয় প্রথম প্রবন্ধ লণ্ডন রয়েল সোসাইটিতে প্রেরণ করেন। উহা রয়েল সোসাইটির কার্যবিবরণী, ৫৯ খণ্ডে, ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৬ :

—লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এসসি. উপাধি লাভ করেন।

১৮৯৬-৯৭ :

—ইউরোপে প্রথম বৈজ্ঞানিক অভিযান।

—লিভারপুলে বৃটিশ এসোসিয়শনে "বৈদ্যুতিক তরঙ্গের ধর্ম-পরীক্ষার যাবতীয় যন্ত্রপাতি" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

—লণ্ডন রয়েল ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত শুক্রবাসরীয় সান্ধ্য আলোচনা-সভায় "বৈদ্যুতিক রশ্মির সমবর্তন" সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা।

—জার্মানী ও প্যারী পরিদর্শন করেন। জার্মানীর কিয়েল বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Physikalische ইনস্টিটিউট ও প্যারীর Societe de Physique-এ বক্তৃতা দেন।

১৮৯৭ :

—জগদীশচন্দ্র দেশে প্রত্যাবর্তনের পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদেশে সাফল্যের জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

১৯০০-১৯০২ :

—ইউরোপে দ্বিতীয়বার বৈজ্ঞানিক অভিযান।

—১৯০০ সালে প্যারীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পদার্থবিদ্যা মহা-সম্মিলনীতে যোগদান করেন এবং নিজের আবিষ্কারগুলি সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। ঐ সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হয়।

—১৯০০ সালে ব্র্যাডফোর্ডের বৃটিশ এসোসিয়েশনে "জীব ও জড় পদার্থের উপর বিদ্যুদ্‌রশ্মির সাড়ার একতা" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

—১৯০০ সালে ব্র্যাডফোর্ড বৃটিশ এসোসিয়েশন ও লণ্ডন রয়েল ইনস্টিটিউট-এ "কৃত্রিম অক্ষিপট" সম্বন্ধে পরীক্ষা প্রদর্শন করেন।

—১৯০১ সালের ৭ই জানুয়ারী হইতে ৩০শে মার্চ এবং ৭ই অক্টোবর হইতে ১৪ই ডিসেম্বর, এই দুইবার লণ্ডন ডেভি-ফেরাডে রিসার্চ লেবরেটোরিতে গবেষণা করেন।

—১৯০১ সালে গ্লাসগো বৃটিশ এসোসিয়েশন-এ "তড়িচ্চালকের চক্রাকার প্রকারণ দ্বারা ধাতবকণার পরিবাহিতার পরিবর্তন" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

—১৯০১ সালে লণ্ডন রয়েল ইনস্টিটিউশন-এ অনুষ্ঠিত শুক্রবাসরীয় সান্ধ্য আলোচনা-সভায় দ্বিতীয়বার "যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক উদ্দীপনায় জড়পদার্থের সাড়া" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১৯০২ :

—১৯০২ সালে লিনিয়ান সোসাইটি কর্তৃক আহূত এক বিশেষ সভায় "যান্ত্রিক উদ্দীপনায় সাধারণ উদ্ভিদের বৈদ্যুতিক সাড়া" সম্বন্ধে পরীক্ষা সহ বক্তৃতা দেন।

—প্যারীর Societe de Physique-এ "যান্ত্রিক উদ্দীপনায় উদ্ভিদের বৈদ্যুতিক সাড়া" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

—Societe Francaise de Physique-এর সদস্য নির্বাচিত হন।

—ব্র্যাডফোর্ডর বৃটিশ এসোসিয়েশনে "প্রাণী, উদ্ভিদ ও ধাতবপদার্থে বৈদ্যুতিক সাড়া" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

—লণ্ডনের লংম্যান্‌স, গ্রীন এণ্ড কোং কর্তৃক "জীব ও জড়পদার্থে সাড়া" (Response in the Living and Non-living) নামক তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়।

১৯০৩ :

—সি. আই. ই. উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৯০৪ :

—"উদ্ভিদের সাড়া" বিষয়ক তাঁহার পাঁচটি প্রবন্ধ রয়াল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশনার জন্য গৃহীত না হওয়ায়, তিনি নিজেই তাঁহার গবেষণাগুলি 'মনোগ্রাফ' আকারে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত করেন।

১৯০৪-১৯০৫ :

—এমন কতকগুলি নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, যার দ্বারা উদ্ভিদ-জীবনে অভাবনীয় নানা ঘটনার বিকাশ দেখা যায়।

১৯০৬ :

—লণ্ডনের লংম্যান্‌স, গ্রীন এণ্ড কোং কর্তৃক তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক "শারীরবৃত্ত-গবেষণায় উদ্ভিদের সাড়া" (Plant Response as a Means of Physiological Investigation) প্রকাশিত হয়।

১৯০৭ :

—লণ্ডনের লংম্যান্‌স, গ্রীন এণ্ড কোং কর্তৃক তাঁহার তৃতীয় পুস্তক "তুলনামূলক বৈদ্যুতিক শারীরবৃত্ত" (Comparative Electro-physiology) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯০৮-১৯০৯ :

—ইউরোপ ও আমেরিকায় তৃতীয় বৈজ্ঞানিক অভিযান।

—ডাবলিন বৃটিশ এসোসিয়েশনে "উদ্ভিদে যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক সাড়া" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

—আমেরিকা পরিদর্শনে যান। সেখানে আমেরিকান এসোসিয়েশন ফর দি এ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স ও বাল্টিমোর বোটানিক্যাল সোসাইটি অব আমেরিকা, বোস্টন মেডিক্যাল সোসাইটি, শিকাগো একাডেমি অব সায়েন্সেস্, টোরে বোটানিক্যাল ক্লাব, শিকাগো ওয়েস্টার্ন সোসাইটি অব ইঞ্জিনিয়ার্স প্রভৃতি সংস্থার বাৎসরিক সম্মিলিত সভায় তিনি বৈদ্যুতিক পদার্থবিদ্যা এবং উদ্ভিদ-শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে পর পর অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। ইহা ছাড়া ইলিনোস, অ্যান আরবর, উইসকন্সিন এবং শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়েও ঐ সম্পর্কে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন

১৯১১ :

—বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর ময়মনসিংহ অধিবেশনে নিজের গবেষণা ও আবিষ্ক্রিয়া সম্পর্কে বাঙলা ভাষায় সভাপতির ভাষণ দেন।

১৯১২ :

—সি. এস. আই. উপাধিতে ভূষিত হন।

—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. এসসি. উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯১৩ :

—লণ্ডনের লংম্যান্স, গ্রীন এণ্ড কোং কর্তৃক তাঁহার চতুর্থ পুস্তক "উদ্ভিদের বিরক্তি-অনুভূতি বিষয়ক গবেষণা" (Researches on the Irritability of Plants) প্রকাশিত হয়।

—পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনটি বক্তৃতা দেন।

১৯১৪-১৯১৫ :

—ইউরোপ ও আমেরিকায় চতুর্থ বৈজ্ঞানিক অভিযান।

—কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন।

—রয়াল ইনস্টিটিউশনে অনুষ্ঠিত শুক্রবাসরীয় সান্ধ্য আলোচনা-সভায় তাঁহার তৃতীয়বারের বক্তৃতায় "উদ্ভিদের স্বলেখন এবং উহার অভিব্যক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অস্ট্রিয়ায় গমন করেন এবং ভিয়েনায় বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সভায় বক্তৃতা করেন।

—জার্মানীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা করেন।

—লণ্ডন রয়াল সোসাইটি অব মেডিসিন-এর সম্মুখে "উদ্ভিদের উপর ঔষধের ক্রিয়া" সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

—আমেরিকায়ও গমন করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়া ছাড়াও তিনি নিম্নলিখিত স্থানেও ভাষণ দেন: আমেরিকান এসোসিয়েশন ফর দি এ্যাডভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স, ফিলাডেলফিয়া বোটানিক্যাল সোসাইটি অব আমেরিকা, নিউইয়র্ক একাডেমি অব সায়েন্সেস, ওয়াশিংটন একাডেমি অব সায়েন্সেস, বোটানিক্যাল সোসাইটি অব ওয়াশিংটন, আমেরিকান ফিলজফিক্যাল সোসাইটি, ইয়োয়া শহরে সোসাইটি অব ন্যাচারাল সায়েন্স অডিটরিয়াম এবং টোয়েন্টিয়েথ্ সেঞ্চুরি ক্লাব। ইহা ছাড়াও ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক অভ্যর্থনা কক্ষে স্টেট ডিপার্টমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সম্মুখে পরীক্ষাসহ বক্তৃতা দেন।

—জাপান গমন করেন এবং ওয়াসেদে (Wasede) বিশ্ববিদ্যালয়ে জনসাধারণের সম্মুখে বক্তৃতা দেন।

—ভারতীয় শিক্ষাবিভাগ হইতে ১৯১৫ সালের নভেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে পুরা বেতনে পাঁচ বৎসরের জন্য 'এমেরিটাস' অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন।

১৯১৬ :

—কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবসে "ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত" নামে উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন।

১৯১৭ :

—ফরিদপুর শিল্প-প্রদর্শনীর সভাপতি হিসাবে পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে উক্ত শিল্প-প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠাতা পিতা ভগবানচন্দ্র বসুর জীবনী বিষয়ক ভাষণ দান করেন।

—'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন।

—উনষষ্ঠিতম জন্মদিনে কলিকাতায় 'বসু বিজ্ঞান-মন্দির' প্রতিষ্ঠা করেন এবং "জীবনের বাণী" নামক উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন।

১৯১৮ :

—বসু রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কার্যবিবরণী হিসাবে গবেষণার বিবরণীসমূহ নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিতে শুরু করেন। "উদ্ভিদে জীবনের স্পন্দন" নামে উক্ত কার্যবিবরণীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে "জীবনের ঐক্য" নামে বক্তৃতা করেন।

—বোম্বাইয়ের রয়াল অপেরা হাউসে "অদৃশ্য আলোক" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

১৯১৯-১৯২০ :

—১৯১৯ সালে "উদ্ভিদে জীবনের স্পন্দন" নামে বসু রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কার্যবিবরণীর ২য় খণ্ড প্রকাশিত হয়।

—ইউরোপে পঞ্চম বৈজ্ঞানিক অভিযান।

—আর্থার জেম্‌স বালফোরের সভাপতিত্বে ইণ্ডিয়া অফিসে পরীক্ষাসহ বক্তৃতা দেন।

—কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, লীডস, লণ্ডন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন।

—আবার্তিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এল-এল. ডি. উপাধিতে ভূষিত হন।

—১৯২০ সালের ১৩ই মে লণ্ডন রয়াল সোসাইটির সভ্যপদে নির্বাচিত হন।

—রয়াল সোসাইটি অব মেডিসিন-এ ভাষণ দান করেন।

—লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের ফিজিক্যাল লেবরেটোরিতে বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সম্মুখে "চৌম্বক ক্রেস্কোগ্রাফ" যন্ত্রটির ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করেন।

—ফ্রান্সে গমন করেন এবং প্যারীর বায়োলজিক্যাল সোসাইটি, ফিজিয়লজিক্যাল কংগ্রেস এবং বোটানিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা দেন।

—ইংলণ্ডের রথামস্টেড এক্সপেরিমেণ্ট্যাল স্টেশনে বক্তৃতা করেন।

—সুইডেনে গমন করেন এবং ফিজিক্যাল সোসাইটি অব স্টকহোম-এ বক্তৃতা দেন।

—জার্মানীতে যান এবং বার্লিনে প্রখ্যাত উদ্ভিদ-শারীরবৃত্তবিদ্‌দের সম্মুখে বক্তৃতা দেন।

—অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডিস-লিখিত জগদীশচন্দ্রের জীবনী "লাইফ এণ্ড ওয়ার্ক অব সার জে. সি. বোস" গ্রন্থখানি লণ্ডনের লংম্যান্‌স, গ্রীন এ্যাণ্ড কোং কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

—"উদ্ভিদে জীবনের স্পন্দন" নামে বসু রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর কার্যবিবরণীর ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়।

—বাঙলা ভাষায় তাঁহার রচনা-সংগ্রহ 'অব্যক্ত' প্রকাশিত হয়।

১৯২৩-১৯২৪ :

—ইউরোপে ষষ্ঠবার বৈজ্ঞানিক অভিযান।

—লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ, প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়, ডেনিস বোটানিক্যাল সোসাইটি, কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়, লণ্ডন

ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স এবং লণ্ডন রয়াল সোসাইটি অব মেডিসিনে পরীক্ষাসহ "উদ্ভিদের পরিপাক-ক্রিয়া ও রস-সঞ্চালন" বিষয়ক বক্তৃতা দেন।

—বিলাতের প্রধানমন্ত্রী র্যামসে ম্যাকডোনাল্ড, ভারতের প্রাক্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ, জর্জ বার্নাড শ প্রমুখ বিশিষ্ট দর্শকবৃন্দের সম্মুখে ইণ্ডিয়া অফিসে "উদ্ভিদের বৃদ্ধির ঘটনাবলী" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন।

—"জীবনী-রসের উর্ধ্বগামিতার শারীরবৃত্ত" নামে বসু রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কার্যবিবরণীর ৫ম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

—লণ্ডনের লংম্যান্স, গ্রীন এণ্ড কোং কর্তৃক তাঁহার পঞ্চম পুস্তক "সালোক-সংশ্লেষ শারীরবৃত্ত" (The Physiology of Photosynthesis) প্রকাশিত হয়।

—ফ্রান্সে গমন করেন এবং প্যারীর নেচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম ও প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন।

—লীগ অব নেশনস কমিটি অন ইন্টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন-এর সভ্য মনোনীত হন।

—লাহোরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন-ভাষণ দেন।

১৯২৫ :

—"অদৃশ্য আলোক" সম্বন্ধে বসু ইনস্টিটিউটে বক্তৃতা করেন।

—কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন-ভাষণ দেন।

১৯২৬ :

—লণ্ডনের লংম্যান্স, গ্রীন এণ্ড কোং কর্তৃক "উদ্ভিদের স্নায়বিক প্রক্রিয়া" (The Nervous Mechanism of Plants) নামক তাঁহার ষষ্ঠ পুস্তক প্রকাশিত হয়।

—ইউরোপে সপ্তম বৈজ্ঞানিক অভিযান।

—লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে বক্তৃতা দেন।

—রয়াল সোসাইটি অব মেডিসিন-এ বক্তৃতা করেন।

—রয়াল সোসাইটি অব আর্টস্-এ বক্তৃতা করেন।

—অক্সফোর্ড বৃটিশ এসোসিয়েশনে বক্তৃতা দেন।

—ফ্রান্সে গমন করেন এবং প্যারীতে সোর্বন এণ্ড ন্যাচারাল হিষ্ট্রি মিউজিয়ামে বক্তৃতা করেন।

—বেলজিয়াম পরিদর্শনে যান এবং ব্রুসেলসের ফাউন্‌ডেশন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন। উক্ত সভায় বেলজিয়ামের রাজা সভাপতিত্ব করেন এবং স্বয়ং জগদীশচন্দ্রকে "Commandeur Ordre de Leopold" উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

—জেনেভায় লীগ অব নেশন্‌সের কমিটি অন ইন্‌টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন-এর প্রথম সভায় যোগদান করেন।

—আইনস্টাইন, লরেন্‌ৎজ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সমাবেশে জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন।

১৯২৭ :

—লংম্যান্‌স, গ্রীন এণ্ড কোং কর্তৃক তাঁহার সপ্তম পুস্তক "কালেক্টেড ফিজিক্যাল পেপারস্" প্রকাশিত হয়।

—লাহোরে অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের চতুর্দশ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

—ইউরোপে অষ্টম বৈজ্ঞানিক অভিযান।

—ফরাসী দেশের দক্ষিণ প্রান্তীয় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করেন।

—লংম্যান্‌স, গ্রীন এণ্ড কোং কর্তৃক তাঁহার অষ্টম পুস্তক "উদ্ভিদের স্ব-লেখন এবং উহার অভিব্যক্তি" (Plant Autograph and their Revelations) প্রকাশিত হয়।

—আন্তর্জাতিক হোমিওপ্যাথিক কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে লণ্ডনের কিংসওয়ে হলে "জীবন-প্রক্রিয়া" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

—লীগ অব নেশনস্‌সের অধিবেশনে যোগদানের জন্য জেনেভা যাত্রা করেন।

—লোকার্নোতে শিক্ষা সম্বন্ধীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন।

—মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন-ভাষণ দেন।

—মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে "অদৃশ্য আলোক" এবং "জীবন-তরঙ্গ" সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

—লংম্যান্‌স, গ্রীন এণ্ড কোং কর্তৃক তাঁহার নবম পুস্তক "মোটর মেকানিজ্‌ম অব প্ল্যাণ্ট্‌স" প্রকাশিত হয়।

১৯২৮ :

—ইউরোপে নবম বৈজ্ঞানিক অভিযান।

—ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন।

—মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পর পর কয়েকটি বক্তৃতা দেন।

—লীগ অব নেশন্‌স কমিটি অন ইন্‌টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন এর অধিবেশনে যোগদান করেন।

—জেনেভা স্কুল অব ইন্‌টারন্যাশনাল স্টাডিস-এ "সংবেদনশীল সত্তা হিসাবে উদ্ভিদ" শীর্ষক একটি বক্তৃতা দেন।

—মিশর সরকারের আমন্ত্রণে মিশর পরিদর্শনে যান।

—মিশরের রায়ল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা করেন।

—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন-ভাষণ দেন।

—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. এস্‌সি. উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন।

—বসু ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল কনফারেন্সে ভাষণ দেন।

—৩০শে নভেম্বর তাঁহার সপ্ততি-পূর্তি-উৎসব পালিত হয়।

১৯২৯ :

—দশম ও শেষবার ইউরোপে বৈজ্ঞানিক অভিযানে।

—ইণ্ডিয়া অফিসে "উদ্ভিদের অব্যক্ত জীবনের অভিব্যক্তি" সম্বন্ধে বহু বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদের উপস্থিতিতে পরীক্ষাসহ বক্তৃতা করেন।

—লীগ অব নেশন্‌স কমিটি অন দি ইন্‌টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন-এর সভায় যোগদান করেন।

—লংম্যান্‌স, গ্রীন এণ্ড কোং কর্তৃক তাঁহার দশম পুস্তক "গ্রোথ এণ্ড ট্রপিক মুভমেণ্টস্ অব প্ল্যাণ্ট্‌স্" প্রকাশিত হয়।

১৯৩১ :

—তিন বৎসরের জন্য "শ্রীসয়াজী রাও গায়কোয়াড় প্রাইজ এণ্ড এম্যুইটি" পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

—বসু রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কার্যবিবরণী, ষষ্ঠ খণ্ড "উদ্ভিদের জীবন-স্পন্দন" নাম দিয়া সম্পাদনা করেন।

—মেয়র সুভাষচন্দ্র বসুর পৌরোহিত্যে কলিকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক তাঁহাকে নাগরিক-সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

১৯৩৩ :

—বসু রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কার্যবিবরণী, সপ্তম খণ্ড (১৯৩১-৩২) সম্পাদনা করেন।

—বরোদা পরিদর্শনে যান এবং সেখানে নিজের গবেষণা ও আবিষ্কার সম্পর্কে অনেকগুলি বক্তৃতা করেন।

—কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. এসসি. উপাধিতে সম্মানিত করেন।

১৯৩৪ :

—বরোদার গায়কোয়াড়ের স্বর্ণ জুবিলী উৎসব উপলক্ষে "ভারতের স্বপ্ন ও সাফল্য" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

—নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন-ভাষণ দেন।

—বসু রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কার্যবিবরণী, অষ্টম খণ্ড, (১৯৩২-৩৩) সম্পাদনা করেন।

১৯৩৫ :

—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. এসসি. উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

—বসু রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কার্যবিবরণী, নবম খণ্ড (১৯৩৩-৩৪) সম্পাদনা করেন।

১৯৩৬ :

—বসু রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কার্যবিবরণী, দশম খণ্ড (১৯৩৪-৩৫) এবং একাদশ খণ্ড (১৯৩৫-৩৬) সম্পাদনা করেন।

১৯৩৭ :

—২৩শে নভেম্বর গিরিডিতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

—২৪শে নভেম্বর কলিকাতায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।